একালের বাংলা গল্প

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

সাধারণী প্রকাশভবন

১০৬/১, রামমোহন সরণী,

কলিকাতা-৭০০০০৯

বজরা

পঞ্চাশ বছর আগে হলে দেখা যেত এই বজরাখানারই গমক কত! ঝাড় লণ্ঠনের নিচে ফরাস বিছিয়ে সারেঙ্গীর উপর ছড় টানতো বড়ে মিঞা। হারমোনিয়মের বেলো ছেড়ে দিয়ে ফাঁক বুঝে আতর মাখা পান তুলে নিত প্রেমচাঁদ আর রূপোর থালা সামনে মেলে ধরে রূপসী বাঈজীর মাতাল করা গান শুনতে শুনতে মেজকর্তা চেঁচিয়ে উঠতেন—কেয়াবাত্, কেয়াবাত্। ফুলবাই মেরি জান্। হাঁ হে ওস্তাদ, অমন মিইয়ে পড়ছ কেন? সরাব টরাব ছোঁও না, শেষটায় বেলাইন পাকড়ে বসলে—আঁ? তারপর টুকরো টুকরো হয়ে ভেসে যেত হাসির লহরা।...কোমরে কানি গোঁজা ক্ষুদে ক্ষুদে জানোয়ারগুলি গেমো-বনের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত—মেজকর্তা চলেছেন।

সেই মেজকর্তাও নেই, বজরাখানার ঠাকঠমকও ঘুচে এসেছে। গলুইয়ের সামনে পেতলের কাজ করা সিংহমূর্তিটা চটা উঠে তেকোণা বল্লমের ফলার মত আজও উঁচিয়ে আছে। কাঠের গায়ে সোনার জলের কাজ করা নগ্ন নারী চিত্রগুলিকে আজ আর বলে না দিলে চিনবার উপায় নেই। বজরাখানার সর্বাঙ্গ ছেয়ে আছে অজস্র এবড়ো খেবড়ো চল্‌টায়। রক্তদুষ্ট কোন রুগীর মত যেন।

আনন্দ চাটুয্যে বললেন, কত আর শুনবে। বলতে বলতে এক মহাভারত হয়ে যায়। কি ছিল আর কি হল! বাঈজী আর সরাব, সবাব আর বাঈজী। আট নম্বর ঘেরির ঠিক মুখটায় কতবার যে লাস টেনে বার করল পুলিস কে অত লিখেজুখে রাখে। পড়ে-পাওয়া বাপের সম্পত্তিতে মেজকর্তা ফুর্তি করেই কাটিয়ে দিতে পারতেন কিন্তু লছমী বিবির বিষ চক্করে ফেঁসে গেলেন শেষটায়। সেইটাই হল তার কাল। তিন তিনটে খুনখারাবি করে লটকে গেলেন পুলিসের জালে। শুনতে পাই একা টমাস দারোগাই পঞ্চাশ হাজার রূপোর চাক্‌তি খেয়েছিল। 'রাঘব বোয়াল থেকে কৈ-খল্‌সে সবাইকে আক্কেল সেলামী দিয়ে জাল ছিঁড়ে মেজকর্তা বেরুলেন। কিন্তু সেই বেরুনোই তার শেষ

বেরুনো। কেউ কেউ বলে মেজকর্তা সন্ন্যাস নিয়েছেন, কেউ বলে সোনা দলুইয়ের বল্লমের খোঁচায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

সোনা দলুই কে?

বজরাখানা দুলে দুলে চলছিল। ভারী গমকী চালে। হ্যারিকেন উস্কে দিয়ে আনন্দ চাটুয্যে হাঁক দিলেন, ও বিপিন তেল ভরিস নি হ্যারিকেনে? নবাব চৌকিদার হয়েছিস দেখছি। হারামজাদা তেল ভরে দে।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল বিপিন চৌকিদার।

হ্যাঁ, সোনা দলুই? আরে মাস্টার সে অনেক কথা। সোনা দলুইয়ের বাপ ছিল এ তল্লাটে জবরদস্ত লেঠেল। লুটের মাল বেচে আটশ টাকা নগদ ঢেলে সোনার কালীমূর্তি বানিয়েছিল। কে বানিয়েছিল জানো?—বৌবাজারের হীরেন কর্মকার। অনেক দিনের কথা। কেউ কেউ বলে প্রথম পূজোয় নাকি নরবলি দিয়েছিল লোকটা। অত না হোক লোকটার ক্ষমতা ছিল। সারা তল্লাটখানা কাঁপত ওর ভয়ে। আটটি রাখ্‌নি পুষে কলকাতার ব্র্যাণ্ডী-হুইস্কী আনিয়ে লোকটার শেষ দিনগুলো ভালোভাবেই কাটছিল, কিন্তু বুড়ো হাড়ে কি যে নেশা লাগল, নজর পড়ল মেজকর্তার বাঈজী লছমী বিবির ওপর।

বাঘের খাঁচায় হাত ঢুকিয়ে বাঘের মুখ থেকে খাবার টেনে আনা সইবে কেন? বুড়ো গুম্ হল। সাত দিন পরে লাস যখন ভাসল, তখন আর কেউ না চিনুক সোনা দলুই চিনেছিল ঠিক। বাপ্‌কা বেটা।

বুকের পাটা ছিল একখানা।

বিপিন চৌকিদার আলো দিয়ে গেল। তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে রূপো বাঁধানো সাবেকী কালের গড়গড়ায় গুড়ুক গুড়ুক করে কয়েকটা টান দিলেন আনন্দ চাটুয্যে।

বাইরে আলকাতরার মত গাঢ় অন্ধকার। ভূতে পাওয়া স্তব্ধ দু'পাশের গেমোবন। নদীর জল বজরার গা চাটতে চাটতে চলেছে। আকাশের তারার মত জোনাকীগুলো চিকমিক করে জ্বলছে আর নিভছে। কত রাত? ঘড়িতে তাকিয়ে দেখলাম সবে সাতটা।

কিছুদিনের মধ্যেই মেজকর্তার বড় ছেলে বিলেত থেকে ফিরলেন। আনন্দ চাটুয্যে আবার টানলেন গল্পটা। আশ্চর্য! বরানগরের বাগান বাড়িতে ফুলের জলসা বসল না। বজরা ভাসিয়ে বাঈজী নিয়ে গোলাপ জলের হোলি খেলল না শ্রীমান চঞ্চল বসুরায়। রায় ফ্যামিলীর হীরের টুকরো ছেলে। চঞ্চল

বললে কেউ চিনবে না ওঁকে। সবাই ওঁকে ডাকত বড়সাহেব। বিলিতি বিলিতি গন্ধ থাকত এই ডাকটায়।

লঞ্চ সিণ্ডিকেট তখন সবে হয়েছে। তিনটে স্পীড বোট কিনে ফেললেন বড়সাহেব। মাছ ধবাব তদারকে লাগিয়ে দিলেন। নিজে এসে ধান কাটার দু' চার মাস এই আবাদে পড়ে থাকতেন। দু' হাতে টাকা ছড়িয়ে প্রজারঞ্জন করতেন। সবাব ছুঁতে কেউ আমবা দেখি নি ওঁকে। কিন্তু—

গড়গড়ায় আবার দুটো টান দিলেন আনন্দ চাটুয্যে। আগুন চলকে উঠল কলকেয়। হালের ঘর্ষণে মিহি সুবে শব্দ উঠছে একটা। আর সঙ্গে সঙ্গে চাবটে দাঁড়েব ভাবী ভাবী শব্দ, ঝপ ঝপ—ঝপ ঝপ। তাকিয়ে দেখলাম আনন্দ চাটুয্যে এখন শুধু ইউনিয়ন বোর্ডেব প্রেসিডেণ্টই নন এ আনন্দ চাটুয্যেব রূপ আলাদা।

পঞ্চাশ বছর আগেও এমনি করে শব্দ হত দাঁড়েব। আজও সেই একই শব্দ। বিরামহীন সময়েব তালে তাল দিয়ে চলেছে। বোধ হয় এই শব্দটার সঙ্গেই তাল বাখতে পারেন নি মেজকর্তা। হাব স্বীকাব কবে পালিয়ে গেছেন বড়সাহেব। পালিয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে বসুবায ফ্যামেলীব সম্রাটকুল। জমা আছে, জমি আছে, কি নেই তবে? বুঝে উঠতে পাবে নি কেউ। আজ এসেছে পি-ইউ-বি আনন্দ চাটুয্যের মরসুম। কিছু কিছু আমি আগেই শুনেছিলাম। শুনেছিলাম বলেই গল্পটা আমাব কাছে অসত্য মনে হচ্ছিল না।

কি হে মাস্টার, অমন গুম্ মেবে গেলে কেন? ভাল লাগ্‌ছ না বুঝি? ওবে বনশী, রাত ভোব করবি নাকি? জোবে জোবে টান।

না না বেশ লাগছে, তারপব বলুন।

বেশ লাগবেই। আবাদের ইতিহাস কেউ যদি লিখত নাম করে ফেলত। যাক শোনো। বড়সাহেবের কীর্তিটাই শোনো। ভালোই গুছিয়ে গাছিয়ে বসেছিলেন বড়সাহেব। দুটো টিউবওয়েল বসালেন। ঢেঁড়া পিটিয়ে লোভ দেখিয়ে হাটখোলাটাও বসালেন। লেখালেখি কবে লঞ্চ আনালেন কুমীরখালির বাস্তায়। এ বাস্তায় না হলে লঞ্চ আসে! ঘাটা দিয়ে দিয়ে লঞ্চ কোম্পানী পাততাড়ি গোটাতো কবে, কিন্তু বড়সাহেবের নজরানাই টিকিয়ে রাখল শেষতক্।

সেই বড়সাহেবও সাপের লেজে পা দিয়ে বসলেন একদিন। হীরা প্রধানের বউটার দিকে নজর ফেললেন। বউটাও ছিল অপরূপ। প্রধানের

ঘরে কি করে যে অমন গোলাপ ফুল ফুটেছিল কে জানে! সাবান তেল গায়ে পড়লে না জানি কি হত। বউটাকে ছিনিয়ে এনে কাছারী বাড়িতে তুললেন বড়সাহেব।

তারপর দিন দুই পেরুতে না পেরুতে রক্তারক্তি কাণ্ড। বোষ্টমপাড়ার পুব দিকের চকে ঘোড়া নিয়ে বড়সাহেব বৈকালিক ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। ঘোড়া সমেত উলটে পড়লেন মই না দেওয়া মাটির ডেলায়।

কিন্তু কি জানো মাস্টার, ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়ার ছেলে বড়সাহেব ছিলেন না। এ-সেই হীরা প্রধানেরই কারবার। লোকটা তলে তলে গ্রামটাকে উস্‌কে রেখেছিল।

বড়সাহেবের বুড়ো মা রাণীবিবি খবর পেয়ে ছুটে এলেন। বড়সাহেবকে নিয়ে গেলেন কলকাতায়। তারপর থেকে কলকাতার সিংহাসনে বসে রাজ-কার্যের ভার নিলেন রাণীবিবি। লেঠেল নিয়ে নায়েব গোমস্তাই দেখাশুনা করতে লাগল জমিদারী।

আর এই জানোয়ারগুলিরও গোঁ বলিহারি। যা ভাববে তা করবেই। তবে আমার কাছে, বুঝলে মাস্টার, ঢিট্ হয়ে গেছে ব্যাটারা। সকালবেলা বিষ্টু নাপিতের কাণ্ডখানা দেখলে তো; এক মুঠো ধান চুরির দায়ে কি মারটাই না খেল বিপিনের হাতে। আমি ছিলাম সামনে, ব্যাটা চুপ। যাবার বেলা পায়ের ধুলো জিভে ছোঁয়াতেও ভুলল না। মার খেয়ে খেয়ে এখন ওদের শুয়োরের গোঁ কমেছে। দু' দিন থাকো সব দেখবে মাস্টার; সব দেখাবো।

কথায় কথায় কখন যেন নিজের প্রসঙ্গে এসে পড়েছিলেন আনন্দ চাটুয্যে। সামলে নিয়ে হেসে উঠলেন। হাসিতেই তাঁর ব্যক্ত হয়ে উঠল আর এক অধ্যায়। ইচ্ছে হল জিজ্ঞেস করি, তারপর?

তার আগেই আনন্দ চাটুয্যে শুরু করলেন, হ্যাঁ যা বলছিলাম—

বলতে বলতে আবার তিনি থামলেন। রূপোর পাতমোড়া নলে টান দিয়ে বুঝলেন আগুন নিভে গেছে কলকেয়। ইতিহাসের স্তূপীকৃত জঞ্জালের মধ্যে হারিয়েই গিয়েছিলেন আনন্দ চাটুয্যে। চীৎকার করে উঠলেন, এই শালা শুয়ার বিপিন, তামাক দিয়ে যা।

বিপিন ভেতরে ঢুকল।

টং হয়ে ঘুমুচ্ছিলি বুঝি। সামলে না চলতে পারিস গিলিস কেন অতো? শুয়ার কোথাকার।

আমি বললাম, বজরার কি হল বলুন?

হ্যাঁ বজরা। কি বলব মাস্টার, এই যে জানোয়ারগুলি দেখছ—বিপিন তার পোকায় খাওয়া দাঁতগুলি বের করে আত্মতৃপ্তির হাসি হাসল, এগুলির স্বভাবই হয়ে গেছে বিটকেলে ধরনের। কেবল ছুঁক, ছুঁক, কোথায় মদের আড্ডা কোথায় খানকির বাড়ি। আর বলো না মাস্টার, মেজাজ খিঁচড়ে দিয়ে যায়।

বজরাখানা ককিয়ে ককিয়ে চলেছে।

পি-ইউ-বি আনন্দ চাটুয্যে আবার শুরু করলেন, হ্যাঁ বজরাখানার আদর বড়সাহেবও কম করেন নি। ইযার বন্ধুদের সঙ্গে বন্দুক নাচাতে নাচাতে বজরা চলত সুন্দরবনের দিকে। বজরাতেই রান্না হত, কলকাতার খানসামার হাতের রান্না, মানিক-জোড়ের তুলতুলে মাংস পোলাও। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। বড়সাহেব কলকাতার মিস্ত্রি এনে বার দু'তিন সারাইও করলেন বজরাটা। বছর বছর গাব খাওয়ালেন। বাপের শখের বজরা, ছেলে তার অসম্মান করে নি কোনদিন। কবরারও ক্ষণ নয় ওদের।

তারপর?

হয়ত আনন্দ চাটুয্যে আরও অনেক কথাই বলতেন। বজরাটাকে কেন্দ্র করে কয়েক পুরুষের চটকদার ইতিবৃত্ত। কিন্তু একটা ঝাঁকি দিয়ে বজরাটা থেমে গেল।

কোথায় এলাম রে বিপিন?

অন্ধকারের মধ্যে ভাল করে নজরে আসে না। বড় নদী ছাড়িয়ে একটা খালের মুখে এসে দাঁড়িয়েছি বোধ হয়।

বিপিন বলল, বউকাটার মুখে।

বউকাটা খাল। নামটা শুনলেই বইয়ে পড়া উপন্যাসের মত মনে হয়। জমাট বাঁধা অন্ধকারের মধ্যে খালটাকে ভাল করে নজরে আসে না। দু' পারে বসতি, কিছু কিছু জঙ্গল আর ক্ষেত—শাকআলু, তরমুজ, রবিশস্যের হবে হয়ত।

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল বিপিন। বউকাটার মুখে এলাম বড়বাবু।

তা থামলি কেন? বড়বাবু অর্থাৎ আনন্দ চাটুয্যে উত্তর করলেন আমিরী চালে। এসেছে বুঝি শুয়োরটা?

আজ্ঞে হ্যাঁ, দেখা করতে চায়।

দেখা করে কি করবে? না না, ভাগিয়ে দে হারামজাদাকে। যত সব ন্যাকা চৈতন।

বজরায় উঠে পড়েছে বড়বাবু।

উঠে পড়েছে, তবে আর কি নাচি। আচ্ছা ডাক শালাকে।

বিপিন চলে গেল। আনন্দ চাটুয্যে বললেন, লোকটাকে দেখে রেখো মাস্টার।

পাথুরে কয়লার মত কালো বিরাট লোকটা বজরার মধ্যে ঢুকল। তারপর টানটান হয়ে বড়বাবুর পায়ে হাত ছুঁইয়ে গড় করল।

চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে বয়েসের। শ্লথ শিরাগুলো যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে লোকটাকে। গায়ে একটা আধ-ময়লা ফতুয়া। পরনে দেশী তাঁতিদের হাতে বোনা ধুতি। কিন্তু চোখ দুটো দেখলে চমকে উঠতে হয়। অস্বাভাবিক। কাচের গুলির মত টকটকে লাল রংয়ের। গন্ধটাও পাচ্ছিলাম।

লোকটা বাদী না আসামী বোঝা দায়।

কি চাস বল ? আনন্দ চাটুয্যে কথার ঝাজে বিরক্তি প্রকাশ করলেন।

আপনি মা বাপ বড়বাবু। চিরকাল ছেলের দিকে তাকিয়েছেন, আজ আমার—বলতে বলতে লোকটা পাকা অভিনেতার মত কেঁদেই ফেলল।

বাইরে অন্ধকারের মধ্যে তাকিয়ে রইলাম।

কান্নাকাটি ছেড়ে নথিপত্র কি এনেছিস দেখা। এক একটা কাণ্ড করে বসবি আর মাপও চাইবি সাতখুনের। আবাদে আর টিকতে দিবি না দেখছি। বুঝলে মাস্টার, পি-ইউ-বি হয়ে এক দিকদারিতেই পড়েছি।

দিকদারিটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলেন না আনন্দ চাটুয্যে। লোকটা ড্যাবড্যাবে চোখ তুলে তাকাল আমার দিকে। বড় অস্বস্তিকর সেই চাউনি।

আবাদ পত্তনের ইতিহাস ক'দিনেরই বা হবে। ষাট-সত্তর বড়জোর একশ-দেড়শ। বসুবায়ের আবাদ একশ'র ওপারে যায় নি। দানা বাঁধা উপনিবেশ তারও কম। পঞ্চাশ ষাট কি আর কিছু বেশি। অর্থাৎ পুরুষ দুই কেটে গেছে মাত্র। কিন্তু কি বিস্ময় এই আবাদের মাটিতে। এক হাতে নদীকে দাবিয়ে রেখেছে আবাদের মানুষ, আর এক হাতে করলে চলেছে খুন-রাহাজানি, জমিজমার দাঙ্গা, মদ মেয়েমানুষ। অন্ধকারের মধ্যে তাকিয়ে থেকে বারবার আমার সে কথাই মনে হচ্ছিল। এই আবাদে মেজকর্তা টিকলেন না, বড়সাহেব পালিয়ে গেলেন, দুর্ভেদ্য লোহার প্রাচীর গড়েও

রানীবিবির হয়রানির একশেষ। নায়েবগোমস্তা, লেঠেল, থানা-পুলিশ অনেক হল, পি-ইউ-বি হল, তবু যেন কি হচ্ছে না।

আমি চমকে উঠেছিলাম। বজরাখানা ভারিক্কি চালে দুলে দুলে দুলে চলছিল আবার। বউকাটা খালের জল ক্লান্তিতে যেন নীরব হয়ে ঘুমুচ্ছিল। নাকের ডগায় চশমা তুলে বড়বাবু খুঁটে খুঁটে দেখছিলেন। লোকটার দু' চোখ জোড়া অস্বাভাবিক ভয় আর আকুতি ছড়িয়ে আছে।

এমন সময় ভূত দেখার মত আমি চমকে উঠলাম। খালের পারে বড় বড় কয়েকটা ঝোঁপ-বাঁধা তেঁতুল গাছের ফাঁকে দুটো নিশ্চল মূর্তি যেন এ দিকেই তাকিয়ে আছে। বোধ হয় দেখছে,—পি-ইউ-বি চলেছেন। এই বজরায় বাঈজীর আসর দেখে ওরা বুঝত, মেজকর্তা চলেছেন, এলোপাথারী বন্দুকের ফুটফাট শব্দ শুনে ওরা বুঝত, বড়সাহেবের বজরা। বজরাটা ওদের কাছে যেন চিরকালের বিস্ময়।

কিন্তু লোক দুটো অমন ছুঁক ছুঁক করে চলেছে কেন? গা ঢেকে ঢেকে! বজরাটা[illegible] লক্ষ্য করে করে।

কি হে মাস্টার, অতো কি খুঁজছ অন্ধকারের মধ্যে, কাউকে দেখছ নাকি? যেন আনন্দ চাটুয্যে জানতেন কেউ এখন বজরা লক্ষ্য করতে করতে এগোবে।

আমি বললাম, হ্যাঁ, দু'জন লোক মনে হচ্ছে, বুঝতে পারছি না তো?

হেঁ হেঁ হেঁ। রাশভারী আমিরী হাসি হাসতে হাসতে বড়বাবু বললেন, কি নাম রে হরিশ?

হরিশ অর্থাৎ সেই বুড়ো লোকটা বলল, বাতাসী আর বুনো।

হ্যাঁ বুনো সর্দার আর বাতাসী। এই কেসটার বাদী।

বাদী? বাদী কেন অমন আত্মগোপন করে চলেছে. অবাক লাগল ঘটনাটা।

বড়বাবু বললেন, যাও না ছাদের উপর বসে লক্ষ্য করগে, অনেক-কিছুই আরো দেখতে পারো। আমি এই কাজটুকু সেরে ফেলি। রিপোর্টটা ভেবেচিন্তে করতে হবে। বড় গোলমেলে হে মাস্টার। ফিরবার পথে সব বলব।

হাঁপ ছেড়ে বজরার বাইরে এসে দাঁড়ালাম। আহ্, ভারী মিষ্টি বাতাস।

আট দাঁড়ের বজরা। চার দাঁড়ে টানছে। পাটাতনের উপর পা ছড়িয়ে বসে কালো কালো মূর্তিগুলো তালে তালে দাঁড় ফেলছে জলে। আর সঙ্গে সঙ্গে শব্দ হচ্ছে হাপুস হাপুস।

বিপিন চৌকিদার বজরার ছাদের উপর বসে বিড়ি ফুঁকছিল আয়েসে। আমাকে সতরঞ্চি পেতে বসতে দিল। বসুন মাস্টারবাবু। বসুন।

উঠে বসলাম।

বউকাটা খালের যে ইতিহাস বিপিন বলল তাতে চমকে উঠতে হয়। খালটা কেটেছিল সোনা দলুই। বাপের মতন রাখ্‌নি পোষে নি সোনা। বে' করেছিল একটাই। বাঁজা বউ। বাপের কুকীর্তির প্রায়শ্চিত্ত হল যেন বউটা। মানসিক করল সোনা, পূজো দিল, কলকাতার ব্যাণ্ডপার্টি এনে পঁচিশ হাত লম্বা কালী গড়ে সাত রাত উপোস করে জব্বর পূজো। পূজোর শেষে আদেশ পেল সোনা। এক ছেলের মায়ের, না না এয়োতি লক্ষ্মীমন্ত বউ হওয়া চাই, এক ছেলের মায়ের রক্ত মাটিতে ছুঁইয়ে দশ মাইল লম্বা পঁচিশ হাত চওড়া খাল কাটা চাই। তাই করল সোনা। পুলিস বলল, খুনখারাবি হয় নি। লোকে বলে, বউকাটা খাল। খালটা আজ ছড়িয়ে গেছে পঞ্চাশ হাত। অপুত্রক বউরা আজো এর মাটি ছুঁয়ে আকুলিবিকুলি হয়ে কাঁদে। খালের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে অবগাহন করে। বউকাটা খালের মিষ্টি জলে একটু একটু করে নোনা জল মেশে।

হাল টানছিল বিশাই। বলল, সোনা দলুই এখানে তার অঢেল সম্পত্তি ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলেছিল। এখনো এই খালের নিচে মাটি খাবলালে সোনার ঘড়া পাওয়া যায়।

বনশী দাঁড় থামিয়ে বলল, সোনার সিন্দুক উঠেছিল একবার। থানার বড় দারোগা সিন্দুকটাকে কোলকাতা চালান করেন। তা ছাড়া হাতা-খুন্তি-কড়াই নজর রাখলেই পাওয়া যায়। তবে কেউ ওসব ছোঁয় না।

লোক দুটোকে আবার দেখা গেল। গর্জন গাছের ফাঁকে টুক করে আবার দুটো ক্ষুদে দৈত্য গা ঢাকা দিল।

বিপিন বলল, ওরাই বাদী।

বাদী, তবে পালিয়ে বেড়াচ্ছে কেন?

পালানো নয় মাস্টারবাবু, তক্কে তক্কে আছে। হরিশ উঠেছে বজরায়। কি জানি কেসটা কি হয়ে যায়, তাই ভয়।

তা, ওরাই তো দেখা করতে পারত আগে।

হেঁ হেঁ মাস্টারবাবু, নেড়ে ন্যাংটার বুদ্ধি। চাষাভুষো লোক, মাটিই চেনে। আঁটঘাট জানবে কোথেকে। কেস করতে হয়, দিল করে, এখন বুঝছে তার ঠেলা।

ভাগচাষের খামার নিয়ে কেস নয়। কেস ভিটে উচ্ছেদের।

জিজ্ঞেস করলাম, হরিশ লোকটা কেমন হে?'

হবিশ? বিপিন আর একটা বিড়ি ধরাবার জন্য দেশলাই খুঁজতে লাগল। বিশাই ট্যাঁক থেকে দেশলাই ছুঁড়ে দিয়ে বলল, একটা টান দিয়ো বিপিনদা। সেই থেকে তুমি তিনটে ফুঁকলে।

বিপিন বলল, চল্ না হরিশের বাড়ি সিগ্রেট ফুঁকবি, আজ সিগ্রেট ছড়াবে। হ্যাঁ, হরিশ কে জানেন মাস্টারবাবু, এই কেসের আসামী। টাকার কুমীর। ওর বাড়ি দেখলেই তা বুঝবেন। চৌহদ্দিব চারদিকে খামার। গোলা আছে অগুনতি। ছোটয় বডয অনেকগুলি। গোযাল আছে পরপর তিন সার। তা ছাড়া আম কাঁঠাল তেঁতুল অজস্র। এক একটা গাছে হেসে খেলে খান কযেক চিতা সাজিয়ে ফেলা যায। লেখালেখি করে হবিশ হালে বন্দুক পর্যন্ত আনিযেছে। টিউব-কল পুঁতেছে গোটা কয়েক। আত্মীয় কুটুমও কম নেই হবিশেব। এবেলা ওবেলা মিলে শ' আড়াই পাত পড়ে। কলকেয় তামুক পোড়ে দু' দশ সের তো বটেই।

এত ধনী!

অথচ লেখাপড়া না শিখেও কলমবাজি কবেই খেযে যাচ্ছে হরিশ।

সে কি হে, মুখ্যুর আবার কলমবাজি?

এঁজ্ঞে, বি এ পাশ মুহুরী আছে ওব। উকিল আছে আলিপুরে। হরিশকে দেখলে সবাব কাজ ফেলে দিয়ে বলে, হরিশ যে, আবার কি হল?

হবিশের কাজই করে সবার প্রথম।

বিপিন আবো বলতে যাচ্ছিল। বিশাই বলল, এই মোড়টা পেরুলেই হরিশের ঘাট।

চকিতে সেই লোক দুটো আর একবার বিদ্যুতের মত ঝিলিক দিয়ে মিলিয়ে গেল জঙ্গলের মধ্যে।

জমাটবাঁধা অন্ধকাব ভেদ কবে কযেকটা লণ্ঠন এসে জমা হল ঘাটে। আর সেই সঙ্গে বেশ কিছু লোকের গলার স্বর।

দাঁড়ের ফেঁসোগুলি খুলে ফেলতে লাগল মাঝিরা।

তরতর করে জল কেটে তবু এগিয়ে চলেছে বজরাখানা। হাল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঠিক ঘাটের গায়ে এনে হাঁক দিল বিশাই, ঘাট ধর, ঘাট ধর।

ঘাট ধরল বনশী। বজরাব গতি আটকাবার চেষ্টা কবল দু' বাহুর জোরে।

ঘোষ মাহুত তার বিরাট হাতীকে হাঁটু গেড়ে বসবার আদেশ করছে। তাজ নামাও, সম্রাট নামবেন।

সম্রাট আনন্দ চাটুয্যের ভারী গমগমে বুট শোনা গেল। পাটাতনের উপর শব্দ হল গুরু গম্ভীর।

সবার আগে বেরুল হরিশ। সাবেকী কালের ফরাসখানা বিছিয়ে দিল পাটাতনের উপর। ভেতর থেকে তাকিয়া দুটো এনে তার উপর পেতে দিল লম্বা। বিপিন ত্রস্ত হয়ে কেবল ভেতর বার করছে। কোথাও কোন ত্রুটি হয়ে যাচ্ছে কি না কে জানে! তাকিয়ে দেখলাম অদূরেই সেই দুর্গের মত বাড়ি। হরিশের বাড়ি। লম্বায় চওড়ায় এত বড় বাড়ি এ অঞ্চলে আর দেখেছি বলে মনে পড়ে না। মেটে দেওয়ালে নানা রংয়ের চিত্রবিচিত্রি। এত দূর থেকে ভালো নজরে আসে না। তবু বুঝতে কষ্ট হয় না ওগুলো নিশ্চয়ই ফুল-লতা-পাতারই হবে। মামলাবাজ হরিশের বুকের মধ্যে লতাপাতারও একটু স্থান আছে ভাবতে বেশ লাগে।

বিরাট উঠোনের ঠিক মাঝখানে তুলসী মঞ্চ। তারই একপাশে খড় বেরিয়ে পড়া মকর মূর্তিখানা দেখা যাচ্ছে। এটাই বোধ হয় হরিশের বাইরের বাড়ি।

আনন্দ চাটুয্যে বজরার ভেতর থেকে বাইরে এলেন। তারপর হাঁক দিলেন, কি হে মাস্টার, এস। বস এখেনে।

তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসলেন উনি। আমিও সংকুচিত হয়ে বসলাম। লোকগুলো বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে, দেখলাম।

ঘাট থেকে কেউ কেউ উঠে এল বজরায়। তারপর কথার জঞ্জালের মধ্যে কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা অসত্য খোঁজখুঁজি চলতে লাগল। আশ্চর্য সেই বিচারশালা।

আমি খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম সেই তক্কে তক্কে থাকা লোক দুটোকে।

কিছুক্ষণের জন্য হরিশ উধাও হয়ে গিয়েছিল। ফিরে এসে আনন্দ চাটুয্যের পা ছুঁয়ে বলল, বড়বাবু আমার মেয়ের অনেক সাধ—

বাকিটা যেন বুঝিয়ে দিতে হয় না। বড়বাবু অর্থাৎ আনন্দ চাটুয্যে বললেন, কোথায়? নিয়ে আয়।

অল্প বয়স। মাথায় ঘোমটা টেনে কাঁপতে কাঁপতে এল। হরিশের মেয়ে। হরিশ নাম বলল, কুমুদিনী। শ্বশুর ঘরে থেকে ফিরেছে, মাসখানেক থাকবে।

কুমুদিনী পা ছুঁয়ে প্রণাম করল আনন্দ চাটুয্যের।

কল্যাণ হোক।

দু' থাল ভর্তি শাকআলু আর কাটা ফল এল। এল কাচের গেলাসে চা।

হরিশ বলল, কুমুদিনী কিছু প্রণামী দিতে চায় বড়বাবু।

না, না প্রণামী কি হবে।

আনন্দ চাটুয্যে তাকালেন আমার দিকে। আমি সেই তক্কে তক্কে থাকা লোক দুটোকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। নাহ্, ধারে কাছে নেই ওরা। কোথায় যেন অন্ধকারের ভিড়ের মধ্যে হারিয়েই গেছে। হুইস্কির বোতলটা আঁচলের ভাঁজ থেকে ধীরে ধীরে বার করল কুমুদিনী। ঘোমটাটা খোঁপায় এসে আটকে পড়েছে ওর। ফাঁপা নাকের পাটায় নথটা হ্যারিকেনের আলোয় চিকচিক করে উঠল। মনে হল যেন একটা তক্ষক ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে সামনে। সুডৌল হাত মেলে বোতলটা এগিয়ে দিতে গিয়েছিল কুমুদিনী।

আনন্দ চাটুয্যে আমার দিকে তাকিয়ে একটু ম্লান হেসে বললেন, দেখলে তো মাস্টার। শালারা ভাবছে আমিও বুঝি পুলিস দারোগার মতই মদ খাই। অষুধ হিসেবে কবে একটু খেতে দেখেছে। তা, ও হরিশ রাত বাড়ছে, ফিরতে দিবি না বুঝি? ভেবেছিস কি তোরা।

এঁজ্ঞে' হাত কচলাতে কচলাতে হরিশ বলে, এস গো কুমুদ। বাবুর রাত বাড়িয়ো না।

হ্যারিকেন নাচাতে নাচাতে কুমুদিনী বজরা থেকে ঘাটে নামল। ঘাট থেকে পারে। তারপর মেঠো পথ ধরে সটান দুর্গটার দিকে।

আবার বজরা ছাড়ল। গুন টেনে এগিয়ে নিয়ে চ বজরাকে আরো কয়েক শ' গজ ভিতরে।

এখানে ঘাট নেই। গ্রামের শেষ প্রান্ত। বড়বাবু জিজ্ঞেস করলেন, বাদীর কি নাম যেন হরিশ? কিছুতেই মনে থাকে না।

হরিশ বলল, বুনো সর্দার আর বাতাসী।

বুনো আর বাতাসীকে এবার দেখলাম। নিজের ভিটের উপর দাঁড়িয়ে; ছোট্ট গোল পাতার ছাউনী দেওয়া ঘরটা ভেঙে তছনছ হয়ে আছে একপাশে।

মনে হল বর্বরতার চূড়ান্ত সাক্ষ্য।

আমরা পৌঁছুতেই বজরায় লাফিয়ে উঠল মেয়ে মরদে।—এ জমি আমার বাবা। ওদের দিস নি বাবা। কোথায় দাঁড়াব গো—বাবা—

হরিশের হাতে একটা হ্যারিকেন দুলছিল বজরার দুলুনিতে। দৈত্যের মত ওর বিরাট ছায়াটা কাঁপতে লাগল বউকাটা খালের জলে।

জরিপ করা হল চৌহদ্দি। খাতায় অনেক কিছু নোট টোকা হল। সব কাজ চুকিয়ে বজরা ছাড়তে ছাড়তে রাতও হল অনেক। হাতঘড়িতে তাকিয়ে দেখলাম, রাত দশটা।

আনন্দ চাটুয্যে বললেন, ভিতরে গিয়ে কাজ নেই, এখানেই বসি। কি বল মাস্টার? গড়গড়ায় গুড়ুক গুড়ুক করে টান দিতে লাগলেন তারপর।

আচ্ছা, কি বুঝলে বল তো? দেখলে তো আসামীর চোট কতটা। এদেশে সব হয়। মেজকর্তাই বল, আর বড়সাহেবই বল কিংবা তোমার রাণীবিবিই হোক না, কারো ক্ষমতা নেই এদেশে সুবিচার করার। এই হরিশকে দেখলে তো কেমন জাল দলিল তৈরি করে সামলে নিচ্ছে, ভাবো দেখি!

সে কি! আপনি বাদীকেই শাস্তি দেবেন? দলিল-পরচা নকল করা আসামীকে ঝুলিয়ে দিন।

দিয়ে লাভ? তোমাদের মাথায় অত ঢুকবে না মাস্টার। তোমরা এ লাইনে নেহাৎ ছেলেমানুষ। আমি না হয় বাদীকে জিতিয়ে দিলাম আমার ইউনিয়ন বোর্ডের কোর্টে। কিন্তু হরিশ আমায় কলা দেখিয়ে উপরে যাবে। লাভ নেই।

তা হলে অত খেলাবারই বা কী দরকার ছিল?

হরিশের কথা বলছ? বড় মাছ না খেলালে ওঠে না।

আনন্দ চাটুয্যে আড় চোখে আমায় দেখলেন।

বজরাখানা এগিয়ে চলেছে বড়নদীর দিকে। দাঁড়ের ভারী ভারী শব্দে বাতাস ঘুলিয়ে উঠছে। হঠাৎ আমার নজরে পড়ল রসাল আঙুরের ছবি-আঁকা লেবেলের সেই মদের বোতলটা পাটাতনের উপর বজরার দুলুনির সঙ্গে ধীরে ধীরে দুলছে।

বজরার গমকটাই শুধু কমেছে, আর মানুষগুলি! আমার মনে হল, মানুষগুলি ঠিকই আছে, সেই আগের মত। অবিকল সেই পুরনো মানুষের মতই সবাই রয়ে গেছে।

কানিবোষ্টুমীর গঙ্গাযাত্রা

ডেথ সার্টিফিকেটখানা ভাঁজ করে পকেটে রাখল মদনা, মদন মালাকার। যাত্রা শুরু হতে যা কিছু দেরি হচ্ছিল তা এরই জন্য। ওদিকে বাঁধাছাদা করা, খাটিয়ার দু' পাশে দুটো লম্বা বাঁশ বেঁধে নেওয়া, শবদেহের উপর একখানা সাদা চাদব বিছিয়ে, দেওয়া, তার উপর ফুল ছড়িয়ে দেওয়া, হাড়ি সরা ময় একজোড়া গামছা কেনা থেকে শুরু কবে টুকটাক এটা সেটা গোছগাছ করার কাজ অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। কেবল মদন ভাবছিল শব বয়ে নিয়ে যাওয়ার ছাড়পত্রখানা পেলে হয়, তাও যখন পাওয়া গেল, আর কি। এবার হরিবোল দে রে ভোলা। মদন নিজেই হবিধ্বনি দিয়ে উঠল, বলহবি । ভোলা, বিষ্টুরা এতক্ষণ বসে বসে ঝিমোচ্ছিল, যেন হঠাৎ তীক্ষ্ণ আলপিনেব খোঁচা খেয়ে কোঁৎ কবে লাফ দি'। চেঁচিয়ে উঠল, হবিবোল।

এই নবাসং কাঁধটা লাগা না বে বাপু, বাসি মড়া আব কতক্ষণ পাহারা দিবি? নে নে ধব। মদনেব গলাটা যেন ভাবী হয়ে বুঁজে এল।

ভোলা-বিষ্টুদেব কাছেও যেন আজ মদনেব দুর্বলতার ঝাঁজটা ধবা পড়ে যাচ্ছে। চল্লিশ বছব বযসেব কাঠিন্যে-মাজা মথটাও বড ক--- মনে হচ্ছে সবার কাছে। অভিজ্ঞতাব স্তর জমা চোখেব ডিম দুটোর স্বাভা..ক লালচে রংটা যেন আজ বড বেশি অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে।

ওবা এক ঝটকায খাটিযাটা কাঁধে তুলল।

বোধ হয় ওদের সকলেই কানির চেয়েও মদনেব কথাই, ভাবছিল বেশি করে। মাগ মরলেও কেউ অমন ঢং দেখাতে পারে কিনা সন্দেহ। আর এতো কানি বোষ্টুমীর মরা, সাতকুলে কেই বা আছে ওব মুখে আগুন দেওয়ার মত। সেই কানি যাবে গঙ্গায়। ভালো পিরীত করেছিলি বাবা। রাসু কাঁধের উপর খাটিয়ার বাঁশটা আয়েস করে রাখতে -াখতে বলে, ও মদনদা, গঙ্গা অবধি গেলে কিন্তু আর এক পাঁইট ছাড়তে হবে।

মদন বলে, সে হবেখ'ন। আর একটা ডাক দে দেখি প্রাণ খুলে, বলহরি···

সবাই খাটিয়া সমেত লাফ দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, হরিবোল।

রাত্রিটা সেই থেকে ঝিম ধরে আছে। দাঁতে দাঁত চেপে শক্ত হয়ে রয়েছে। একটুও বাতাস নেই।

গো-হাটার এদিকটায় দিনের বেলাতেই লোক আসে না, তায় এখন তো রাত দুপুর। যারা এসেছিল কানিকে দেখতে তারা অনেক আগেই উঃ আঃ করে বিদেয় নিয়েছে। এবাব যা ভালো বুঝবার মদনাই বুঝবে। সবাই জানে তেলটা নুনটা মাঝে মাঝে মদনই দিয়ে যেত কানিকে, মদনের সঙ্গেই যা কিছু সম্পর্ক ছিল কানিরণ` আর সবাই তো আলগা আলাপেরই লোক।

গো-হাটার মাঠ ডিঙিয়ে শবদেহটা এগিয়ে চলল।

বলহরি···

হরিবোল।

কানিটা দিন কয় থেকেই মরবে মরবে করছিল, আজ সত্যি সত্যি মবল। চুষে খাওয়া আমের মত চামড়া সার হয়ে গিয়েছিল কানি বোষ্টুমী। ঝুনো হাড়গুলো নিয়ে নডতে বসতে মটমট করে শব্দ হত। এক চোখ কানা, যেন মাছের আঁশের মত সাদা একটা চল্‌টা উঠে গিয়েছিল চোখ থেকে। আর একটা চোখ ছিল ভালোই, তবে বয়সের ধুলো ঠাসা, ঝাপসা।

এককালে নাকি ঐ দুটো চোখই দপ দপ করে জ্বলত। ঠোঁট দুটো ছিল কমলা লেবুর কোয়ার মত কসে-ভেজা। কোঁকডা কোঁকডা চুল, খানিক তামাটে, খানিক কালো। ছুঁচলো নাকটা নাচিয়ে বকম্ বকম্ কবে কথা বলত। গালগলা ফুলিয়ে পেখম ধরত ময়ূরের মত। লক্কা পায়রার মত লাট খেয়ে ঢলে পড়ত গায়।

কানির সেই সুখের দিন, সে কি আর আজকের কথা, রাস্থরা সেই সব কথা গল্পের মত শোনে। মদন বলে, কানি বোষ্টুমী তখন বিবির হাটে নামডাক নিয়ে বহাল তবিয়তেই আছে। গান গায়ঃ আমি প্রাণসজনী রসের বোষ্টুমী, ছোঁড়াকে বলব এবার করে যেন কমিশানী ···। মরা মানুষও সেই গান শুনে চাঙ্গা হয়ে উঠত, তায় আমরা তো ছিলাম জ্যান্ত বিশ বাইশের ছোকরা। মজে গেলাম কানি বোষ্টুমীব রসে। কানির তখন তিরিশ হয়েছে কি হয় নি।

তখন কাজ করতাম ওলাবাবুর কাঠ গুদামে। সকাল থেকে সন্ধে অবধি ঘ্যাসর ঘ্যাসর করাত টানি। সন্ধের পর পাকুড়ি আর মাটির খুরিতে লাল জল নিয়ে বসি। তখন, আজকালকার মত এখানে তাঁটিখানা ছিল না, গো-হাটার

পুব পারে তেঁতুল গাছটার তলায় বসত সবাই উদ্দোম হয়ে। ভূতী-নাপ্তানীর দোকান। হাতের গুণেই বল আর যাই বল তেমনটি আর একালে কেউ তৈরী করতেই পারে না।

রাস্থরা অবাক হয়ে শোনে সেই গল্প। যখন খদ্দের থাকে না দোকানে মদন রসিয়ে রসিয়ে পুরনো কীর্তিকলাপের জাবর কাটে। খদ্দের এলেই গল্প থেমে যায়।

খদ্দেরও হরেক রকম। নেড়ে ন্যাংটা থেকে শুরু করে ফিটন হাঁকানো বাবু।

বড়বাবু আজ একটা বিলিতী দেই?

নারে মদনা, তুইই মারলি আমাকে। ও ছাই না গিলেও পারি না!

ছি ছি ছি। মদন জিভ কাটে, এই নরসিং, হাবা কোথাকার, বাবুকে দেখেশুনে দিস নি বুঝি? হাঁ করে দেখছিস কি রে হারামজাদা, টুলটা মুছে বসতে দে বাবুকে।

কোথায় হচ্ছিল কানি বোষ্টুমির গল্প, না বড়বাবুকে নিয়ে পড়তে হল। এমনিই হয় রোজ। কখনো হুটপাট করে একগাদা খদ্দের এসে এমন তাণ্ডব জুড়ে দেয়, সামাল দিতে মদনা গুণ্ডাকেও হিমসিম খেয়ে যেতে হয়। আবার কখনো সামসুম করে দোকানটা লোকের অভাবে। কুক্ করে ডাক দিলে যেন দশটা কুক্ হয়ে ফেরে।

রোজই এমনি একঘেয়েমি।

আঠা চটচটে টেবিল। অন্ধকার ঠাসা বাঁশের চাঁচের বেড় দেওয়া মদনের দোকান ঘর। থাক থাক সাজানো মদের বোতল। সপসপে ভেজা মেঝের উপর বিড়ির টুকরো, দেশলাইয়ের পোড়া কাঠি, শালপাতা এলোমেলো ছড়ানো, একটা বোট্‌কা গন্ধ। সন্ধে হবার আগেই দুটো ডে-লাইট ঝুলিয়ে দেয় মদন। একটা ঘরের ভেতরে আর একটা বাইরে ঠিক সাইন বোর্ডটার পাশে। অনেক দূর থেকেই আলোটা নজরে আসে সবার। দীপালি পোকার মত ফুরফুর করে খদ্দের জুটে যায় মেলাই। পাশেই বিবির হাট। তবে তেমন হাট আর নেই। শোনা হায় নীলচাষের সাহেবরা নাকি এর পত্তন করেছিল। সে কি আর আজকের কথা। মদনও জানে না, কতদিন আগেকার ঘটনা হতে পারে!

বলহরি···

হরিবোল।

সাত বছর বয়সে কানি বোষ্টুমীর মালা বদল হল এক কেত্তন গাইয়ের সঙ্গে। কিন্তু কপালের লেখা কে আর মুছবে বল! সাপে কাটল লোকটাকে। কাল সাপের বিষ সারা দেহে বিছিয়ে নিয়ে লোকটা যখন কানিকে বিধবা করে রেখে গেল তখন ওর বয়েস চোদ্দ কি পনের। চোদ্দ পনের বছরের বোষ্টুমী, তিলক কেটে একতারা বাজিয়ে কেষ্টনাম গাইত। চলছিল মন্দ না। কিন্তু কি করে যে বোষ্টুমী ছিটকে এসে আছড়ে পড়ল এই বিবির হাটের অন্ধকার খুপরিগুলোর মধ্যে সে খবর কেউ জানে না। এমন কি মদনও না। মদনকেও সে কথা বলে নি কানি। জিজ্ঞেস করলে কেবল সাত রাজ্যি যেন ভেবে বেড়াত কানি। বলত না কিছুতেই।

সেই কানি বোষ্টুমী। গো-হাটার এককোণে কুটো কাঠি গুঁজে নেওয়া ঘরখানাই একমাত্র সম্বল হয়েছিল ওর শেষ দিন কটার। তবু মদনই মাঝে মাঝে খোঁজ খবরটা নিয়ে যেত। কখনো সখনো বা তেলটা নুনটা দিয়ে যেত কানিকে। কানি দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করত মদনকে।

গো-হাটার পথ দিয়ে যাওয়ার সময় শোনা যেত, কানি বিড়বিড় করছে, কিংবা কানি কেষ্ট নাম নিচ্ছে: বেলা গেল ও ললিতে কৃষ্ণ এল না, আমাব মালা হল জপমালা, উপায় হল না।

হয়ত তেমন কেউ হলে ফোড়ন কেটে উঠত, বলি ও কানি, আজ যে বড় গান ধরেছ গো?

ক্ষ্যাপাটে কুকুরের মত কানি তখন খ্যাঁক খ্যাঁক কবে উঠত, বিষ্ঠা খাগীব বেটাকে যমে নেয় না গো! ওয়াক থুঃ, ওয়াক থুঃ। কানি, এক চাপ থুতু ছেটাত মেঝেতে। আর কোনও প্রত্যুত্তর না এলে আবাব গেয়ে উঠত, ও ললিতে কৃষ্ণ এল না।

এয়েচি গো কানি।

কানি খানিকক্ষণ কান খাড়া করে শোনে। যেন গলার শব্দটা লক্ষ্য করেই গুম হয়ে যায়। তারপর একপাটি কালো দাঁত মেলে ধবে হেসে বলে, মদনা নাকি গো?

হুঁ, এলাম দেখা করতে।

বেশ করেছিস, ভালো করেছিস।

মদন ছ্যাখে, সারা ঘরখানা ভ্যাপসা ভেজা ভেজা। বাঁশের বেড়ার গায় শুকনো কফের ঝালর, মেঝেয় গর্ত গর্ত। এক কোণে জড় করা একখানা চট

আর একটা বালিশ, আর গোটা কয়েক শিশি কৌটো, একটা ময়ুরের পালকের ভাঙা পাখা, খানকয়েক নারকেলের মালা, আর বুক শুকনো একটা মাটির প্রদীপ।

মদন বলল, কি করছো গো মাসী ?

কানি দাঁত পাটি মেলে ধরে হাসল। মুখের কোঁচকানো চামড়ায় একটা টোল খেলে গেল। মদনের মনে হল কানি যেন এমনভাবে হাসে নি কোনদিন। না, বিবির হাটের সদরে দাঁড়িযে থেকে যে চটুল হাসিটা হাসত কানি তার সঙ্গে এ যেন আকাশ পাতাল তফাত।

কি গো, হাসছ যে বড ?

কানির মুখটা আবাব স্বাভাবিক হয়ে আসে। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপতে চাপতে কানি বলে, ছ্যাখ. মদন, আমার অনেকদিনেব সাধ···বলব ?

আহা বল না কেন ? কি নেকি কান্না জুড়লে দেখ দেখি !

সত্যি যেন কানি নাকি কান্নার স্বরে গলাটা শানিয়ে নেয়, তারপর আবার বলে, আমি মরে গেলে একটু কাজ কববি মদন ? আমায় গঙ্গায় নে যাবি ?

মদন হঠাৎ হো হো করে হেসে ফেটে পড়ে। মনে মনে বলে কানি বোষ্টুমীব গঙ্গা পাওয়াব সাধ ! গ্রামেব শ্মশানে লোভ নেই কানির। পাঁচ ক্রোশ পথ ডিঙিয়ে তাবক ডোমেব শ্মশানে যাওয়ার আশা। তিনকাল যে কেবল পাপ ঘেঁটেই মবল, গঙ্গা কিনা তার সকল পাপ বইবে। সৎকারই হয় কি না হয়, কানি ভাবছে তাবক ডোমেব শ্মশানের কথা। কিন্তু মদন মুখে বলে না কিছুই। কেমন মায়া মায়া হয কানিব বাষ্পে ছাওয়া চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে। বলে, এই কথা। তা এখুনি কি আব মবতে বসেছ নাকি !

না বে মবব। আমাব মন বলছে শীগগির মবব, দেখিস। একদিন এসে হয়ত দেখবি মরে কাঠ হযে পডে আছি ঘরে।

তাই যদি হয়, তবে তোমাকেও কাঁধে বয়ে ড্যাং ড্যাং করে নাচাতে নাচাতে গঙ্গা অবধি নিয়ে ফেলব, বলে রাখলাম। হল তো !

কানি আর কথা বলে না। বলবাব আব কিই বা আছে ! মদন ছ্যাখে কানির চোখ দুটো তির তির করে কাঁপছে।

এ ঘটনা ঘটেছিল আশ্চর্যভাবে দিন কয়েক আগেই। আজ সত্যি সত্যি কানিটা মরল। মরল না কেবল, মরে বাঁচল। মদন সংবাদ পেয়ে ছুটে এল

দেখছে।' দেখছে। বাঁকা চোয়ালটা না ছুঁয়েও ওর মনে হল ভীষণ ঠাণ্ডা আর শক্ত। ফ্যাকাসে ঠোঁট দুটো ঈষৎ ফাঁক হয়ে রয়েছে। মাথার চুলগুলো যেন যাত্রাদলের পরচুলার মত পাটভাঙা রুক্ষ। হাত পায়ের আঙুলগুলো শুকনো কুলোর মত শিঠানো। চোখ দুটো মরা মাছের চোখের মত ড্যালা পাকিয়ে বেরিয়ে এসেছে।

মদন ছুটল হরদয়াল ডাক্তারের বাড়ি। ডাক্তার নেই। না থাক, সার্টিফিকেট একটা জোগাড় হবেই। মদন ফিরল তার দোকানে। দোকান থেকে ছোকরাগুলোকে বার করল বুঝিয়ে শুনিয়ে, এক পাঁইট গিলিয়ে। তারপর তালা লটকিয়ে দোকান বন্ধ করে ভোলা বেরুল সার্টিফিকেটের ধান্দায় আর মদন রইল এদিকে। তারপর এই শবযাত্রা।

বলহরি···

হরিবোল।

সেই কানি বোষ্টুমী আজ সত্যি সত্যি মরল। যতবার মন থেকে কানির কথা মুছে টুছে সাফসুফ হতে চেষ্টা করল মদন: ততই তার মনে হতে লাগল যেন সে কানির কথাই তোলপাড় করে ভাবছে। খাটিয়াটা দুলছে। আর খাটিয়ায় শায়িত কানিও কেমন ড্যাবড্যাব করে করুণ দৃষ্টি মেলে মদনকেই যেন দেখছে।

ভালয় ভালয় এখন গঙ্গা অবধি পৌঁছুতে পারলে হয়।

বাতাস নেই। মই না দেওয়া মাটির ডেলায় লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটছে সবাই। ঐ তো আমসি সার চেহারা কানির কিন্তু ওজন কি!

বাসু বলল, মরলে মানুষের ওজন বাড়ে।

নরসিং সায় দিল, পাপ পুণ্যিরা ভর করে থাকে কিনা, তাই—

মদন চেঁচিয়ে উঠল, যেন ভয়টাকে আড়াল করে রাখবার জন্যই চেঁচিয়ে হরিধ্বনি দিয়ে উঠল, বলহরি ·

আবার সবাই খাটিয়াটা শূন্যে আছড়ে তুলে বিকৃতভাবে তাল ঠুকল, হরিবোল। চিৎকারটা বাতাসের উপর পাক খেতে লাগল।

নলহাটির চক পর্যন্ত এগোতে এগোতে বার তিনেক খাটিয়া নামাতে হল সবাইকে। কাঁধ বদলাবদলি করতে হল। নতুনভাবে দম নিয়ে ছুটতে হল

আবার। এখান থেকে এখনো ক্রোশটাক পথ। রাতটা যেন আরো জমাট বেঁধে যাচ্ছে। রোদে পোড়া মাটির ডেলা থেকে ভ্যাপসা সোঁদা সোঁদা গন্ধ ঘুলিয়ে উঠছে মাঝে মাঝে। দূরের গ্রামগুলো যেন ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে সেঁধিয়ে বসে জবুথবু হয়ে ঘুমুচ্ছে। আকাশে হীরে চুমকি বসানো তারাগুলি যেন পিটপিট করে তাকাচ্ছে, শবযাত্রা দেখছে। যেন জিজ্ঞেস করছে, কে চলেছে গো? কে চলেছে এবার?

কানি চলেছে। কানিকে চেন না? কানি বোষ্টুমী! আমার নাম কানি বোষ্টুমী, কড়ে রাঁড়ি নেইক স্বামী।

কোথাকার কি, কানির গাওয়া গানের কলি দুটোই মনে পড়ে গেল মদনের, কড়ে রাঁড়ি নেইক স্বামী।

গান গাইবার সময় কি সুন্দর চনমনে অঙ্গভঙ্গিই না করত কানি। হলুদঘাটার জমিদার হলধর চৌধুরীকে কানি ডাকত চৌধুরী রাজা, বেশ পটিয়ে পাটিয়ে কানের মাকড়ি, নাকের ফুল, গলার বিছা বাগিয়ে নিয়েছিল। সব গেছে। দিন গেছে। দিন যখন পড়তে শুরু করল সবদিক দিয়েই পড়ল। স্বাস্থ্য ভাঙল, সাকরেদ-দালালরাও এক এক করে ছাড়তে লাগল কানিকে। পোকায় কাটা জজ্জেটখানা শেষ পর্যন্ত ঘরমোছা ন্যাকড়া হল। কানির চোখের কোণে কালি পড়ল। হাত-পায়ের গাঁটে গাঁটে জং ধরল। কানি নামের সার্থকতা এতদিন পরে যেন প্রকট হয়ে উঠল। কিন্তু মদনা, মদন মালাকার আরেক জাতের লোক। দিল আছে মদনের বলতে হবে। মদনই একটা আস্তানা করে দিল কানিকে গো-হাটার পাশে।

রাস্থরা ভাবে, তাই কি! কানি বোষ্টুমীর ঘরের মেঝে খুঁড়লে কম করেও মণ খানেক কি চোলাই মাল বেরুবে না! মদনাগুণ্ডাকে রামা শ্যামা না চিনতে পারে রাস্থরা শত হলেও ওর দোকানের কর্মচারী বইতো নয়। কয়েকটি ফুল হঠাৎ কাঁপতে কাঁপতে খাটিয়া থেকে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। মদন লাফিয়ে উঠল, এই বিষ্টু, অতো ঝাঁকাচ্ছিস কেনরে হারামজাদা?

বিষ্টু বিড়বিড় করে উঠল, কাঁধ ধরে গেল বইতে বইতে, বলে কিনা ঝাঁকাচ্ছিস কেন? দেব চিত করে ফেলে!

ভোলা কি যেন রসিকতা করল। হেসে উঠল সকলে। মদন একবার আড়চোখে সবাইকে দেখল। আজ আর গালিগালাজ বকতে ইচ্ছে নেই

মদনের। অন্যদিন হলে হয়তো দু' চার ঘা বসিয়েই দিত মদন। কিন্তু আজ মনটা এমনিতেই ভার! তার উপর শত হলেও শবযাত্রা তো!

কানি চলেছে। এক অন্ধকার সমুদ্র থেকে উঠে এসে যেন আর এক অন্ধকার সমুদ্রের দিকে দুলতে দুলতে চলেছে। চলার তালে তালে খাটিয়াটা উঠছে, নামছে। মচমচ করে শব্দ উঠছে খাটিয়ায়। খাটিয়ার শব্দ নয়, রাতটা যেন কানির দুঃখে কাঁদছে।

পায়ের নিচ থেকে সরু আলের মাটি ধসে ধসে যাচ্ছে। পা পিছলে পিছলে যাচ্ছে সবার। কপালে ঘামের দানায় আঠা আঠা হয়ে উঠছে। অন্ধকার যে রকম ঘন, তেমনি ঝি ঝির বিরামহীন চিৎকার। দুটো চারটে জোনাকি পোকা কাপড়ে এসে আটকে যাচ্ছে। কানিকে ঢাকা দেওয়া চাদরের উপর বসছে। আবার ঝাঁকি খেয়ে লাফিয়ে উঠে শূন্যে ভাসছে।

কানির যখন দিন ছিল ওর সাকরেদ ছিল কত! বিশু ড্রাইভার, এনায়েত, হরি ঘটক আরো কত! বিবির হাটের টিনের ছাউনী দেওয়া খুপরীগুলোর মধ্যে প্রদীপ জ্বলত আর নিশাচরের মত হাটের একোণ থেকে ওকোণ অবদি ঘুরে ঘুরে বেড়াত এই লোকগুলো। এনায়েত সেবার সেই সে যুদ্ধে নাম লেখাল আর ফেরে নি। বেঁচেই আছে কিনা কে জানে! হরি ঘটক অক্কা পেল মায়ের দয়ায়। বিশু ড্রাইভার আজকাল লরী চালায় নাথু সামন্তর। কলকাতা অবদি লরি নিয়ে যায় আবার ফিরে আসে। কানির হাতের পুতুল ছিল এককালে। কানির দিন পড়ল, এক এক করে সবাই বেপাত্তা, হাওয়া। এমনিই হয়। মদন কিন্তু ছাড়তে পারল না কানিকে। যেন কানির শেষটা দেখবার জন্য মদনই সাক্ষী রয়ে গেল। কানিকে গঙ্গা অবদি টেনে নিয়ে যাবার জন্য, এই মদন ছাড়া আর কেউ তো এলো না! হরিবোল, হরিবোল।

কানির চোখ জোড়া আর একবার মনের মধ্যে তুলে ধরবার চেষ্টা করল মদন। একি! এ যে মরা মাছের চোখ, বীভৎস

বলহরি···

হরিবোল।

খাটিয়াটা আবার নামাতে হল। সামনে হোগলার বন! ভর [illegible] খেও
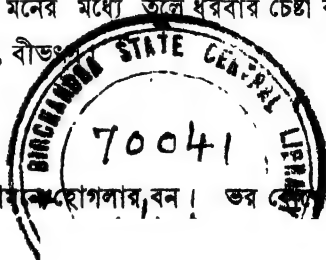
জল থই থই কাদা জমে থাকে। সাপ শেয়ালের আস্তানা। দিনের আলোতে গা ছমছম করে একা চললে তায় এখন তো রাত দুপুর। কাঁধের উপর মরা। অবশ্য খাটিয়া নামাতে হল অন্য কারণে। কানি বোষ্টুমী বড় বেশি দুলছে যেন। শক্ত করে আবার বেঁধে না নিলে হয়ত উলটে পড়বে মুখ থুবড়ে।

ফলে খাটিয়া নামিয়ে অনেকক্ষণ পর আবার সবাই হাত পা ছড়িয়ে জিরোতে বসল। বিড়ি ধরাল। রাত্রির অন্ধকারে ভোলা বিষ্টুদের যেন এক একটা ক্ষুদে ক্ষুদে জানোয়ারের মত মনে হচ্ছে।

নবসিং বিড়িতে সুখটান দিতে দিতে ভাঙা চোয়ালেব মাংসকে আরো খানিকটা টেনে নিল। তাবপব ধোঁয়াটা আমিবী চালে ছাড়তে ছাড়তে উচ্চারণ করল, আঃ।

হঠাৎ ভারী গলায় বিকটভাবে চেঁচিয়ে উঠল ভোলা, সাপ সাপ!

চমকে উঠে শুকনো চামড়ার মত টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল সবাই। কিন্তু ভোলাই আবার রহস্যটা ভাঙল হি হি কবে হেসে উঠে, কেমন ভড়কে দিয়েছিনাম ‹‹া দিকি?

ধুস্ শালা! মদন ধম্‌কে উঠল ভোলাকে, ভূত কোথাকার!

হোগলা বনটা পেরুলেই গঙ্গা। তারই গায় আদ্যাকালীর মহাশ্মশান। রাত বিবেতে শ্মশানযাত্রী এলে তারক ডোম বাতি ধবে অভ্যর্থনা করে। আর গোটা কয়েক নেড়ি কুকুর ল্যা ল্যা করে এগিয়ে এসে যাত্রীদেব চাবপাশে ভিড় করে দাঁড়ায়। হোগলা বন থেকে শেয়াল বেবিয়ে এসে কখনো সখনো শ্মশানের শুকনো হাড় শোঁকে।

খাটিয়ায় কানির দেহটা বোধ হয় এতক্ষণে জমে বরফে মত শক্ত হয়ে উঠেছে। মদন ধীরে ধীবে সাদা চাদরখানা কানির দেহের উপর থেকে সরাল। অন্ধকারেব মধ্যে ভালো নজরে আসছে না। তবু মদন যেন দেখল, কানির সমস্ত মুখ জুড়ে কী এক বীভৎস ঘৃণা দলা পাকিয়ে বেরিয়ে আসছে। হাতের আঙুলগুলো দুমড়ে কুঁকড়ে কি যেন আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করছে। ধীরে ধীরে নিজের হাতটা কানির হাতের উপর রাখল মদন, আর ঠিক সেই সময় ওর মনে হল, বিশ্রী একটা কটু গন্ধ যেন ওর নাকের উপর আছড়ে পড়ল।

বিদ্যুৎ স্পর্শ করার মত মদন একটা লাফ দিয়ে উঠল।

কি করছ গো মদনদা, মাল টাল আছে নাকি? নরসিং, ভোলা এগিয়ে এসে খাটিয়ার কাছে ঝুঁকে পড়ল।

মদন ফিসফিস করে বলল, দেশলাইটা জ্বালা দেখি!

রাসু দেশলাই জ্বালাল। আশ্চর্য, খয়েরী রংয়ের নিভু নিভু এক চিলতে আলোর মধ্যে সবাই দেখল, কানির বাঁ হাতের চেটো থেকে এক খাবলা মাংস উঠে এসেছে, আর সেই মাংসের উপর একটা মদের টিনের ঢাকনা খুলে গিয়ে সমস্ত মদটা চুইয়ে চুইয়ে সারা রাস্তা পড়তে পড়তে এসেছে। কাঠিটা নিভে গেল।

আবার জ্বালাল রাসু। আবার একটু ফিকে আলো। সেই কুষ্ঠ রোগীর ঘায়ের মত একখানা হাত। কানি বোষ্টুমীর হাত। পাশেই একটা মদের টিন ঢাকনা খোলা, শূন্য।

তাইত বলি, এত ওজন লাগে কেন? নরসিং বীভৎসভাবে মুখ টিপে টিপে হাসছে। মাংসের দোকানের সামনে কুকুর বসে যেভাবে জিভ মেলে হাঁপায় নরসিংও যেন ঠিক সেইভাবে হাঁপাচ্ছে।

মদন ঝাঁপিয়ে পড়ল খাটিয়ার উপর। এক ঝটকায় কানির দেহটা পাঁজা কোলে করে তুলে ধরল; শক্ত এক চাপ পাথর যেন।

· রাসু আবার দেশলাই জ্বালাল। খাটিয়াজোড়া আরো খান কয়েক মুখবন্ধ মদের টিন। টিনগুলোর মুখ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল সবাই। নাঃ, আরগুলি ঠিকই আছে।

রাসু বলল, একটা টিন মাটি করলে তো মদনদা। আমাদের দিলে খেতুম।

রাসুও মদনকে খুশি করার জন্য একগাল লোভাতুর হাসি হাসল।

মদন আবার কানিকে শুইয়ে দিল টিনগুলোর ওপর। ফাঁকে ফাঁকে কাপড় গুঁজে দিল। যেন শব্দ না হয়। তার পর সাদা চাদরখানা আবার বিছিয়ে দিল কানি বোষ্টুমীর আপাদমস্তকে।

বুকটা যেন দুড়দুড় করে কাঁপছে। নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে মদনের। আবগারী পুলিশের নজর এড়িয়ে মদ চোলাই এই প্রথম নয়। তবু মদনের বুকের মধ্যে ভীষণ তোলপাড় হচ্ছে যেন। একবার মনে হল, টিনগুলো আজ সঙ্গে করে না আনলেই হত! বারো চৌদ্দ টিন মদ ক' টাকাই বা হবে! কানির মৃতদেহটার কাছে নিজেকে যেন ফাঁসির আসামীর মত মনে হল মদনের। মদের টিনগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে হোগলা বনের মধ্যে ফেলে দিলে কেমন হয়!

না, তাও পারল না মদন।

মুহূর্তের মধ্যে সারা দেহে দরদর করে ঘাম ছুটতে শুরু করল ওর। পায়ের মাংসপেশীতে যেন খিঁচ ধরে বসল। পায়ের নিচে মাটি আছে কি নেই এই

অনুভূতিও যেন হারিয়ে ফেলেছে মদন। নাকের উপর একটা জোনাকি লেপটে বসেছে। হাতটা তুলে জোনাকিটা তাড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতাও যেন মদন হারিয়ে ফেলেছে।

আরো কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মদন। ভোলা-বিষ্টুরা আবার বিড়ি ধরিয়েছে। ফসফস করে দেশলাই কাঠি জ্বালাচ্ছে। ফ্যাকাসে আলো লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ছে খাটিয়ার উপর। আবার নিভে যাচ্ছে। হঠাৎ, আলোর ধাঁধায় অন্ধকারটা যেন আরো প্রকট হয়ে উঠেছে। মদনও তার ভারী ঠোঁট দুটো দিয়ে একটা বিড়ি চেপে ধরল। ঠোঁট দুটো কাঁপছে। বিড়িটা হয়ত এখনই পড়ে যাবে ঠোঁট থেকে। না, পড়ল না। মদন বিড়িটা ধরিয়েই ফেলল।

আবার যেন ধীরে ধীরে শক্তি ফিরে পাচ্ছে মদন। তন্দ্রাটা কেটে যাচ্ছে। আঃ! ভালয় ভালয় এখন গঙ্গা অবদি পৌঁছুতে পারলে হয়। আর দেরি করিস নে রে ভোলা, হরিধ্বনি দে—বলহরি!

ভোলা বিষ্টুরা চেঁচিয়ে উঠল, হরিবোল!

হোগলা বনের পাশ দিয়ে দুলে দুলে এগিয়ে চলল কানিবোষ্টুমী

তোপ

মেলাটা বেশ জমাটি হয়ে বসেছে। উইপোকার মত ঢিবি ভেঙে ছড়িয়ে লোকগুলি চারদিকে থিকথিক করছে। সরষে ছড়িয়ে দাও, ঘাড় গর্দানের ফাঁক গলিয়ে একটি কণাও নিচের দিকে নামবে না, এত্তো লোক জমেছে।

মাথা আর মাথা, গিসগিস করছে। আর মনে হচ্ছে, লোকগুলি যেন এ যুগেরই নয়, সেই দু' পুরুষ কি চার পুরুষ, কি আরো বেশ কয়েক পুরুষ আগের, কোন যাদুকরের এক ফুঁয়ে সবাই ছোট্ট হয়ে যেতে যেতে এত্তোটুকুন হয়ে গেল, তারপর মাছির চেয়েও ছোট্ট, আরো ছোট্ট বিন্দু বিন্দু আকার নিয়ে এই যে তোপটা দেখছ এর মধ্যে সেঁধিয়ে গেল; সেঁধিয়ে গিয়ে অনেককাল কাটাল, তারপর হঠাৎ বিদ্রোহ করার মত ভঙ্গি করে সকলে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এসে মেলাটা জমজমাটি করে তুলল।

তাই, হঠাৎ উনুনে ফ্যান পড়ে যাওয়ার মত ভসভসিয়ে চারদিক থেকে ধুলো উড়ছে। ধুলোয় ধুলোয় আকাশের নীল রংটাই যেন চটে গেছে। যেন খানিক এখানে খানিক ওখানে চল্‌টা উঠে গেছে আকাশটার আর বালি তাতা হাঁড়ির মধ্যে নুন মাখা চাল ফেলে মুড়ি ফোটাবার মত অদ্ভুত একটানা একটা শব্দ উঠছে।

আর, যাকে নিয়ে এই মেলা, সেই তোপটার গা থেকে এখন জ্যাবড়ানো তেলে গোলা ডগডগে সিঁদুর টুপ টুপ করে শান বাঁধানো বেদীর উপর পড়ছে। শাশুড়ী বউয়ে এত সিঁদুর মাখিয়েছে, আর, হাতের নোয়া তোপের গায় ছুঁইয়ে আমৃত্যু এয়োতি হওয়ার বাসনা মনে ধরেছে, আর ফুল ছড়িয়েছে। ফুল! থোকা থোকা, ডাঁট ভাঙা, ছেঁড়া, গোটা, পাপড়ি খোলা, ফুটব ফুটব করা অজস্র ফুল দিয়ে ডুবুডুবু করে ফেলেছে তোপটাকে। এত ফুল ছড়িয়েছে সবাই। এত শ্রদ্ধা দেখিয়েছে।

ভাবতেও অবাক লাগে, এই তোপটাই যে ধর্মের তিরিশ দিন এখানে একা একা পড়ে থাকে, কে বলবে এখন! আর পড়ে পড়ে যে হাঁপায় তা কি বিশ্বাস

করবে কেউ না দেখলে ? এইতো মাত্র দশ-পাঁচিশ হাতও বুঝি হবে না গঙ্গার ঢালু পাড়, বুনো বিছুটি আর আঁশ-শেওড়ার ঝোপের গোড়ায় গোড়ায় গঙ্গার জল ঘোলাটে হয়ে ছুটছে সাগরের দিকে, এ কি তিনশ চৌষট্টি দিনই তোপটাকে ব্যঙ্গ করে নাচতে নাচতে ছুটোছুটি করে নি। আর অথৈ সিন্ধুর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে একি আর বলে নি, জানো আজ কি দেখে এলাম···এমন যে গঙ্গা, সেও আজ কেমন অবাক হয়ে তোপটাকে দেখছে। আর বুঝবার চেষ্টা করছে ঘটনাটা। একি রে বাবা, একি হল, য়ঁ্যা ?

বাব্‌বা বাবা, অজ গাঁয়ের আশেপাশে এত লোকও ছিল।

এদিক ওদিক সেদিক কোন দিকটার কথা বলি। ডালমুট থেকে চাল-মুগরার তেল, আরশি-কাঁকুই থেকে শুরু করে কালীমার্কা সাবান, জাল-পলুই-কুলো, সরা-পাতিল, আগড়ম-বাগড়ম, মাটির-সোলার-কাগজের খেলনা, বিবিয়ানা-বাবুয়ানা নামধারী পুতুল।

আহহা, পুতুল নাতো, ঢপ। আহ্লাদী। ওহে তোমার বিবিয়ানা কত করে দিচ্ছ ?

ঘেঁট নি, ঘেঁট নি বাপু, ঘরের মাগ পাও নি, ঘেঁট নি।

কি ?

কি আবার, লেবে তো লাও, না লেবে তো···দু' দু' আনা···দু' দু' আনা। বাবুয়ানা তামাক খাবে, বিবিয়ানা গান গাইবে, দু' দু' আনা···

চকচকে চোখের মণি ঘুরছে। নোলক প্যাট্‌প্যাট্‌ করে নাকের পাতলা পাতায় ফুটিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেই কোন ইজেরখসা বয়সে, সেই নোলক এখন পুরুষ্টু মুখের শোভা হয়ে এপাশ-ওপাশ ঘুরছে। কারো জামা গায়, কপালের পাতলা চামড়ায় কাঁচপোকার টিপ। কারো টুকটুকে রাঙা সায়া বেরিয়ে পড়া ঢুলঢুল হাঁটুনি। শাড়ি সামলানোই দায় হয়েছে কারো। কারো জামা নেই বুকে, জামা রাখবে কি, ঘাড়ে পিঠে প্যাচ-প্যাচে ঘাম আর ধুলো। ধুলো আর ঘামে ভারি হয়ে ফোঁটা জমেছে চিবুকে। আকন্দর ডাঁটা পুট করে ভেঙে ফেললে যেমনি একটু সাদা আঠা আঠা কস বেরয়, তেমনি।

দ্যাখো দ্যাখো, কাণ্ডখানা দ্যাখো। এমন এখন-তখন পোয়াতি হয়ে কেউ এখানে আসে!

ড্যাবড্যাব করে ছোঁড়াগুলি দেখছে, আর চোখ দিয়ে চকচক করে চাটছে যেন বেচারীকে।

তা হোক; খেদির মা, কিংবা বুঁচির পিসী কিংবা নবাব বউ যেই হোক না সে, তোপহাটার মেলা বছরে একবারই হয়, আর এই চৈত্র সংক্রান্তির দিনটিতেই। এই দিনটিতো ওর স্বস্তি পাবার জন্য অপেক্ষা করে প্রসব শেষে আসতে পারে না। তাই ওকেই আসতে হয়েছে ভারি পেটে, থপ থপ করে হাঁটতে হাঁটতে···

চেরনখানা কত গো?

প্লাস্টিকের দুধ-রাঙা চিরুনি, চিকন চিকন দাঁড়, কাঁটার মুখ বেশ ধারালো। আঙুল দিয়ে এপাশ ওপাশ টানতে বেশ লাগে, যেন ভাদ্রের হাঁটু উঁচু ধান গাছের ছুঁচলো চিকন পাতার উপর হাতের চেটো বুলিয়ে একবার ঢেউ খেলানো। উকুন অবদি উপরে ফেলবে এই চিরুনিতে।

কত করে গো···ও কর্তা, শুনছ?

সওদা গুছোবার সময় পায় নি দোকানদার। ঝোলাঝুলি বার করতে না করতেই ছিলিবিলি। জানতুম এই হবে···কালিগঞ্জ মালিগঞ্জ মধ্যে তোপের হাট···অবশ্য হাট নয়, কোনকালেই হাট বসে নি এখানে, সবাই জানে বোমপাড়ার মাঠ, যার দক্ষিণ কোণে বামুন-মারা দহ, সেখান থেকে আরো খানিক হেঁটে এসে গঙ্গার পাড় বরাবর এই সাবেকী কালের তোপ। রাত বিরেতেও আসে না কেউ এখানে, আর দিনে দুপুরে? হঠাৎ আসা বোলতা বা মৌমাছির মত একজন কি দু'জন এল আর অমনি হন্‌হন্‌ করে চলে গেল।

গঙ্গার উপর দিয়েই তবু যা হোক কিছু মাঝিমাল্লা হাটে গঞ্জে যাওয়ার পথে তোপের দিকে তাকিয়ে দ্যাখে, আর দেখতে দেখতে ভাবে, না জানি কত কথা। আর ছই ঢাকা পাল খাটানো নৌকায় সোয়ারী যদি তেমন কোন নয়া-কাতিক থাকে তাহলে বলবেই বলবে, ওটা কি হে?

এজ্ঞে, তোপ। হাতের বৈঠা জল থেকে হাত দুই উপরে উঠে শক্ত হয়ে থাকে।

তোপ! কার তোপ?

এইবারই সমস্যা মাঝির। কি বলবে! হাঁা, বলতে পারে, যেমন বলে ঝি-দহের জমিদারি খোয়ানো চাষীরা। চান্দ রাজার, না না, এ সেই পুঁথিতে লেখা চান্দ নয়, এ আর ক'দিনইবা আগের কথা, জনাবালীর দা-ঠাকুর যে বার হেঁদু থেকে মোছলেম হলেন, সেবার চান্দ রাজা কিনে ছিলেন এই তোপটাকে···জনাবালী বেঁচে নেই, থাকলে সে বলত, অনেক কালই সে

বলেছে, বুঝেছ, দা-ঠাকুর এর গোলার মুখেই নিজেকে কোরবানী করেছিলেন প্রথম।

কেন গো কেন ?

আরে ছাই আমার, তাও জানো না সুমুন্দির পুত! তাহলে শোন. জনাবালী, সে এক মস্ত-সস্ত কেচ্ছা গাইত। কোন্ এক বাবু নাকি কেতাব বানিয়ে তাইতে সব নেখেছেল, জনাবালী সে সব কথাও বলত।

তবে যে তুলহান বিবির শ্বশুরবাড়ি বাড়ি চামর তুলিয়ে গান গায়, জব্বার নামেতে এক ছেল মোছলমান, বনবিবির কৃপা লাভে হয় মহীয়ান। সর্বস্ব খুইয়ে জব্বার নির্বাসিত হয়েছিল বনে। রাজ্য-পাট ধন-সম্পদ সাথী-সজ্জন সব হাবাল জব্বার। হাবিয়ে বনে বনে ঘোরে। ঘুরতে ঘুরতে বনমাতা বনবিবির সঙ্গেই দেখা। এর কৃপা যে পায় তার মত ভাগ্যবান আর কে ? সাহস পেল জব্বাব, শক্তি পেল, লোকলস্কর সৈন্য পেল, আর পেল এই যে তোপটা দেখছ, এটা।

কালো তেল কুচকুচে কডাই, মেশিন ধোয়া জলেব মত রং হয়েছে তেলেব, সেই তেল ফুটছে শব্দ করে। বেসনেব কুচিগুলো ঘিবে ফেনা জমছে। পাঁপব ফুলছে, আঁকা-বাঁকা অসমতল হয়ে মুচমুচ করছে পাঁপর, ঝুডিতে, হাতে হাতে পাঁপর, ঘুরছে। ফুল বাতাসার মিষ্টি গন্ধে বাতাস ভুরভুর করছে।

কাঁচি বাঁশের উপব দিয়ে এপার ওপার দড়ি টান-টান টানানো। তার উপব ঝুঁক কষে হাঁটতে হাঁটতে খেলা দেখাচ্ছে মাদারি। মাদারি বউ ঢোল পিটছে ডিমি ডিমি ডিমি ডিমি ডিমি·· রেকাবি হাতে মেয়েটা বাবুদের সামনে এসে করুণ চোখে তাকাচ্ছে। টুং টাং শব্দ হচ্ছে, পয়সা পড়ছে ত্নটো একটা ··

খেলা বেশ জমছে। মেয়েটারই গলা কাটবে তার বাপ। তাজা রক্ত দু'হাতে লেপটে নিয়ে ঢাকা চাদরের বাইরে থেকে হাত তুটো দেখাবে। তারপর সে তার হাত তুটো পেটেব উপব ঘষবে। পেটের জন্যই অনর্গল বকে বকে খেলা দেখায় মাদারি। মাদারি বউ ঢোল বাজাচ্ছে ডিমি ডিমি ডিমি ডিমি ডিমি·· লোক থিকথিক করছে আর ধুলো উড়ছে ভসভস করে।

ধনাই গাজীর গীত, শুনতে শুনতে বিভোর হয়ে যেতে হয়। জব্বার গাজীর তোপ ভাবতে ভাবতে কত দীন মনে হয় নিজেদের, তাই না ?

আরে রাখো রাখো, মেলাই আর ব'কো না। যেমন দেশ তার তেমন সব খানাই-পানাই। আসলে কি জানো, পর্তুগীজ দস্যুরা জাহাজে করে এই তোপ এনেছিল এদেশে। তারপর লড়াই করেছিল প্রতাপের বিরুদ্ধে। সে কি লড়াই! লড়তে লড়তে প্রতাপ দু' পা পেছোয় তো লাল মুখোরা দশ পা এগোয়। আবার প্রতাপ এগোয় তো ওরা পেছয়। এই চলল কয়েক রাত। দিনে নিঃঝুম। বন্দুক হাতে, মুরগী খোঁজা চোখ নিয়ে, খায়-বসে-জিরোয় দু'পক্ষের সৈন্য। চারপাশ থমথম করে বারুদে আর পোড়া চামড়ার গন্ধে। আবার রাত হলে ডিঙ ডিঙ ডিঙ ডিঙ কাড়া নাকাড়ায় কাঠি পড়ে। উল্লাস আতঙ্ক চিৎকার সব মিশে বীভৎস হয়ে চেপে বসে মাথার উপর। আর এমন সময় তোপের মুখ থেকে গোলা বেরুতে শুরু করে। আগুন আগুন, অসংখ্য কুচি কুচি হয়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। লাল ডগডগে সিসে-গলা টুকরো ; রক্তমুখী হাউয়ের মত, তাজা মানুষের চামড়া, মাংস, হাড়-পাঁজরা, মাথার খুলি লক্ষ্য করে সাঁই সাঁই করে আসতে থাকে। আগুনের বৃষ্টি নামল যেন। ছুঁচলো, ধ্যাবড়ানো, তেকোণা, খইয়ের মত কুচিকুচি, চারপাশ ফোটা ফোটা, ধারালো, লক্ষ লক্ষ টুকরো· এখানে ওখানে সেখানে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

হ্যাঁ, একজন নয়, দু'জন নয় এই তোপটাই অনেক অ-নে-ক মারল, আবার অনেকে মরা দেহের আবডাল দিয়ে বুকে হেঁচড়ে হেঁচড়ে এগোল, যেন পাঞ্জা লড়ল মৃত্যুর সাথে। এসো, কত মারবে, এসো দেখি।

তা বটে, লক্ষ লক্ষ সৈন্য প্রতাপের, আর তোমাদের কাছে কজন? শেষ পর্যন্ত গোলাগুলি ফুরিয়ে গেলে পর পিঠ বাঁকা করে পেরেক ফোটা পায়ের মত লাফাতে লাফাতে লালমুখোরা দে ছুট, দে—ছুট।

তোপটা এলো প্রতাপের মুঠোয়।

তা জানো, সেই যে বারুদের গলগলে ধোঁয়া, বৃষ্টি পড়ে হঠাৎ নিভে যাওয়া চিতার মত ভ্যাপসানো গন্ধমাখা, সেটা যেন এখনো একটু একটু লেগে আছে ওর গায়। শুঁকে দেখ নি বুঝি তোপটাকে?

আর নলের মুখে মুখ দিয়ে কখনো 'কুক্' করে শব্দ করে দেখেছ? কুক্ কুক্ কুক্ কুক্ কুক্ কতগুলি 'কুক' কান্নার মত তোমার চারপাশে আছড়ে পড়ত, দেখতে!

জোনাকি পোকার মত চুমকি আঁটা শাড়ি, শঙ্খকলি, কল্কেকলি, আঁশপাড়

হিজলডাঙ্গা, তা হোক, সবচে' বেশি বিকোচ্ছে কিন্তু কামরাঙা-রং পাটের শাড়িগুলোই। বিকোবে না, সস্তায় সস্তা, জেল্লাকে জেল্লা।

মাথার উপর ঝাঁ ঝাঁ করে করে রোদ চড়ছে। আর সব দিনের মত আজ আর টিকির টিকির করা ভাবটা একেবারে নেই। দিনটা ছুটছে যেন ঘোড়ায় জিন খাটিয়ে। এইতো খানিক আগেও সূর্যটা কেমন টলটল করে নাচছিল গঙ্গার ঢেউয়ের উপর। যেন টাটকা ইলিশের চকচকে আঁশের উপর রক্তের ছোপ ফেলেছে মাছউলি!

আর এখন, খ্যাখো দেখি কাণ্ড, মাথার ওপর যেন প্রকাণ্ড একটা তাতা কড়াই উপুড় করে ধরেছে কেউ। ইস্ কী তাত্ রোদের!

মর জ্বালা চোখে দেখ না নাকি! যতো সব উড়নচণ্ডী।

আহাহা, চটছো কেন মশাই! তা'লে বলি···

কি বলবে, কি কি? দশজন এসে ছেঁকে ধরল। ঘাড়ের উপর দিয়ে, বগলের নিচ দিয়ে মাথা গলে গলে এগোতে লাগল।

রক্ষে কর বাবা, দম চেপেই মারা যাব। দেখে আর কাজ নেই—

তাহলে বলি, আদি কস্তুরী সালসা। হঠাৎ আছাড় খেয়েছ, মচকে গেছে পা, ঘাড়ে রস জমে জগদম্বা কালীর মত ইয়ে হয়েছে···

ধুত্ তোব নাকুচি করেছে···

বাতে ধরেছে, রক্ত দুষ্টি হয়েছে···

ধন্বন্তরীর গুষ্টির ইয়ে করেছে···

মাত্র চার আনা···আদি কস্তুরী···মাত্র চার আনা···

হ্যাঁ যা বলছিলাম, তোপটা অনেক কালেরই পুরোন, কিন্তু ওর গায়ে একবার হাত বুলিয়ে খ্যাখো দেখি, একটু আচড় লাগে নি গায়ে। হতো আজকালকার তৈরী মাল, দেখতে দু'দিনেই কেমন ঘিয়ে ভাজা কুকুর হয়ে পড়ে রয়েছে চিত হয়ে। তা, অনেক কালই তোপটা পড়ে রইল, এই এখানেই। বুনো-বিছুটির ঝোপের ফাঁকে সারা গা ডুবিয়ে কেবল পাকা শিকারীর মত নলটা তার আকাশের দিকে তাক করে পড়ে রইল। তারপর একদিন ভারত স্বাধীন হল। আকাশ-বাতাস যখন স্বাধীনতার আমেজে ডগমগ, ঠিক এমন দিনে এলো একদল বাঙালী আর পাঞ্জাবী সাহেব। কি সব তারা দেখল চারপাশ ঘুরে ঘুরে। তারপর চলে গেল। কিন্তু কি দেখলিরে বাবা, বল না, কি লিখলি সব তোদের খাতায়। মরুক গে, যতসব উড়নচণ্ডী।

ওমা, মাস কয় যেতে না যেতেই আবার আর একদল। তখন চৈত্র সংক্রান্তি ধরো ধরো। তোপের গোড়ায় কোদাল গাইতা চালাতে লাগল।

কি হবে মশাই এখানে?

বাঁধাই হবে বিলিতি মাটি দিয়ে।

অ।

বাঁধাই হয়ে গেল। ধাপ ধাপ সিঁড়ি কেটে গঙ্গার পাড় বাঁধা হল। তোপের চারপাশ তকতকে ঝকঝকে হয়ে গেল। যতকালের বক-শালিকের শুকনো চুনের মত গু আর ফাটব ফাটব করা ফোড়ার মত তেল সিঁদুরের চাপ ঘষে মেজে উঠিয়ে দিয়ে গেল। হাত পঁচিশের গণ্ডি করে একটা লোহার তারের বেড়াও দিয়ে গেল। আর সেই গণ্ডির মধ্যে দু' পাশে দু' জোড়া সিমেণ্টের বেঞ্চি বসিয়ে দিয়ে ওরা চলে গেল।

তোপটা নাকি উঠিয়েই নিয়ে যেত।

কেন? এখনো কি এসব তোপ গোলায় যুদ্ধ হয় নাকি?

আরে না-না, এ হচ্ছে সাবেকি কালের তোপ। এটা নাকি ওবা যাদুঘরেই বাখত। রাজ্যের লোক তো আর এখানে এসে দেখে যেতে পারে না একে, যাদুঘরে গিয়ে আর দশটা জিনিসের সঙ্গে এটাকেও দেখত। তা, তোপ-হাটার কপাল ভালো, নিয়ে যায় নি ওরা।

পাঞ্জা লজেন্সের কাঠি বেয়ে মুখের লালা গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে। চিবুকের ডগায় পানের কষের মত একটু আভা লেগেছে। কুচো কাচ্চাদের মাজার তাগাঁয় রাজার মাথা আঁকা ফুটো করা তামার পয়সা ঝুলছে। ন্যাংটা ছেলেটার গায় হাঁটু ঢাকা জামা আর মেয়েটার সস্তা বুরুশের মত চুলে ছেঁড়া পাড়ের গিঁঠ। পাঞ্জা লজেন্স হাতে হাতে ঘুরছে। ছেলে-ছোকরা, বুড়ো-হাবড়া, বউয়োরী-ঝিইয়োরী, বাবাঃ বাবা, ভিড়ের যেন এদিক সেদিক নেই।

নাগর দোলায় চড়বি?

ওরে বাপ রে, ভীষণ পেট গুলোয়, বুকের মধ্যে উরুম ধুরুম করে।

তা'লে চল কালীর নাচ দেখি, চল না।

ধুর ধুর, গায়ে কালি লেপে রাঙুটি পরে জিব বার করে ধেইধেই নাচলেই কালী হয় নাকি! দেখিস নি জানকী ঠাকুরকে, কেমন রূপো চালাই স্বাস্থ্য ছিল বল দিকি নি? নারকেলের মালা বুকে বেঁধে যখন খাঁড়া হাতে এসে দাঁড়াত চিনতে পেরেছ কখনো, মেয়ে না মরদ?

তা ঠিক, তা ঠিক।

আর এ যেমন মেলা তার তেমন কালী। গাল তোবড়ানো, শির ফোলা হাত পা, আরে বাপু কালী সাজলেই কি কালী হওয়া যায়!

তালে চ' কাটা মুণ্ডুই দেখি।

জোলাই গামছা দুলছে। ভাতের মাড়ে চড়বড়ে কাগজের মত, দুলছে। আব লেজ দোলানো সোনাব টিয়ে, মাথা নাচানো পুতুল, ডালের কাটা, কাঠেবও আছে লোহারও আছে · কাঠের দশ পয়সা, লোহার পাঁচ আনা।

এই তো বাপু দশ টাকার খুচবো দিয়ে দিলুম খদ্দেরকে, আব নেই।

তা'লে?

তা'লে আর কি? যাও না বাপু ঘুবে এসে পয়সা নিয়ে যেও।

হ্যাঁ এদিক থেকে ওদিক যাই আর তোমার দোকান হাবাই, বাহ্।

দাঁড়াও তবে দেখছি গণেশেব কাছে।

এ্যাঁ খউব ব্যবসা শিখেছিস গণশা, বাটা দেবে। গাছ থেকে আসে? ও দাদা দুটো পাঁচ টাকা ছাড না গো।

এই যতে পুতুল খেলাটা দেখাবি? তোপেব খেলা দেখাচ্ছে।

এই তো দেখে এলাম, মাইবী কি নাইস করেছে, গুট গুট কবে হাঁটুনী, খুট খুট করে হাত পা নাড়া, নাইস নাইস।

পাড়া দাপানী ধনাব বউ একটা কাণ্ডই কবেছে।

কি কবল আবাব?

এই গেছিলো ড্যাং ড্যাং কবে নাচতে নাচতে, হুডকে পড়ে মাজার হাড় ভেঙে এখন কেমন চেঁচাচ্ছে দেখগে যাও। কালী ডাক্তারে পুরিয়া গিলেও নাকি ব্যথা কমছে না। গাছতলায় বউকে শুইয়ে বেখে ধনা এখন তেল ডলছে ওর মাজায়। যা দেখে আয়।

মাইরী?

তোকে ছুঁয়ে বলছি।

ট্যাং ট্যাং কবে একটা কাঁসি বাজিয়ে অষুধ বিক্রি করছিল লোকটা। ভিড়ের চাপে ওদিকে এগোয সাধ্যি কাব। কিন্তু হঠাৎ বেখাপ্পা হযে কাঁসিটা থেমে গেল। আর লোকগুলি পড়িমরি কবে ছুটতে শুরু করল।

কি হল রে, এ্যাঁ?

এই, কি হয়েছে বল না?

কে বলবে! পালা পালা পালা। ওরে বাপরে ষাঁড়টা কি ফোঁস ফোঁস করে তেড়ে আসছে, বাবাগো, গেছিগো, পালা পালা…

ভিড়ের চাপে চরকির মত আছড়ে বন্ বন্ করে সবাই ঘুরতে থাকে। বুড়োটা হড়কে চিত হয়ে পড়ল, বাচ্চাটা চিৎকার করে উঠল গলার রগগুলি টানটান করে। বউটা যার ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়েছে, সে যে কি সব বলছে বিড়বিড় করে বোঝা যাচ্ছে না।

যেন ঘূর্ণিভূতের ধুলোর মত লোকগুলি বন বন করে পাক খাচ্ছে। পাক খেতে খেতে এক সময় আবার ফুস মন্তর হয়ে উত্তেজনাটা থেমে গেল। থিতোনী এল। ষাঁড়টা মাঠ ভেঙে দৌড়চ্ছে, আর তার পেছন পেছন লাঠি হাতে ষণ্ডা কয়েকজন। বিপদটাতো কাটল, কিন্তু দিনটা যে এদিকে ঢল-ঢল। গঙ্গার জলে আবার টকটকে লাল রংটা এখনি ভোজবাজির মত আবির্ভূত হবে।

ট্যাং ট্যাং করে যে কাঁসিটা বাজছিল সেটা কিন্তু আর বাজতে শুরু করল না। থেমেই রইল। কিন্তু ডুগডুগিটা যেন আবার বাজছে, হ্যাঁ ঐতো ডুগ ডুগ ডুগ ডুগ…ভালুক নাচ হচ্ছে…ডুগ ডুগ ডুগ ডুগ…ভালুকচন্দ্র শ্বশুর বাড়ি যাবে। আজকে এই বুঝি তার শেষ শ্বশুর বাড়ি যাওয়া। এরপর তো রাত হবে, তখন কি আর ভালুকরা নাচে? ডুগডুগি বাজছে, ভালুক নাচ হচ্ছে, শেষ নাচ ভালুকের, শেষ খেল!

রামায়ণের তিরাশি পাতায় এবার চোখ ফেরাল মেয়েটা। এক পাতা থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে এতদূর এগিয়ে এসেছে সে।

গ্যাস বাতির ছিপি খুলে জল ঢালতে গিয়ে লোকটা কেমন হাবার মত তাকিয়ে রইল, না তাকিয়ে উপায় নেই, কারণ সে দেখছে তার সামনেই মুখোশ পরা কিম্ভুত এক বেলুনঅলা, তার টিকির চুলে বাঁধা গুচ্ছের লাল নীল ফোলানো গ্যাস বেলুন। বিক্রি করছে সে। টিকিটা তার আসল না নকল কিছুতেই বুঝতে পারছে না লোকটা, বুঝবার চেষ্টা করছে, কারণ ফন্দিটা তার মনে ধরেছে।

ঘুঙুর বাঁধা পা নাচতে নাচতে চলে গেল। আর এমন সময় গ্যাস লাইটটা দপ করে জ্বলে উঠল। অন্ধকারটাকে বাঁধা দেবার জন্য চার-দিকেই হ্যাজাক জ্বলে উঠছে। সমস্ত দিনের ক্লান্তি যেন অন্ধকার হয়ে সবার চোখে মুখে লেপটে বসতে চাইছে।

মেয়েটা সুর করে রামায়ণ গাইছে তবু। সামনে পেতে রাখা গামছায় পয়সা পড়েছে ঢের। ডাঁটো স্বাস্থ্যে জলজল করছে মেয়েটার মুখ। হ্যাঁ, ভুলে গেছি বলতে, বোষ্টম পাড়ার ছ'কড়ি বোষ্টম এক পালা গান গেয়েছিল মেলায়, গতবারইতো, মনে নেই? সেই যে রাম রাবণের যুদ্ধ, সীতা হরণের পরিণাম। মনে নেই লঙ্কাকাণ্ড! বিভীষণ যুদ্ধ করেছিল কি নিয়ে দেখিস নি?

হ্যাঁ হ্যাঁ, যত সব আজগুবি!

আজগুবি কেন? পুঁথি ঘেটেছো কখনো? তখন কি আর যুদ্ধ হত না মেঘের আড়ালে, রথে চড়ে? আর মাটিতে যে অগ্নিবাণ নিয়ে লড়াই চলত সেটা কি তোমার ছুঁচো বাজি নাকি?

তাই বলে এই তোপটা বুঝি সে যুগের···অতদিনের ·ছ'কডি বোষ্টমেরও যা কাণ্ড!

কথায় কথা বাড়ে। কথায় কথায় কাহিনী হয়। কথার যেমন মাথা নেই, মুণ্ডু নেই···কাহিনীরই কি আছে! দেখ না কবেকার তোপ, কার তোপ কে জানে, কে মাথা ঘামিয়েছে এ নিয়ে। তো—প তোপ। তার আবার অতশত কিবে বাবা! তা কাল্লুর সঙ্গে পচার একচোট হয়ে গেল।

কেন কেন, কি হল আবাব?

যাঃ চুলো, তাও জানিস না, কি দেখছিস তাহলে? পচা নাকি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছিল এ মীরজাফরের তোপ। সেই যে বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর। সোনাব বাংলার পায়ে শেকল পরালো যে, এ নাকি তারই তোপ ছিল এককালে। তা বেশ। কাল্লু হয়তো হজম করেই যেত, কি আছে এতে চটবার। কিন্তু বাপু কাল্লুকে তুই মীরজাফবেব বংশধর বলতে গেলি কেন।

তাই নাকি, খুঁচিয়ে ঘা বানাতে যাওয়া, মর মর।

একটা অবসাদ নামছে। সারাদিন হেঁটে হেঁটে হাত পায়ের গাঁট টন টন করছে বুঝি লোকগুলির। নাগরদোলার শেষ পাক হয়ে গেছে। ভালুক নাচের ডুগডুগিটাও থেমে গেছে অনেকক্ষণ, ভালুকচন্দ্র শ্বশুর বাড়ি চলে গেছে। তবু, হ্যাঁ তবুও বলব, হ্যাজাকগুলি জলজল করে জলতে জলতে সবাইকে ডাকছে, এসো, এসো একটু এগিয়ে এসে ঠাসাঠাসি হয়ে থাকো। এসো, এসো না। এতটুকুতেই হাঁপিয়ে গেলে?

কি রে, কথা বলছিস না যে?

কি বলব?

বেশ গাইছে, না রে?

হুঁ!

হুঁ কি?

বেশ দেখতে কিন্তু!

আর একটা পয়সা পড়ল। ঠকাস করে লাফিয়ে পয়সাটা ওর হাঁটুতে লাগল। মেয়েটা তবু রামায়ণের পাতা থেকে চোখ তুলল না। বইয়ের পাতায় চোখ রেখেই গাইতে গাইতে ভাবতে লাগল, একশ পাতার আর কত দেরি? আর কতক্ষণ...

আলোগুলি এখন সাপুড়েদের মত সাপ নাচানো খেলা খেলছে। লোকগুলি আবার ছোট্ট হয়ে যেতে যেতে মাছির মত এই এতটুকু হয়ে যাচ্ছে। এইবার ধীরে ধীরে সবাই বিন্দু বিন্দু হয়ে গিয়ে সুড়সুড় করে এই তোপের খোলের মধ্যে ঢুকে যাবে। কাল থেকে আর টু শব্দটিও থাকবে না। থাকবে না ততদিন যতদিন না আবার আর একটা চৈত্র সংক্রান্তি আসে।

অবশ্য কাল, তোপের চারপাশে তাকিয়ে থেকে শুধু একটা কথাই মনে হবে, তোপের মধ্যে যে অভিশপ্ত লোকগুলি আশ্রয় নিয়েছে, দু' পুরুষ কি চার পুরুষ কি বেশ কয়েক পুরুষ আগে, তারা একটু বাইরে বেরিয়ে এসে নিজেদের হাত পায়ের জং ছাড়িয়ে নিয়েছিল শুধু চৈত্র সংক্রান্তির দিনে।

তোপের খোলের আবরণ ভেঙে ছয় ঋতু বারমাসই কি ইচ্ছে মত চলাফেরা করতে পারে কেউ! তোপের গায়ে হাত বুলিয়ে কি বোঝ নি, কি ঠাণ্ডা; বোঝ নি, কি কঠিন। বাপস্।

ধানপোকা

এক

হরেদরে কাশ্যপ গোত্রের মত এক চাষার সম্বল ছিল গুটিকয় কিস্‌সা। কিস্‌সা বা কেচ্ছা, ভদ্রলোকের ভাষায় পরস্তাব। পরস্তাব শোনাতে পারলে চাষার আর নাওয়া-খাওয়া নেই, তা সে ঠাটা-পোড়ানি রোদই হোক, কি খোয়া-পচা বৃষ্টিই হোক, চাষার কোন হুঁশই থাকে না। থাকবে কি, কিস্‌সা শোনাতে পারলে যেন পরমান্নের আস্বাদ পায় ও।

চাষা বলে পান্তা ভাতে নুন জোটে না কিনা নম্বর মা, তাই বেগুন পোড়ায় তেল মাখনের খোয়াব দেখি। শুনবা নাকি একখান?

নম্বর মা ঘাড় কাত করে, কও।

চোত-বোশেখের ছাল-পোড়ানী বাতাস বইছে মাঠময়; গালে গলায় বুকে আগুনে-বাতাস যেন ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করে জিভ বোলাচ্ছে। আলের ওপর চিকরি কাটা বাবলা গাছের ছায়ায় চাষা হাত পা ছড়িয়ে একটু জিরোতে বসে। নম্বর মা যেমনি সোহাগে ওকে এক সানকি জল-পান্তা খাওয়াল তেমনি সোহাগেই এখন বাটিটা গামছায় পুরে হঠ্‌কা গিঁট কষল। এবার ি◌ ্কে খাওয়ার পালা।

চাষা বলল, আহা, কিবা কই, ছাইকপালীর কিস্‌সা। সে এক বিবি, তার না আছিল সোয়ামী, না আছিল দেওর-ভাসুর। ভাঙা কুলোয় ছাই ফেলনের নাহাল, লক্ষ্মী-অলক্ষ্মী ঝাইড়া-পুঁইছা দিবা সে ঠাঁটের ঠাইরেন হইয়া বইছিল। শুনবা?

আহা, কও, কর্তা কও। পান দিমু, তামুক দিমু, কও। কিস্‌সার নামে বুকের মধ্যে কবকব করে নম্বর মার। উদলা হাড়ির ফ্যানের মত ভেতরটা যেন উথলায়। বলে, কও।

চাষা বলে, আর কি দিবা?

আর ?

হ, আর।

নসুর মার চোখদুটো ঝিলিক দিয়ে ওঠে, আইছা দিমু একখান দ্রব্য। আগে শোনাও, মূল্যখান দেখি।

দ্রব্য! কেমন দ্রব্য! কিসের দ্রব্য! সব বুঝেও না বোঝার ভান করে চাষা। নসুর মার চোখের ওপর চোখ বিছিয়ে কি যেন একটা রসাল উত্তর দিতে যাচ্ছিল, হায়রে হায়, চাষার কপাল, রসের ভাণ্ডে যেন নিমের কাথ ঢালল কেউ। চাষা দ্যাখে, তার বলদ দুটো সড়ক ডিঙিয়ে ওপারে যাবার ফিকির খুঁজছে। আহাঃ হাঃ, আরে অ-লক্ষ্মীছাড়া ও-দিকে যাইস না, পইড়া মরবি। হট্ হট্ র…র…আঃ

তা যাই বল বাপু, চাষা ভাবে, ওরা কি আর রামভক্ত হনুমান যে বললে পরে গন্ধমাদনও পিঠে বইবে। সাধে কি লোকে বলদ বলে! যেমন তেড়া তেমন তালকানা। গা করে কথার, দেখ দেখি কাণ্ডখান। চাষা উঠে দাঁড়ায়, মাটির ঢেলা তুলে নেয়, র…র…আঃ

বলি ওদেরইবা দোষটা কি, চাষা এবার নিজেকেই নিজে বলে, খেতে দিবি না কুটোটি, টঙে বসিয়ে হাওয়া করা, ঝ্যাটা মারি অমন আদরের মুখে। আর বলদ দুটো যদি কথা বলতে পারত মানুষের মত, তা হলে নির্ঘাৎ বলত, দ্যাখো দ্যাখো ওহে চাষার পুত, হাড় ক'খানাইতো রেখেছ। এবার ওগুলো খুলে নিয়ে ডুগডুগি বাজাও না বাপু, বাঁচি। তাই ওরা তোয়াক্কা করে না কথার। মাটি শুঁকতে শুঁকতে হাঁটে, হাঁটতে হাঁটতে থানার দিকেই এগোয়।

শুনলি না আবাইগ্যা, মর মর!

নসুর মা বলে, মাচিস দাও। হাত বাড়ায়।

চাষা আবার রসিয়ে ওঠে দেখতে দেখতে। বলে, আগুন! আগুন আমার বুকে, নাও। সাঁড়াশির মত হাত দুটো ছড়িয়ে দিয়ে বুক চিতোয় চাষা। নাও। চোখ দিয়ে কথা কয় যেন।

মরণ আর কি। নসুর মা মুখ ঝামটে ওঠে, মাঠময় মানুষ দেখ না, বুইড়া বাঁশের মট-মটানিই বেশি।

তা বটে! চাষা আবার বলদ দুটোর দিকে চোখ ফেরায়, আঃ আঃ ইররে আঃ…আরে ঐ হারামজাদা যাইস না যাইস না, আর আঁ…হট্ হট্… আঁ…র…

ট্যাক খুলে দেশলাইখান এগিয়ে দেয় চাষা বিবির দিকে, নম্বুর মার দিকে।

তা শুন, বিবিজানের রূপ গাই আগে, শুনবা তো?

কও। কলকের ছোবড়ায় আগুন ধরায় নম্বুর মা।

হায় আল্লা কিবা রূপ, কিবা সুরৎ, চাষা শুরু করে, বুঝলানি নম্বুর মা, সুর্পনখার এপিঠ আর ওপিঠ। কিবা কই, গাও ভরা লোম, দশ আঙুলে দশখান নোখ যেন্ দশখান কোদাল। বাউড়ের বাসার মত কটা এক টিপলা চুল মাথায়। ঢ্যাপা ঢ্যাপা উঁকুন। লেপাপোঁছা নাক ঠোঁট বুক পেট। যেন শেওড়া গাছের পেত্নী।

ছি ছি ছি। বাধা দেয় নম্বুর মা। মুখখান মাজা-ঘষা কর, ছিঃ।

ছিঃ কেন? চাষা থামে। বলে, তামুক দাও। উঁহু উঁহু, হাতে হাতে দাও, দাঁ.– দাঁতে খাই।

আলো খাওনিলো! নম্বুর মা চোখ মটকায়। হাত বাড়ায় হুঁকো সমেত।

বটে!

পান্তার ম্যাজম্যাজে ভাপটা নাক চোখ চিবুক বেয়ে এখন তালুর দিকে চুইছে। চাষা কল্কেতে দু-হাত জড়িয়ে আয়েশ করে একটা টান কষে। আঃ… আহা…একগাল ধোঁয়া ছাড়ে। আলের ঢেলায় কনুই ছুঁইয়ে একটু কাত হতে গিয়ে বোঝে গালের ওপর চড়চড় করে রোদ লাগছে। এ-বাবা চোত-বোশেখের রোদ, হাড়-মাস পুড়িয়ে ছাড়ে। ফি-বছর এমনি সময়ে ওর মনে পড়ে একটা মাথাল কেনার কথা। ফি-সন এ সময় ওর শাক জোটে তো পান্তা জোটে না, পান্তা জোটে তো লঙ্কা। আর সেই খেঁকশেয়ালির আঙুর ফল টক বলার মত ওকেও বলতে হয়, কও দেখি কি কাণ্ড, এক জন্ম রোদ মাথায়, জল মাথায়, ধাই-ধাই নাচলাম, এখন কিনা মাথাল। চাষা ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আবার আয়েশের শব্দ করে আ…আহ্… …

বলদদুটো সড়কে উঠে খানিক ঘুরল ফিরল। তারপর ট্যাং ট্যাং করে ডোবার দিকেই এগোতে লাগল।

হ্যাঁ, বিবিজানের গুণ গাই শুন, চাষা আবার কিস্সা টানে। তা তেনার গুণের মধ্যে দুই, খাই আর শুই। লাউবিচির মত পেছল দাঁতগুলো মেলে ধরে চাষা হাসে।

কিগো গোসা করলা নাকি? তোমারে কই নাই। পরস্তাবের বিবি

অলম্বুষ। তা সে সু-কথা না শোনে কানে, সু-জিনিস না দেখে চোখে। নিজে যেমন কু, কু-কথায় তেমন পঞ্চমুখ। বুঝলা? তোমার মত না।

আহা ঢং! কও না।

হ-হ কই। বিবির নসীব শোন। একদিন এক আড়াই বিঘৎ লম্বা মানুষের লগে দেখা!

আঃ, কও কি! নসুর মার চোখ জোড়া দপদপ করে ওঠে। আড়াই বিঘৎ মানুষ কিগো?

হ আড়াই বিঘৎ মানুষ। হেইটাও ছিলো চোত-বোশেখ মাস। পূর্ণিমার নিশি, রাত্রি। ফুটফুইট্যা চাঁদের আলোয় মাঠ-ঘাট যেন জিলকানি দেয়। কিন্তু অইলে অইবো কি, বিবির মনে সুখ নাই। নাই তার রূপ, নাই তার কুলমান। সুখ থাকবো কেমতে? ছিল এক লঙ্কা-পোড়ানী সতীন। সতীনের কপালে ঠ্যাং ছোঁয়াইয়া বিবি মাঠে ঘাটে ঘুরতাছিল, যেদিক তার চৌউখ যায় যাইবো।

কলকের আগুন আর একবার চলকে ওঠে।

হ, এমন সময় চষা মাটির ঢেলার ফাঁক থাইকা বাইরইল সেই আড়াই বিঘৎ মানুষটা। দাঁড়াইয়া হেয় হাঁক পাড়ল, আলো, ও-বিবি, শুন শুন!

বিবির বুকখান ছ্যাঁৎ কইরা উঠল, কেডা ডাকে?

আমি গো বিবি, আমি।

তুমি?

হ আমি। আমারে নিকা করবা?

মরণ আমার। আড়াই বিঘৎ মানুষটার স্পর্ধা তো কম নয়। বিবি কইল, এই আমার মুঠ দেখছ। এক কিলে ভূত ছাড়ামু, বুঝলা? বদ কোথাকার।

মানুষটা তবু নাছোড়বান্দা। কয়, শুন শুন চটো কেন? তোমার মত কুরূপা মাইন্ষের অত গোসা ভাল না, বুঝলা? শুন•••

কি? কি শুনুম? বিবির কিন্তু শুননের বাসনাও কম না।

যদি আমারে নিকা কর, তোমারে পরী বানাইয়া দিমু।

কেমতে?

কও আগে কথা রাখবা?

খানিকক্ষণ ভাইবা-টাইবা বিবি কইল, রাখুম।

কথা খেলাব করবা না?

না।

ভয় পাইবা না?

না।

মনের কথা কাউরে কইবা না?

না।

এই নাও তবে ক্ষেতের মাটি। এই মাটি সর্বাঙ্গে মাখ। ডইলা ডইলা মাখ। তারপর যাও ঐ ডোবার পানিতে ঝুপুর ঝুপুর কইরা তিনখান ডুব দিয়া আস। আব আল্লার কাছে আরজি রাখ জীবনে কখনো কুৎসিত লোক দেখলে ঘৃণা করবা না, কু-কথায় মাতবা না, কু-দ্রব্য দেখবা না।

বিবি তাড়াহুড়া কইরা ডুব দিল পানিতে আল্লার কাছে আরজি রাখল, আমারে ফরী বানাও, কু-কথা বলুম না, কু-দ্রব্য দেখুম না, কুৎসিত লোকগো ঘৃণা করুম না।

কল্কিতে এবার শুকনো গলায় টান কষল নসুর মা। কিস্সা রসে-কষে মেখে উঠেছে। আহা কও, গা ঘেঁসে এগিয়ে এল ও।

হ, দেইখতে দেইখতে পেত্নী ঠাইরেন হইল ফরী। ফুট-ফুইট্যা সোনা চান্দির রঙ। টুসটুইস্যা গাল, চোখের পিছি, নাকের বাঁশি, ঠোঁটের পাতা জিলিক মারে।···আহা বিবি যেন মূর্ছা যায়। মাথায় মোরগ-ঝুঁটি খোঁপা, পেঁয়াজকলির মত দুই হাতে দশখান আঙুল। পায়ের গোছ, হাতের গোছ, আহা মাখম গো মাখম।

আড়াই বিঘৎ মানুষটা কইল, কও বিবি, খুশি?

হ খুশি।

তবে এখন নিকা কর।

নিকা! বিবির যেন বজ্রাঘাত হয় মাথায়। এমন সুন্দর যার সুরৎ হে কিনা নিকা করব ঐ কুৎসিত মানুষটারে। বিবি কয়, জানো নি কর্তা, বাদশা রাজা পায়ের তলে কাইন্দা মরুক তারপর নিকা। তুমি কোন্ ছাড়। তোমার মত আড়াই বিঘৎ মানুষের মুখে আমি ছ্যাপ দেই, থুঃ······

কপাল কপাল। ফরী আবার পেত্নী হইলো। আঙুলের নোউখে নোউখে কোদাল গজাইল। মাথায় উঠল বাউরেগ বাসা। বিবি কান্দতে কান্দতে চোউথ তুইলা ছাখে, ওমা মানুষটা গেল কই! সর্বনাইশ্যাটা গেল কই। ক্ষেতের মধ্যে গড়াগড়ি খাইয়া বিবি চোক্ষের পানি ঢালতে লাগল।

নম্বুর মার স্তব্ধ মুখের রেশটা থমকে রইলো আরো খানিকক্ষণ।

চাষা বলল, লাগল কেমন, তিতা না মিঠা?

নম্বুর মা বলল, হুঁ।

তা জানো নি নম্বুর মা, সেই যে আড়াই বিঘৎ মানুষ, হে কিন্তু এখনো মাটির ঢেলায় লুকাইয়া থাইকা সব কথা শোনে। তাই যতক্ষণ লাঙল টানা, ততক্ষণ কু-কথা কইতে নাই।

নম্বুর মা বলল, হুঁ।

কু-দ্রব্য দেখতে নাই।

হু।

কুৎসিত লোকগো ঘৃণা করতে নাই।

হুঁ।

দুই

কালবোশেখী কালামুখির শেষ। আষাঢ়ের শুরু আষাঢ়ের ঢল, ঢলানী।

এপাশের খড় গুঁজে ওপাশে তালি দেওয়ার সময় এখন। তবু জল চোয়ায়। ঘরের মেঝে প্যাচপ্যাচ করে কাদায়। কাঁথা-বালিশ সপসপে ভেজা। আঃ কী জ্বালাতন।

চাষা তবু তারই মাঝে আয়েশ করে বসে এক কোণে। কটকটে ব্যাঙ ডাকছে দাপনার ওপিঠে। তেলের কুপিতে কেরাচিন কম পড়েছে, খানিক বাদেই নিভে যাবে। চাষাকেও জাল বোনা বন্ধ করে শুয়ে পড়তে হবে। চাষা হাই তুলতে তুলতে বলে, ঘুমাও নাকি নম্বুর মা?

নম্বুর মা নম্বুকে বুকের ভাঁজে সাপটে পড়েছিল। বলল, না, কেন?

এক কিস্‌সা শুনবা?

কও।

তাহলে পাশ মোড়। চক্ষু না দেখলে জমে না।

নম্বুর মা পাশ ফেরে। কোমরের ওপর কাঁথার ফেত্তা। কাঁথায় ভাঁজ পরে পায়ে জড়িয়ে থাকে।

সাঁঝ অবধি চাষার কেটেছে আজ রোঁয়া কাজে। এক গোড়ালি কাদায় পা গেড়ে উবু হয়ে একহাতি তরতাজা চারা মাটিতে পুটপুট করে বসিয়ে দিব্যি সে মেঠো ভূত হয়ে বাড়িতে ফিরেছিল। গোটা দিন ঝির-ঝিরানি বর্ষা গেছে। বর্ষা আর পবন। লক্কুল কাটা পবন। ছুটছে তো ছুটছে। কান বেড়ে গামছা জড়িয়ে নিয়েও রেহাই নেই। কুটুস কুটুস করে খোঁচায় পিঠের চামড়ায়। পবনে ফরফর করে বাঁশি বাজে কানে।

সারবন্দী ধানের চারা টেকো মাথার চুলের মত ফারাক ফারাক দাঁড়িয়ে হিলহিল করে কাঁপতে থাকে। আজ যাবে, কাল যাবে, পরশু ওদের গোড়ায় মাটি ধরবে। তখন আর পায় কে।

চাষা বলল, শুনবা তো, না কি আবার…

কও, কও।

পান তামুক দিবা না?

দিমু।

চাষা জালের কাঠি ঘষে পিঠ চুলকে বলে, আর?

কি আর? বুঝেও না-বোঝার ভান করে নসুর মা।

কেন, দ্রব্য?

না।

না? মাদুরের একপাশে উঠে আসে চাষা। ঠাণ্ডা হাতের চেটোখানা সে নসুর মার গালের উপর বিছিয়ে ধরে।

নসুর মা চোখ নাচিয়ে ধমকায়। চাষাকে বসবার জন্য জায়গা করে দেয় একটু, নাও, ঠিক হইয়া বস। তারপর গালের ওপর থেকে হাতটা সরিয়ে ভুঁয়ে রাখে।

পিঠের দিকে ঘুমিয়ে ন্যাদা হয়ে পড়ে আছে নসু। উদলা পিঠের ওপর ওর গরম নিশ্বাসের ঝাপটা লাগছে। শুল শুল করছে গা-টা।

নসুর মা বললে, কও, শুনি। রোজ রোজ দ্রব্য খায় না, কও।

কেন?

কেন আবার, অমনি। কইবা তো কও, না কইবা তো ঘুমাই।

ঘুমাইবা? আইচ্ছা একটা সাঁঝ-ঘুমানীর কিস্‌সা গাই। চাষা শুরু করে, এক ছিল সাঁঝ-ঘুমানী বিবি। উঁহু, তোমার মত না। কিগো গোসা করলা নাকি?

ঢং। নন্থর মা ধরা গলায় অদ্ভুত একটা শব্দ করল।

চাষা হেসে উঠল। তা সেই সাঁঝ-ঘুমানীর কাণ্ড শোন ; সূর্য ঠাইরেন ডুবল কি না ডুবল্ অমনি বিবির ঘুম।

ঘুমাইবো না তো করবোটা কি ? সারাদিন যায় এলেমেলে, রাইত হলে বুড়ি সুতা ডলে, হেই দশা চাও নাকি তুমি সকলের।

আহা শোনই না। চাষা আবার টানে, ঠাইরেনের ঘুমখানাও ছিল জব্বর ! ঘরঘর ঘরঘর নাক ডাকুনি কি, যেন রাজ্যি-রুজ্যি ভাইঙ্গা বান ঢুকছে গাঁয়ে। তা একদিন এক কাণ্ডই হইল।

কি ?

তিন দিন তিন রাত কেরায়া বাইয়া ঠাইরেনের কর্তায় একদিন আইসা হাজির। আসনের পথে মাঠ-ভাঙা আল পড়ে। পথের দুই ধারে ধানবনের শোভা। বাড়ির গোড়া পর্যন্ত আউগ্যাইয়া কর্তায় একখান নারকেল গাছের গায়ের উপর কাত হইয়া খাড়াইল। ধানবনের শোভা যে গ্যাখে হেই মজে। আহা বনের মধ্যে বাতাস যখন খেলে, বাতাস নাগো বাতাস না, কাকুই। কাকুই যেন বুলায় কেউ। কচি কচি পাতা ঢইল্যা ঢইল্যা পড়ে, ফুইল্যা ফুইল্যা ওঠে। কর্তায় না-মজব কেন্ ? মাঠ চষছে ধান বুনছে, কষ্ট করছে, কেষ্ট পাইবো না কেন্ ?

হ, হইছে হইছে, কিস্‌সা খান কও। ধান গাছের প্যান-প্যানানী ভাল লাগে না।

চাষা থমকে গিয়েছিল। সামলে নিয়ে বলল, তা কর্তায়, ওই ভর সাঁঝে পোলাপানগো মত ফ্যাল-ফ্যালাইয়া তাকাইয়া রইল। ওদিকে তখন তার সাঁঝ-ঘুমানী ঘুমে বেভোর। এমন সময় কর্তায় লাফাইয়া উঠল, আঁ, কেডা যেন্ কান্দতাছে না ? হ ঠিক, ধানবনের মধ্যেই কে যেন্ কপাল চাপড়াইয়া চাপড়াইয়া কান্দতাছে। ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া। কেডা গো, কে কান্দ ? কর্তায় থাবুর খুবুর কাদার মধ্যে নাইমা ধানবনের ফাঁক দিয়া আউগ্যাইয়া গ্যাখে, এক পরমা সুন্দরী কন্যা। কন্যা না, কন্যা না, কুলের বউ। কপালে ডগডইগ্যা সিঁদুর।

কান্দ কেন্ মাইয়া ? কর্তায় জানতে চাইল।

কান্দি দুঃখে ?

কি দুঃখ্ ?

দুঃখু! দুঃখু, তর বউ আমারে তাড়াইয়া দিল। আমায় চিনল না। তর বউ অলক্ষ্মী, লক্ষ্মীরে চিনল না। এক পলক বোধ হয় চোখের পাতা ফালাইছিল কর্তায়, ওমা কই গেল মাইয়া লোকটা, আঁ গেল কই!

কর্তায় তো বাড়ি ফিরল নিজের। বউ, বউ-লো, দরজা খোল্।

সাঁঝ-ঘুমানীর ঘুম ভাঙানো কি চাট্টিখানি কথা, কর্তায় ঠায় এক প্রহর দুপদাপ কোন্দল কইরা ঠাইরেনের ঘুম ভাঙাইল।

কে?

আমি। দরজা খোল্ আগে।

দরজা খুলল সাঁঝ-ঘুমানী। মা লো মা, তুমি! ভাবছিলাম বুঝি রাক্ষসীটা আইছে আবার।

কেডা?

ঐ যে গো সন্ধ্যার সময় এক উলুপী আইয়া কয় কি, পিদিম জ্বালা, বসি একটু।

কর্তায় বুঝল, কে আইছিল। বলল, তারপর?

দিলাম বইতে। তা কয় কি, ঘরদোর ঝাড় দিছ নি, তুলসী তলায় কপাল ছোঁয়াইয়া নি, কাপড়-চোপড ছাইডা শুদ্ধ হইছ নি, হেন নি, তেন নি। এদিকে আমার ঘুম পায়, কি আর করি, দিলাম উদ্দা মাইরা তাড়াইয়া। যত সব আইসাও জোটে কপালে।

কর্তায় আর করে কি। হাউমাউ কইরা কান্দতে পারলে যেন বাঁচে। কইল, সাঁঝ-ঘুমানী তুই ঘুমা ঘুমা। তর লগে যে থাকে হেই হয় অলক্ষ্মী। আমি তর সঙ্গ ছাড়লাম, তুই ঘুমা।

আরে, যাও কৈ?

আর যায় কোথায়। কর্তায় দুপদাপ পা আছড়াইয়া ছুইটা আইল ধানবনের দিকে। তারপর সারা রাত্তির ধইরা মাঠময় খুঁইজ্যা খুঁইজ্যা খুঁইজ্যা···হুঁ হুঁ, দেখলা তো সাঁঝ-ঘুমানীর কাণ্ড।

দেখছি। নসুর মা উত্তর করতে করতে একটা হাই তুলল। হাই তুলতে তুলতেই বলল, এইবার আর তেলতুল পুইড়া কাম নাই। বাত্তিখান নিবাইয়া দাও। ঘুমাই।

চাষা ফুত্ করে কেরাসিনের বাতিটা নিভিয়ে দিল।

অন্ধকার জাপটে ধরল দুজনকে।

তিন

মরা কার্তিক যাই যাই করে চলে গেল। অঘ্রাণের বাতাসে সনসন সনসন হালকা আমেজ। কাশফুলের মত সাদা ধবধবে রোদ। রোদের নজর তেরছাটে। উদোম পিঠ ছুঁইয়ে বসলে চনমন করে জ্বালায় পোড়ায় আবার আম-তেঁতুলের ছাওয়ায় বসলে শীত-শীত।

মাজার গামছায় আয়েশ করে কাস্তেখানা গুঁজে নিয়েছে চাষা। শুকনো পানাকচুরীর মত একগোছা চুল মাথায়। চুলে গুটিকয় মরা ধানের কুচি। ঘাড়ে-গর্দানে খড়ি চকচক করছে।

চাষা দুপদাপ করে পা ফেলে বাড়ির দাওয়ায় উঠে বসল। নম্বর মা, তামুক দাও।

দেই। শুকনো পাতার আঁচে থানকুনির ঝোল বসিয়েছিল নম্বর মা। কড়াইটা নামাল। চোখ দুটো ধোঁয়ার ঝাপটায় রাঙা টকটকে। জল কাটছিল। আঁচল দিয়ে তাই মুছে নিয়ে ফোৎ ফোৎ করে নাক টেনে নম্বর মা মাটিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ঠায় বসে বসে মাজা ধরে গিয়েছিল ওর। মাজায় হাত বোলাতে বোলাতে নম্বর মা বলল, বস, দেই। বেড়ায় গোঁজা হুঁকো নামিয়ে নিতে নিতে কি জানি কি খেয়াল হল, বলল, তামুক দিমু, পান দিমু, কিস্‌সা কইবা না? কও একখান শুনি?

কিস্‌সা? সারাটি দিনের ধান কাটায় আঙুলের ছাল চলটা উঠে একাকার। গর্দানের পাশে রস-টাটানো ব্যথা। সারা বিকেল ধানের আঁটি মাথায় বয়ে বয়ে ব্রহ্মতালু যেন চেপটে বসেছিল। তবু হাসিমুখে ধান বয়েছে চাষা। বিঘায় বিঘায় দেড়া ধান, বইবে না কেন? সইবে না কেন কষ্ট। চাষা সব সইতে পারে, সব সয়।

কিস্‌সা শুনবা? শুন···চাষা শুরু করে ন' বিবির কিস্‌সা।

নম্বর মা টিকায় ফুঁ দিতে দিতে উচ্চারণ করে, হুঁ।

হেই এক বিবি, ন' বিবি। কচি বয়স, কাঁচা স্বভাব। বাস ছাড়ে মিঠা মিঠা। আর রূপ? রূপ যেন চান্দের আলো। ঝলমলায়, টলমলায়।

নসুর মা বলে, সংক্ষেপে কও।

সংক্ষেপে! আইচ্ছা। ন'বিবির স্বোয়ামীর নাম ন'কড়ি। এমন এউক্যা বিবি পাইয়া মন উপচাইয়া জেল্লা গড়ায়। কয়, বিবি তরে কাচের চুড়ি পরামু।

বিবি কয়, আর কর্তা পারতো একখান কাকুই দিও।

ন'কড়ি একখান কাকুই আইন্যা ন'বিবির হাতে তুইল্যা দেয়। দিয়া কয়, চুল যেন্ পাট থাকে হগল সময়। আর—

আর ?

আর ঠোঁট দুগা যেন্ রাঙা থাকে।

তবে এক শিশি আলতা আনো।

আলতা আইলো। ন'কড়ি কইলো, কাপড় বড় নোংরা পর তুমি। কাপড় সাফা রাখতে পার না ?

তয় সোডা আন না কেন্ ?

সোডা আনে ন'কড়ি।

গায়ে মাখনের ত্যাল আনে। ন'কড়ির জুলপি বাইয়া তেল চোয়ায়। বিবির চুল পাট হয়। গায়ের খড়ি উইব্যা যায়। চক্ষের পাতায় কাজল পরে। ন'কড়ি কাজল-তাওয়া আনলো হাট থাইক্যা।

একখান আরশি আনলো। কুটুই আনলো সিঁদুরের। ন'বিবির কপালে সিঁদুরের ফোঁটা জলজল করলো। বিবি কয়, ভদ্রলোক গো মত একখান জামা দাও না আমারে।

ন'কড়ি একখান বেলাউজ আনলো। ফুটফুট, দানা দানা।

বিবি বলে, পাউডার দাও।

বিবি পাউডার মাখে গালে গলায়।

বিবি বলে, সায়া দাও।

বিবি সায়া পরল।

বিবি বলে, এটা দাও, ওটা দাও।

ন'কড়ি এটা আনলো, সেটা আনলো।

হেষটায় প্যাটের ভাতে টান পড়ল। ন'কড়ি আর ন'বিবি প্যাটের উপর গামছা বাইন্ধ্যা হাউমাউ কইর‍্যা কপাল চাপড়াইয়া চক্ষের পানি ফালাইতে লাগল।

তা কও তুমি নস্থর মা, কান্দলে আর শুনবো কেডা, আঁ ?

নস্থর মা বলল, হুঁ।

আসলে কি জানোনি, উড়নচণ্ডীর দশ দশা। এই হগল আবাইগ্যারা কপালেও ভেটকি দিয়া থাকে !

নস্থর মা বলল, হুঁ।

চার

মাঘীজারী শীত ফুরোল। নিজের শীত বাঘের গায় তুলে দিয়ে চাষা ভাবল, বাঁচলাম। নস্থর মা আগুনের পাতিল সাফ করে হাত ঝাড়ল, বাঁচলাম। ফাগুনের হাওয়ায় এবারও যে চোরাগুপ্তির ধার লুকানো ছিল তা কি করে জানবে চাষা। সারাটি দিন সে বাবুর বাড়ি বেগার খেটে লাউ-মাচা বেঁধে এল। আসার পথে হাটখোলা পড়ল। হাটখোলার চালাগুলো খাঁ খাঁ করছে, হাটবার নয় যে গম গম করবে। পায়ে পায়ে রগড় খাওয়া খড়ের গুছি। দুটো চারটে কাক মাটি খুঁটছে। হনুমান আঁকা লাল নিশানটা ডগা বাঁশের মাথায় পতপত করে উড়ছে। চাষার সেই ছড়াটা মনে পড়ল, কাউয়া লো কা, রাত পোহাইয়া যা। হাড়ি পাতিল ঠুকুর ঠুকুর, কলসীর কাঁধা। বাবুর বাড়ির মেয়েরা পুকুর পাড়ে এইসব ছড়া গাইত। ভোর ভোর বাতাসে কুয়াশা সাঁতরে ভেসে আসত কাউয়ার কথা। সেই কাকগুলো মাটি খুঁটছে। দু'এক গুছি পড়ে থাকা ধান কি মুসুরি কি সরষে জিরে যাই নজরে আসছে খুঁট খুঁট করে ঠোঁটে তুলছে। বাতাসটা কেমন দোল বসন্তের কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে।

বেলা পড়লে বাড়ি ফিরুম। চাষা ভাবল।

তাইলে অখন কি করি! আইচ্ছা, এক কাম করলে হয় না। যাই, বসি গা ঘাটের উপর।

হাটের দিন হইলে মাল তোলনের কাম জুটত। আউজগা হাট না। ঘাট ফাঁকা। একখান নাও-ও নাই। তবু চাষা ঘাটের দিকে এগিয়ে এসে ঘাটের তক্তার ওপর পা মুড়ে বসে পড়ল।

অনেকক্ষণ বসে থাকল। একা একা। ভাবল অনেক কথা। ঠিক যখন

সন্ধ্যা হয় হয় চাষা তখন যেন স্বপ্ন দেখছে। দেখছে একটা লাউডগা সাপ এ ডাল থেকে ও ডালে ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ লাফাচ্ছে। একটা ঝিঙে ফুল দেখতে দেখতে মহাদেবের কানের বিষ ঝুমকো হয়ে যাচ্ছে। একটা কিস্‌সার বিবি পোয়াতী পেটে ওর সামনে দিয়ে নির্বিকারে হেঁটে গেল। নম্বর মাও পোয়াতী। একটা চন্দন পোকা গোবর ফুঁড়ে বেরিয়ে এল। সামনেই একটা সিঁড়ি। ধাপধাপ ধাপধাপ অনেক উঁচু, স্বর্গের গায়ে গিয়ে মিশেছে।

চাষা উঠে দাঁড়িয়ে আর কোন কাজ নেই দেখে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। উঠতে উঠতে গ্যাখে, এক পরমা সুন্দরী দেবী। গাও ভরা সোনাদানা। পরের সোনা দিওনা কানে, প্রাণঃযাবে গো হেঁচ্‌কা টানে। কেন্‌ ঐ নোলক, ঐ কানপাশা, ঐ বালা, ঐ মল, কেন্‌, অর নিজেব হইতে পারে না। হগলেই চাষার মত নাকি?

আ লো তুই কুন ঘবেব বউ? চাষা শুধোল।

বউয়ের ট্যাবাট্যাবা চোখ, ল্যাটাপ্যাটা গড়ন। বউ খিলখিল করে হেসে উঠল।

উঁহু এ বিবিব তো ভাবগতিক ভাল না। চাষার কেমন সন্দেহ হল। আলো, শুনছস নি, আমি যে জিগাই?

বিবি চোখেব প'তা নাচিযে এমন একখান ভাব দেখাল যার অর্থ চাষার কাছে পাবষ্কার। তা নষ্ট হোক ফষ্ট হোক, ছেমডিব হাসিটা চাষার মিঠা মিঠা লাগল। সেদ্ধ ধানেব গন্ধের মত যেন বাস ছড়াচ্ছে চারদিকে।

কি? কথা কও না যে?

কি আব কমু। দেইখ্যাও চিন না। আমি যে তোমার বিবি।

আমার? চাষা থমকে দাঁড়াল। সিঁড়িটা খাড়াই উঠেছে আকাশের দিকে। আমাব! কস কি ছিনালী?

কই যা, ঠিকই কই। আমি তোমাব পরস্তাবেব বিবিগো। তোমার কিস্‌সার। বিবি ধাপধাপ উঠছে সিঁড়ি বেয়ে উপর দিকে। এ সিঁড়ি বোধ হয় শেষ হয়েছে স্বর্গরাজ্যের দুয়ারে। দেবদেবীদের সভার সামনে। সভাটা কেমন হবে? ওর মনে পড়ল একটা যাত্রার আসরের কথা। বিষ্ণু দাঁড়িয়ে আছেন। অপরূপ বেশভূষা। সর্বাঙ্গে স্বর্গলোকের আভা। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম···ষোড়শী নাচুয়েরা নাচছে। সুরের গমকে গমগম করছে পুরো

আসরখানা। গমগম করছে। স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে। এ সিঁড়ি বেয়ে উঠে শেষ মাথায় পৌঁছুলে সেই স্বর্গের সভা। চাষার খুব ইচ্ছে হল দেখতে।

খিলখিল করে হেসে কঞ্চি বাঁশের মত ঢলে পড়ল বিবি।

চাষার মাথায় যেন ছলাৎ করে রক্ত চলকে উঠল। আ লো উলুপী, চং থো।

বিবি আবার হাসে।

আবার। পুতা দিয়া মুখ ভাইঙ্গা দিমু কিন্তু।

বিবি হাসছেই।

তবে লো ছিনালী। চাষা ছুট্টে বিবিকে ধরবার জন্য উঠতে থাকে উপর দিকে। বিবিও ধাপ ধাপ উপরমুখো।

শেষটায় চাষার কড়া পড়া হাতের মুঠোয় কাদা গোবরের মত নেতিয়ে ধরা দিল বিবি। হাঁপাতে লাগল। চাষা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে অবাক। ও মা, এটা কে? আ লো নস্থর মা, তুই?

হুঁ আমি। নস্থর মা জবাব দিল। চোখের পাতা দুটো তিরতির করে কাঁপছে। বুকটা টলমল করে দুলছে।

চাষা কেমন চোয়াড়ে গলায় হেঁকে উঠল, আদাড়ে বাদাড়ে ঘুরস কেন? পরস্তাবের বিবি সাজছিলি না। খাড়ো।

ঘুরুমইতো, তোমার কি?

বটে। আমার কি। তবে দেখ স্বচনী। নস্থর মার কোমর বেড়িয়ে দড়াম করে একটা বিরাশী সিক্কা লাথি কষিয়ে দিল চাষা।

হায়রে হায়, কোথায় সিঁড়ি আর কোথায়ই বা নস্থর মা, পরস্তাবের বিবি। চাষা চোখ কচলে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখল, ঘাটের উপরই সামসুম করা বাতাসে ডুব দিয়ে ও বসে আছে। আকাশখানা অন্ধকারে কষটি কষটি।

খাড়াও, একদিন এই কিস্‌সাখানই নস্থর মারে শোনামু। চাষা খুব উল্লসিত হয়ে বাড়ি ফিরে এল। উপুড় করা কড়াইয়ের মত অন্ধকার চারদিকে। নিজের বাড়িটাকে দেখলে একটা ভূত পেত্নীর আখড়ার মত মনে হয়। উঠোনের উপর দিয়ে একটা শেয়াল পালাল। চালার উপর একটা মেকুর চোখ জ্বলজ্বল করে বসে আছে। ইঁদুর পেলেই খপ করে ধরবে।

চাষার কেমন ভয় ভয় লাগতে লাগল। বাবুর বাড়িতে থাইক্যা' দুগা চাউল চাইয়া আনলে হইতো।

ঘরে ঢুকে দেখল, অন্ধকারে ডুব দিয়ে নসুর মা শুয়ে আছে। এক কোণে নসু, তেলের কুপির পাশে বসে একবাটি জল আর গুটিকয় মুড়ি নিয়ে বসেছে।

নসুর মা ভাত দাও।

আমারে খাও। মুখ ঝামটে ফোঁস করে উঠল নসুর মা।

কেন্, রান্ধ নাই ?

রান্ধুম আমার মাথা। রোজগার কইর‍্যা আনছ কি না, অখন গণ্ডে পিণ্ডে না গিলাইলে চলবো কেন। পিছা মার। পিছা মার কপালে।

একে সারা দিনের ক্লান্তি, তায় ভর সন্ধ্যায় এই অমঙ্গল কথা, চাষার চোখ ফাতফাত করে জ্বলে উঠল। ইচ্ছে হল সত্যি সত্যি দেয় একটা লাথি কষিয়ে। কিন্তু কেমন যেন বোকা বোকা মনে হল নিজেকে। চাষা জালের কাঠি নিয়ে বসল কুপির কাছে।

রাত্রি ঘন হতে লাগল।

কালীয় দমন

মা বিষহরির রাজ্যে ঢল নেমেছে বিষের। ফণিমনসার ঝোপঝাড় বাড়-বাড়ন্ত হয়ে উঠেছে, বিষবৃক্ষে বিষফল ধরেছে। বেদনাভার সেই পৃথিবীর বুক জুড়ে নাগনাগিনীর চিক্কির-কাটা আঁশ-খোলস অজস্র কুচিকুচি হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

একদিকে তার নিম-তেঁতুলের জট, জম্পেস করে দাঁড়িয়ে পাহারা দেয় খানা-ডোবা, খন্দ-জলা। তারই মাঝে পানা-কচুরি আর সোলা-সাপলার লতা। লতিয়ে লতিয়ে ডাগর-ডোগর হয়ে হাওযায় হাওয়ায় দুলতে শিখেছে। আর, অন্যদিকে মাজা ভাঙা মান্ধাতার আমলের এক ইঁটের পাঁজা। হয়তো কেউ কোঠা-দালান তুলতে চেয়েছিল; আহা, সব তার বিষহরির পায় এলিয়ে পড়েছে! এখন সেই পাঁজার গায় ছুবলিয়ে ছুবলিয়ে দাঁতের জোব পরখ করে নাগ-নাগিনীরা। নাগ-নাগিনীদেরই দিন পড়েছে।

মা বিষহরির রাজ্যে ঢল নেমেছে বিষের। কলকাসুন্দি, জলশেওড়া, বিছুটি মাথা দোলায়, মাথা দোলায় আকন্দ-তুলসী। বাঁশের ডগা বাঁকতে বাঁকতে মাটি ছোঁয়, আবার লাফিয়ে উঠে আকাশ ধরতে চায়, পারে না, যন্ত্রণায় মটমট মটমট শব্দ করে। এখন যেমন করছে।

কি রাত্রে কি দিনে, কি পঞ্চমীতে কি অমাবস্যায়, কি পূর্ণিমা-একাদশীতে বিষহরির বাথান ঢলে থাকে নেশায়। থরথর করে কাঁপে বিষ বাতাস, কাঁপতে কাঁপতে বুঝি বন্দনা গায়:

জয় বিষহরি মাগো, জয় বিষহরি মা
কাউরে কামাক্ষ্যা মা তোর বিষে ভরা গা।

কথিত আছে, বেদে-বেদেনীরা বলে, ফি-অমাবস্যায় বিষহরির বাথান জাগ্রত হয়ে ওঠে। মা বিষহরি তার দণ্ড তুলে নেন হাতে, মাথায় পরেন নাগ-মণির মুকুট। অদৃশ্যলোক থেকে সুর বর্ষণ হতে থাকে। সেই সুরে কান পাতলে শোনা যায় চোষট্টি নাগের দাপুনি কাঁপুনি, হিসহিস, ফিসফিস, সোঁসোঁ সাঁসাঁ······

চৌষট্টি নাগের বিষ এক অঙ্গে ধরি
ত্রিভুবন জয় করে, জয় বিষহরি।
অষ্ট নাগ ষোল চিতি দশদিকে ধায়
স্বর্গ-মর্ত-পাতালের আসন কাঁপায়।

মা বিষহরি এই দিনে তার অষ্ট নাগ নিয়ে বসেন. ওহে কুলশ্রেষ্ঠ নাগ-সন্তান তোমরা তো নিশিদিন জল-জঙ্গল জনপদ ঘুরে বেড়াও, তোমরা কি লক্ষ্য কর না মানুষের প্রতাপ নিত্য নতুনভাবে প্রকাশ পাচ্ছে?

কালা অঙ্গ কালীনাগ, পদ্ম অঙ্গ পদ্মনাগ, শঙ্খ অঙ্গ শঙ্খনাগ ফণি দুলিয়ে সমর্থন করে, হ্যাঁ ঠিক ঠিক।

তবে তোমরাই বল, মানুষের দর্প হরণ করি কি করে, কি করে তার দম্ভ ভাঙি?

তক্ষক বলে, নাগকুলের দুবলতা আগে দূর কর মা, নইলে…

কালীনাগ বলে, আমাদের বিষের ধার ওরা বুঝতে শিখেছে, তুমি আমাদের নতুন বিষ দান কর…

শঙ্খিনী বলে, এখন থেকে আমাদের লক্ষ্য হোক মস্তক…শিরে হইলে সর্পাঘাত ডোর বাঁধবে কোথায়।

নির্বিষ জলঢোঁড়াও তার বক্তব্য জানায়।

মা বিষহরি বলেন, আমার চৌষট্টি সন্তান, চৌষট্টি বেশ ধারণ কর। শঙ্খচূড় তুমি বেশ ধর ক্ষুধার, পদ্মনাগ তুমি হও মড়ক, চন্দ্রনাগ তুমি ব্যভিচার… আমার চৌষট্টি নাগ চৌষট্টিরূপে প্রকাশিত হও।

সাজ সাজ রব পড়ে যায়। বিষহরির বাথান জুড়ে হিসহিস ফিসফিস সোঁসোঁ সাঁসাঁ—সে কি শোষানি, সে কি ফোঁসানী। সেই পৃথিবীর মাটি টলতে থাকে। ধুতুরার কলি পাঁপড়ি খুলে বাঁকা হয়ে দোলে, বুনো-জলায় বাদুড় দাপাতে থাকে, ইঁটের পাঁজা ভেঙে ঝুরঝুর ঝুরঝুর করে কয়েক চাপ পোড়া মাটি গড়িয়ে পড়ে, মাকড-মাছি-মশা বিদ্যুৎপৃষ্ট হওয়ার মত লাফিয়ে ওঠে শূন্যে।

বাতাস দাপায়, বিষ বিষ। বিষের বুদবুদ বে-নিয়মে ছটফট করে ওঠে। কর-কর কট-কট, কর-কর কট-কট,…

জয় বিষহরি মাগো জয় বিষহরি মা
কাউরে কামাক্ষ্যা মা তোর বিষেভরা গা।

বিষহরির রাজ্যে বিষবেদী টলতে থাকে। দেখতে দেখতে নাগ-নাগিনীর রূপ যায় পাল্টে। মুহূর্তের মধ্যে তারা হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে যায়। হাওয়ার মতই অবাধ গতি হয়ে খুঁজতে শুরু করে মানুষের আস্তানা। নগর-গঞ্জ, হাট, ঘাট, মাঠ…

এসব কথা বেদে-বেদেনীদেব মুখেই শোনা যায়। বিশ্বাস কর আর নাই কর, যা' আসে না কারো। প্রমাণ চাও, প্রমাণও ওরা দেখায়, দেখ না হাওয়া কেমন ছোবল দেয়। সারা অঙ্গ বীরী করে ওঠে। হাওয়ায় এমন জলুনী পুড়ুনী ছিল আগে, বলো ছিল আগে, এঁ্যা ?

বেদে-বেদেনীরা বলে, বেশ তো ছিলাম এতদিন, সাপ ধর, ঝাঁপি বন্ধ কর, বিষ ঝাড়, বিষ উড়াও, কড়ি চাল, ফুঁ দেও, মা মনসার আখ্যান গাও… কই গো মাঠান্, বেদে-বেদেনী শুকনো মুখে চলে যাবে তাও কি হয়! ছ্যান বাবুমশাই পরনের ধুতিখান, সোনাদানা দান কর গো মা-ঠাকুরুণ · তা ছিলাম একরকম মন্দ নয়। কিন্তু একি হল দেশকাল বল দিকি নি? আহা কি ছিরি! মুষ্টিভিক্ষা দিতেও কারো হাত সরে না। মা-ঠাকরুণরাই ছেঁড়া শাড়ি সিলিয়ে-ফুড়িয়ে পরেন, কানের মাকড়ি নাকের ফুল বিলোবে কে। চোখের পানি শুকনো মুখ দেখে বেদে-বেদেনীরা ভাবে, আহা কি ছিরি হয়েছে দেশের, ছিরি হয়েছে কালের।

তা, তেমনি এক বেদের নাম কালা শেখ, আর বেদেনীব নাম টগর। বেদের হাতে লাউ-বাঁশি, পিঠে ঝোলা ঝুলি, মাথায় জড়ানো গামছা আর বেদেনীর হাতে তামার বয়লা, মাথায় থাক থাক সাপের ঝাঁপি।

বেদে গায় :

কাউরে কামাক্ষ্যা মা দিয়াছেন বর
মন্ত্র লয়ে ওঝা আমি হইনু অমর।

বেদেনী বলে, আহা পেটেপিঠে সাপটে যাচ্ছি দিনকে দিন, অমর হওয়ার মুখে মুড়ো জ্বালি। আটা ছেনে চাপড়ে চাপড়ে রুটি বানায় বেদেনী। বেদে তার তিন ইট সাজানো উনুনের ফাঁকে কাঠি গুঁজে আগুন বার করে নেয়, সেই আগুন মুখের কাছে এনে বিড়ি ধরায়। গজগজ ঘ্যানঘ্যান ক্রমেই নাআর।

মুরগি ডাকল কি না ডাকল নাস্তা-পানি সেরে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি শুরু করে দেয় কালা শেখ, ও টগরমনি, টগরমনি!

কি! গলায় যেন সোডা-পানির ঝাঁজ।

হবে না। ভোব থেকেই পায়ে মল বেঁধে ঝুমুর ঝুমুর ঝুমুর ঝুমুর···কে যায় গো? টগরমনি। আব কে? কালা বুঝা। কান পচে গেছে শুনতে শুনতে।

টগবমণির কপাল আর কপাল কালা শেখেব।

ঝাড়ফুঁকে বিশ্বাস হাবিয়েছে এ কালেব লোক। কি কববে কালা শেখ। পুত্রকামী বন্ধ্যারা পুত্র কামনায় টগবমণিদেব ডাকে না, মামলাবাজ মোড়ল মশাই কিংবা গ্রহেব কোপে পড়া মুমুর্ষু চক্কোত্তি কেউই আব ডাক দিয়ে চেয়ে নেয না তাবিজ কবজ, জড়ি বুটি, মশলা-মালিশ। কাবো ভিটেয় কি দুটো একটা সাপও ঢোকে না যা নিষহবি, নিদেনপক্ষে বোলতাও কি কামড়ায় না

বই [illegible] [illegible]ঠান, [illegible]ছি এনেছি, খোকাখুকুব মাজাব [illegible]গা এনেছি, একবাব মুখ তুলে দ্যাখ। ও বাবুমশাই, টগবমণিব হাসি এনেছি, একবাব মুখ তুলে চাও।

বেবো বে[illegible] নষ্ট মাগি, দুড়ুম ক[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দ্যাখ না, একবার বসলে শুতে চাইবে।

ঝুমব ঝুমুব ঝুমব ঝুমব···কে যায়? [illegible] [illegible] টগবমণি যায়, আব যায় কালা শেখ। মাথাব ওপব বোদ চড়ে। গ্রাম [illegible] গ্রাম ঘুবে কণ্ঠ শুকিযে কাঠ। আলেব পথে হেঁটে হেঁটে ছাল-বাকল ওঠে পায়েব। টগবমণি বলে, আর পাবি না। কালা শেখ বলে, হাওয়াব মধ্যে সাপ লুকিয়েছে। বাতাস কেমন ছোবলায় দ্যাখ না।

দুপুব গড়াতে গড়াতে বিকেল, বিকেল থেকে বাত। বড় কষ্ট, বড় অনটন, আব পাবি না দিন টানতে। বেদে-বেদেনী আব পাবে না।

কালা শেখ বলে, টগবমনি, পদ্মনাগটাব দাঁতে আবার বিষ জমেছে কিনা দ্যাখ তো?

না দেখেই টগব বলে, জমবে কি বকম! দ্যাখো গে যাও থিকথিক কবছে।

চ' তবে লুকিয়েচুবিয়ে গেরস্থ ঘবে ওটাকে ঢুকিয়ে দি। কালা শেখ বলে, ভোরবেলা ডাক পড়বেই বেদে-বেদেনীব। মাসেরটা কামিয়ে নেওয়া যাবে।

টগরমণি চমকে ওঠে। বলে কি কালা শেখ! গুরুর কাছে কি প্রতিজ্ঞা করেছিল, ভুলে গেছে নাকি। না না, জান থাকতে এমন গুনাহ, না না, টগরমণি কাঁপে। ঝাঁপির মধ্যে পদ্মনাগের নডাচডার শব্দ পায় যেন। জয় মা বিষহরি, গুনাহ মাপ করিস মা, বেদেব আজ মাথার ঠিক নেই।

কই গো মাঠান, কাঁচি নয নাই নিলে, চাকু নয নাই নিলে, তাই বলে খালি হাতেই বিদেয় হই কি করে। কই গো বাবুমশাই, মুখ তুলে চাও, সোনা-দানা দব-দালান হাতি-ঘোড়া না হয় দান নাই কবলে, বলি, বেদে-বেদেনীর চোখের দিকে তাকিয়ে একখানা ছেঁড়া প্যান্টলুনই দাও।

কালা শেখেব গুরু ছিল আত্মা ফকির। দশ গাঁয়ের লোক আজও বলে আত্মা ওঝা। সাপ, দিযেই সাপেব বিষ তুলত। স্বর্গ-মত পাতাল যে কুলেই থাকুক সাপ, আত্মা ওঝার এক বাণে সুডসুড কবে বাবাজীবন এগিয়ে আসত। ফকিরেব পায়েব তলায লুটিযে লুটিযে কাঁদত, তাবপব সাপে কাটা দেহ থেকে নিজেব বিষ নিজেই চুষে চুষে তুলে নিত। হাঁ, ওঝা ছিল আত্মা ওঝা। কড়ি-চালান, সিঁদুর-পড়া, হলুদ-পোড়া, বশীকবণ, সম্মোহন বল সম্মোহন, স্তম্ভন বল স্তম্ভন, যা চাই সব।

সেই আত্মা ফকির আজ আব নেই। আজ তাব কববখানায প্রতি সন্ধ্যায প্রদীপ দেয় টগবমণি। ঘবেব লাগোযা গোরস্থান, মুঠো মুঠো ফুল ছড়িযে দেয। আব হাঁটু গেড়ে বসে সকাল সন্ধ্যা অন্তব নিংডানো শ্রদ্ধা বিছিয়ে দেয।

কই গো মাঠান, একমুঠো চাল দাও, নইলে আটা দাও, দিযে বেদে-বেদেনীর মুখেব দিকে একটু তাকাও। আর পাবি না গো, আব পাবি না।

কালা শেখ বলে, না পাবলে পেট চলবে কি কবে?

টগবমণি বলে মা বিষহরি, এ কেমনতর বিষ ছড়িয়ে দিলি বাজ্যি জুড়ে। মা, ওমা, একবার মুখ তুলে চা, চা, চা।

মা বিষহবির রাজ্যে বিষ নেমেছে নদীর ঢলের মত। ঢলতে ঢলতে ফুলতে ফুলতে দু' কুল ছাপিয়ে ডাঙায় বসেছে লেপটে। শঙ্খচুড বেশ ধরেছে ক্ষুধার, পদ্মনাগ হয়েছে ঐ বীমডক, চন্দ্রনাগ ব্যভিচাব, চৌষট্টি নাগের চোষট্টি রূপ। বিষেব বুদবুদ ঠোকাঠুকি করে ফুটচে। যন্ত্রনায় নীল হযে যাচ্ছে আকাশ,

মাটি চোয়াড়ে হয়ে ফেটে বাঁকা চোরা খোঁদল সৃষ্টি করছে। বিষের ঢল নেমেছে গো, ঢল নেমেছে বিষের, কালপেঁচা চিৎকার করে জানান দিচ্ছে। মা বিষহরির বেদী টলছে…থরথর থরথর বাতাস কাঁপছে, জয় বিষহরি মা গো, জয় বিষহরি মা, কাউরে কামাক্ষ্যা মা তোর বিষেভরা গা।

মা বিষহরি তার অনুচর নিয়ে বসলেন, বললেন, ওহে কুলশ্রেষ্ঠ নাগসন্তান, মানুষের কি কি প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছ বল ?

নাগ-নাগিনীরা একবাক্যে জানান দেয়, মা বিষহরির জয়জয়কার ছাড়া আর কিছুই তো নজরে পড়ে না।

খলবল খলবল করে বিষহরির রাজ্য মুখর হয়ে ওঠে।

কালা শেখ বাড়ি আছ নাকি গো ?

টগরমণি বাইরে আসে। বলে, আছে, কেন ?

শাগ্‌গীর একটু খবর দাও। দাওয়ায় সাপ ঢুকেছে, বার করতে হবে।

কার বাড়ি ? টগরমণি চোখেব তাবা দুটো এক পাক ঘোরায়।

মধু কামারের বাড়ি। নিবাস ঝাউতলি, পুবপাড়া।

অ।

টগরমণি হাতের আঙুল তুলে বলে, তা পাঁচ টাকা লাগবে, আর সেরখানেক চাল দাও ভালো নয়তো আটা, আর নতুন ধুতি বেদের জন্য, আমার জন্য রাঙা শাড়ি।

মধু কামার দাঁতে দাঁত চাপে, তা হবে'খন। আগে চল তো

তিন গ্রাম দুই মাঠ ভেঙে ঝাউতলি আসতে আসতে বেলা দু' পহর। দাওয়ায় নেমেই কালা শেখ বলে, জল আন এক বদনা। একটু কাঁচা হলুদ আন, এক চিলতে ভিত-মাটি আর দু-তিন টুকরো চালের খড়।

দাওয়ার এক কোণে সত্যি সত্যি একটা সরু গর্ত হয়ে আছে। গর্তের চারপাশে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে কালা শেখ বলে, কালনাগিনী গো, কাল-নাগিনী। জাত সাপ।

দর্শকরা চমকে ওঠে, বলে কি ওঝা, কি সর্বনাশ !

কালা শেখ বলে, তা পাঁচ টাকা লাগবে, চাল লাগবে একসের, আটা লাগবে একসের, ধুতি লাগবে একখানা আর রাঙা শাড়ি একখানা।

হবে হবে, আগে বার কর, দেখে নেই।

বাঁশি এগিয়ে দিল টগরমণি। গর্তের চারপাশে নেচে নেচে সেই বাঁশি বাজাতে শুরু করল কালা শেখ। আহা কি মধুর সুর, সাপ তো সাপ, মানুষই বশ করে ফেলতে পারে ওঝা।

টগরমণি বসল ভিত-মাটি দিয়ে মাদুলি বানাতে। গেরস্তের অমঙ্গল দূর হবে। এই মাদুলি হাতে থাকলে সাপা-খোপা, ভূত-দানো আর ধারে কাছেও ঘেঁষবে না। রুদ্ধ নিশ্বাসে সবাই লক্ষ্য করছে কালা শেখকে। শেখ দুলে দুলে বাঁশি বাজাচ্ছে। আবার হঠাৎ বাঁশি থামিয়ে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ছে।

আয় আয় আয়, আয় নাগিনী আয়
উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিম কালুর মন্ত্র যায়
সূর্য মোব বাপ, চন্দ্র মোর খুড়া আর বসুমতী মা
আয় আয় আয় নাগিনী, বান্ধি সকল গা।

তারপর হঠাৎ সে চেঁচিয়ে হাঁক দেয়, ও বেদেনী, নাগ দেখছিস না নাগিন?

টগরমণি উত্তর কবে, নাগিন গো নাগিন।

রাজ না পাতি? .

বাজ গো রাজ।

মণি আছে, না নেই?

আছে গো আছে।

তা হলে তোব সাহস তো কম নয়। হাত পা বেঁধে নিয়েছিস, না অমনি সাপ ধবতে এয়েছিস? -বলেই আবাব মন্ত্র পডা শুরু কবে—

হাত বন্ধন গলা বন্ধন, পেট পিঠ বুক
আর চরণ বন্ধন
অষ্টাঙ্গ বাঁধিলাম আমি মনসাব বরে
সাপ-খোপা, বিছা-চেলা কি কবিবে মোরে।

গর্তের মুখে তিনবার ফুঁ দিয়ে আবার বাঁশি বাজাতে শুরু করে। অনেকক্ষণ ধরে কসরত চলে। কথোপকথন চলে বেদে আর বেদেনীতে। দর্শকরা গোগ্রাসে ওদের ক্রিয়াকলাপ গিলছে। এইবার বেরুবে। দেখছ না, কালা ওঝা কেমন হুমড়ি খেয়ে পড়ছে।

বেদেনী হঠাৎ চিকন গলায় হাঁক দিল, ও নিষ্কর্মা বেদে!

কালা শেখ উত্তর করল, হুঁ!

কে তোমার গুরু ? অমন যে ফোঁসফোঁস করছ, নাগিনী ধরে দেখাও।

দর্শকরা মনে মনে বলে, হ্যাঁ দেখাও, দেখাও।

কালা শেখ সুর চড়িয়ে বলে, কি বললি ? আমার গুরু আম্মা ফকির, জানিস ? বাণ মেরে মুখ বাঁকা করে দেব, সামলে কথা বলিস।

টগরমণি হেসে ওঠে খিলখিল করে, যেমন গুরু তাব তেমন চেলা।

বটে ! কালা শেখ তার টোপর থেকে বার করে সরু হাত-চারেক লম্বা বেতের কাঁটা। আর ঝাঁপি খুলে একটা ব্যাঙ। তারপব ব্যাঙটার পেটেব মধ্যে কাঁটাটা ঢুকিযে দেয দেখতে দেখতে। ব্যাঙটা ছটফট করে ওঠে। কালা শেখ বলে, থাম থাম, নড়িস না বাপু, থাম। বলতে বলতেই সে গর্তের মুখে ব্যাঙটাকে ছেড়ে দেয। ছাড়া পেয়ে ব্যাঙটা গর্তেব মধ্যে ঢুকতে থাকে। বেতেব কাঁটার একপ্রান্ত ধরে থাকে কালা শেখ।

হঠাৎ চমকে উঠল কালা শেখ। ঠোঁটে আঙুল চেপে সবাইকে ইশারা করল, চুপ চুপ।

টগরমণি বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা। সাপে টোপ গিলছে। যাক, ইজ্জত বাঁচল তা হলে। ঘামতে শুরু কবল টগবমণি। সাপে টোপ গিলছে, সঙ্গে সঙ্গে গিলছে বেতের কাঁটা। গিলবাব সময কাটা'ব ধা'ব বুঝতে পারবে না সাপ, কিন্তু বেদে যখন টান দেবে ধীবে ধীবে তখনই বুঝবে সে, গলায যেন কি তাব আটকে যাচ্ছে।

কালা শেখ বিড়বিড় কবে মন্ত্র পড়তে শুরু করে। কপালে ঘাম জমে যাচ্ছে তার। কেমন এক উত্তেজনায পেয়ে বসে। এক-একবাব সে টগবমণির দিকে তাকাচ্ছে আবাব তাকাচ্ছে গর্তেব দিকে। চোখজোড়া তার এখনই যেন ফেটে পড়বে। যাক, আব খানিকক্ষণের মধ্যেই সাপ বশ করে দেখাবে কালা শেখ। আর সঙ্গে সঙ্গে পাঁচটা টাকা, একসেব চাল, একসের আটা একটা রাঙা শাড়ি, একটা ধুতি, সবাব উপরে ইজ্জত।

এই, সবে যাও, সরে যাও, কাছে ঘেঁষো না। এইবাব, মা বিষহবি, মান রাখিস মা। বেতের কাঁটা ধবে টানতে শুরু করল কালা শেখ। আঙুল কেমন কেঁপে কেঁপে উঠছে, জোবও লাগছে, নাগমশায় তবে ছোটমোট নয় নিশ্চয়ই ! টানতে থাকে কালা শেখ, বেবো বেবো, জয় মা বিষহরি, মান রাখিস, মান রাখিস মা।

শেষ পর্যন্ত মান ইজ্জত সবই বাঁচল কালা শেখের। সত্যি সত্যি দোমড়াতে

দোমড়াতে কাঁটায় আটকে-যাওয়া কালনাগ বেরিয়ে পড়ল সবার চোখের সামনে। যন্ত্রণায় বিষ কেউটের লেজের ঝাপটা পড়ছে মাটিতে। মুখ দিয়ে লাল তরতাজা রক্ত পিচ্ছিল দেহের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। মুখ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে।

কালা শেখ হাঁপাতে থাকে। এইবার সে সাপের লেজে পা দিয়ে তাকে টানটান করে তুলে ধরে। দেখুন বাবুমশাইরা, দেখুন মা ঠাকরুণরা, কত বড় কালসাপ বাসা বেঁধেছিল ঘরে।

টগরমণি চেঁচিয়ে উঠল, বেদে, বেদে ভাই, সাপিনী কি গর্ভবতী ?

কালা শেখ উত্তর করল, গর্ভবতী।

তবে তাকে আর নির্যাতন দিও না গো, নির্যাতন দিও না।

না না, দেব না।

তবে তার কাঁটা খুলে তাকে বিদেয় দেও গো, বিদেয় দেও।

দিচ্ছি, দিচ্ছি।

সত্যি সত্যি কৌশলে কাঁটা খুলতে বসল কালা ওঝা।

আহা হা, কর কি কর কি ? মেরে ফেল না বাপু। গেরস্থ মধু কামার হা হা করে ওঠে।

কি কন বাবুমশাই, গর্ভবতী যে—

নিকুচি করেছে গর্ভবতীব। কে যেন হঠাৎ এক লাঠির খোঁচায় সাপটাকে উঠোনে এনে পিটতে শুরু করে।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামছে। কালা শেখ আর টগরমণি বাড়ি ফিরে এসেছে। মুখে বাক নেই কারো। কি করেই বা থাকবে ; টগরমণি শুয়ে পড়েছে মাদুর বিছিয়ে। কালা শেখ তামাক টানতে টানতে আকাশ-পাতাল ভাবতে বসেছে।

অনেকক্ষণ পর বিড়বিড় করতে করতে কালা শেখ বলে উঠল, দেখলি তো টগর, বাবুদের আক্কেলটা দেখলি! সারাদিন খেটে এলাম আটগণ্ডা পয়সা ধরিয়ে বিদেয় করলে! গজরগজর করতে থাকে কালা শেখ, একমুঠ চালও দিলে না, একটা ছেঁড়া নেকড়াও না। কি জানিস টগরমণি, পাপ ঢুকেছে হাওয়ায়। তেমন দিন আর নেই।

সত্যিই নেই। অনেক কথা মনে পড়ছে কালা শেখের।

তখন আত্মা ওঝারই দিন।

একদিন ডাক পড়ল ওঝার, যেতে হবে মুহুরি বাড়ি। কি ব্যাপার, না, সিঙ্গি মাছের কাঁটা ফুটেছে বউমার হাতে। বিষের যন্ত্রণায় আহা বেচারী নীলবর্ণ হয়ে গেছে।

চল চল যাচ্ছি, আত্মা ওঝা ডাকল কালা শেখকে, কৈ রে কালা, খবর পেয়েছিস? ওঝা ফকিরের এই এক দায়, সাপে কাটুক, বিছাই কামড়াক, একবার কানে শুনলে যেতেই হবে বিষ ঝাড়তে। যত বাধাই আসুক না কেন, ঝড় হোক, জল হোক, রাত হোক, দুপুর হোক, যেতেই হবে। আর যদি সে না যায়, যদি সে অবহেলা দেখায়, সব মন্ত্র তার নিষ্ফল হয়ে যাবে, আর কখনো ফল ধরবে না তাতে।

অগত্যা কালাকে নিয়ে আত্মা ওঝা ছুটল মুহুরিবাবুর বাড়ি। এক ফুঁয়ে সব বিষ-জ্বালা তার উড়িয়ে দিল। কতটুকুই বা পরিশ্রম হয়েছিল ওদের, তবু দেখ দু'হাত ভরে দিয়েছিলেন সেদিন মুহুরিবাবু। মাঠাকরুণ দিলেন দু' পাত অন্ন ব্যঞ্জন, গাছের এক কাঁদি কলা, লাল গামছা এক জোড়া আরো কত কি তেমন দিন আর নেই।

গো মড়ক শুরু হল একবার। এলোপাথাড়ি মরতে শুরু করল গেরস্থ বাড়ির গাই গরু-বাছুর। আত্মা ওঝা শ্মশানে মশানে তিন রাত ছুটো-ছুটি করে পাপ বাতাসের টুঁটি টিপে ধরল, বল্, গাঁ ছেড়ে পালাবি কি না বল্? ঝেঁটিয়ে বিদেয় করেছিল ওঝা সেই অপদেবতার বাতাস।

এসব মন্ত্রও কালা ওঝা সংগ্রহ করেছে তার গুরুর কাছ থেকে। কিন্তু আজ, কালা ওঝা হাঁটু থুতনি এক করে বসে তামাক টানে আর ভাবে, ভাবে আর তাকায় টগরমণির দিকে। মনড় হয়ে পড়ে আছে টগর।

ধীরে ধীরে অন্ধকার নামতে শুরু করেছে। আকাশের ডুবুরি হয়ে যে পাখিগুলো লাট খেয়ে খেয়ে নাচছিল এতক্ষণ, তারা কেমন ভয় পেয়ে আশ্রয় খুঁজতে শুরু করেছে। ফণিমনসার ঝোপঝাড় শক্ত শির তুলে এখন মা বিষহরির রাজ্য প্রহরা দিচ্ছে।

মা বিষহরি তার অষ্টনাগ নিয়ে বসলেন, বললেন ওহে কুলশ্রেষ্ঠ নাগ সন্তান, বল বল, মানুষের আর কি কি প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছ বল ?

খলবল খলবল করে নিম তেঁতুলের পাতা- নেচে উঠল। ইটের পাঁজা থেকে ঝুরঝুর কবে নোনা-লাগা দানা ঝরে পডতে শুরু কবল। কাশঝোপ থবথর করে শিউরে উঠল, যেন জানান দিল, মা বিষহরিব জয়জয়কার চারিদিকে। জয বিষহবি মাগো, তোরই জয়জয়কাব।

প্রদীপ জ্বালতে জ্বালতে কালা ওঝা স্বগতোক্তি কবল, বুঝলি টগব, হাওয়ার মধ্যে পাপ ঢুকেছে। দেখছিস না, সন্ধ্যাব বাতাসও কেমন ছোবল দেয়, বিস্বাদ লাগে। জ্বালা কবে চোখ মুখ দেখছিস না

পাশ-মোড়া দিয়ে নিরুত্তর হযে পড়ে বইল টগব। কি হবে প্রদীপ দিযে, কি হবে তেলটুকু খরচ কবে।

কালা শেখই প্রদীপ হাতে এগিযে এল কববেব কাছে। অন্ধকাব জমাট বেঁধে আত্মা ফকিরেব গোবস্থানটা ঢাকা। ঘাস জমেছে কববেব ওপব। কালা শেখ উবু হযে বসল। বসে সেই ঘাসেব ওপব হাতেব চেটো বোলাতে লাগল। কত স্মৃতি, কত বিস্মৃতি। কত সুখেব কথা, কত দুঃখেব। সব কিছু জট পাকিযে গুমরে গুমবে কেঁদে বেডাচ্ছে বাতাসে। কালা ওঝা বসে বসে বোমন্থন কবতে থাকে. কেমনভাবে সে সম্মোহন, স্তম্ভন, বশীকবণ সব শিখেছিল। কি অক্লান্ত শ্রম, কি অটুট ধৈর্য ধবতে হযেছিল ওকে। কিন্তু

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাডল কালা শেখ, নাহ, তেমন দিন আব নেই।

একদৃষ্টে সে প্রদীপেব দিকে তাকিযে রইল। তাকিযে থাকতে থাকতে প্রথমে তাব বঙের ধাঁধা লাগল চোখে, তাবপব সবকটি বঙ মিলে একটিই মাত্র রঙ হল, সেই বঙেবই জ্যোতিতে সমস্ত অনুভূতি তাব লোপ পেযে বসল।

একি, কাকে দেখছে কাল শেখ, এ যেন তাব গুরু আত্মা ফকিবই সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ঠিক এই মুহূর্তে ভীষণ কান্না পেল কালা শেখেব। ঠোঁট দুটো থরথর করে কেঁপে উঠল। কালা শেখ ঝাঁপিযে পড়ল কববেব উপর, তারপর চেঁচিয়ে উঠল, গুরু গো, বাতাসে যে সাপ লুকিযেছে মনে হয়, ওদের সঙ্গে লডব এমন মন্ত্র কেন শিখিযে দিলে না গুরু, গুরু গো—

কবরের উপর মাথা ঠুকতে শুরু করল কালা শেখ।

জুয়া

দূর থেকে শব্দ পেয়ে ওরা বুঝল, লঞ্চ আসছে। লঞ্চ অথবা মোটর বসানো ছোটখাট বোট। যে বোটে জল-পুলিশ অথবা জল-জুয়াচোর অথবা জেলে যে কেউই থাকতে পারে। জুয়াচোর অথবা জেলের জন্য ভাবছে না ওরা, জল-পুলিশের বোট হলেই ঘাটে তরি ডুববে। তাহলেই শেষ আশাটুকু এবার চোখের মণি থেকে টুপ করে খসে পড়বে; ব্যস, সব অন্ধকার।

ওরা বুঝল, সামনে এখন নতুন করে আবার এক রহস্য ঘনাচ্ছে। তাই নতুন করে আবার ওদের বুকের ভিতরে মৃত্যুভয় বড হয়ে ফেঁপে ফুলে অস্বাভাবিক চাপ সৃষ্টি করতে লাগল। এমন অসহ্য চাপ যে, কুয়াশাশীতল রাত্রির মধ্যেও ওরা দরদর করে ঘামতে লাগল।

এরই মধ্যে কচি শেখ বিজবিজ করে কি যেন বলবার চেষ্টা করছিল তখন থেকে, নবচন্দ্রের কানে এল না। একটানা লঞ্চের শব্দ কানের পর্দায় পুরু করে একটা স্তর জমিয়ে রেখেছে ওর। দৃষ্টিশক্তির উপর আরো বেশি করে ও নির্ভর করতে লাগল। ফলে, তীক্ষ্ণভাবে ও মোটর বোটের হেডলাইট, হেড-লাইটের ফোকাস মারার ধরন লক্ষ্য করতে লাগল। কিন্তু কিছুতেই ও অনুমান করতে পারছিল না, কার বোট, কে হতে পারে? জল-পুলিশ না জেলে? আর যাই হোক, সার্ভিস নয়। সার্ভিস লঞ্চ এ অসময়ে চলবার কথা নয়। কে তবে?

অনবরত ফোকাস ঘুরছে চারপাশে, কুয়াশার মধ্যে, আকাশের গায় আর দু' পাশের বুনোজঙ্গলে। ফোকাসের আলো শক্ত জমান একটা বল্লীকাঠের মত বাঁইবাঁই করে ওদের নৌকার উপর দিয়েও পেরিয়ে গেল। আর একটু হলেই ছুঁয়ে ফেলেছিল আর কি! ওরা দুজনেই হুমড়ি খেয়ে গলুইয়ের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গিয়েছিল তখন। তারপর অনেকক্ষণ আলোর ফলকটা তীরের দিকে ঘুরতে থাকায় বোটটাও অনেকখানি এগিয়ে এল। আরো

এগিয়ে আসার পর যখন ওরা বুঝতে পারল ওটা জল-পুলিশের বোট নয়, তখন যেন আবার ওরা ধড়ে প্রাণ ফিরে পেল।

কচি শেখ বিজবিজ করে বলল, নয় রে নব, পুলিশ নয়। মাছের লঞ্চ।

নবচন্দ্র ক্ষীণ কণ্ঠে সায় দিল, হুঁ ক্যানিং যাচ্ছে।

মাছের লঞ্চ পাশ কাটিয়ে চলে গেলে সামনে আবার অন্ধকার নামল। অন্ধকার আর কুয়াশা। অন্ধকারে তাকিয়ে থেকে লঞ্চের শব্দ আর জলের শব্দ, এ ছাড়া আর কিছুই নেই। খানিকক্ষণ আগে যেমন ছিল লাঠি-সোটা, লণ্ঠন, সোরগোল, চতুর্দিক থেকে গাঁকগাঁক করে ছুটে আসছিল; না, সে সব এখন কিচ্ছু নেই। এখন এক অন্ধকার। অন্ধকার আর কুয়াশা। এমন অন্ধকারই এ যাত্রা ওদের বাঁচিয়ে দিল। ওদের দুজনকে। কচি শেখ আর নবচন্দ্রকে। কিন্তু হতভাগ্য আর একজন এখন ছইয়েব ভিতর আলো দেখবার জন্য কাতরাচ্ছে, তার কথা এরা যেন ভুলে গিয়েছিল এতক্ষণ। ব্যাপারটা সেই পুরনো ছড়াটাকে সত্যি বলে প্রমাণ করে দিচ্ছে, চাচা, আপনা প্রাণ বাঁচা। ছডাটা কচি শেখের মনে পড়ল।

আমরা তাহলে বেঁচে গেলাম বে নব। দু' পাবে এখন সোঁদববন।

নবচন্দ্রকে এখন একটা চার পা-অলা জীবের মত কিম্ভুত দেখাচ্ছে। কোমরের দিকটা গুগুকের মত ভুসভুস করে ফুলে ফুলে উঠছে। কচি শেখের মনে হল, জল থেকে লাফিয়ে উঠে বড় জাতের একটা কাঁকড়া যেন গলুইটাকে চেপে ধরে বাঁচবার চেষ্টা করছে। এখন এগিয়ে গিয়ে ওর পাছায় একটা লাথি মারলে ঘাবুৎ করে জলেই ও উলটে পড়বে। পড়লে ব্যাপারটা মন্দ হয় না। সঙ্গে সঙ্গে ও নবচন্দ্রের ফুলে ওঠা পাছার দিকে বৈঠা দিয়ে একটা খোঁচা মারল।

নবচন্দ্র ঘুরে তাকাল। পলকেই আবার আতঙ্কে চোখ ফিরিয়ে নিল পিছনে। মনে হল পিছনে এখনো সেই ভোমরার মত লঞ্চের শব্দ গুনগুন করে ছুটে আসছে। লঞ্চের শব্দ, আর জলের শব্দ। কান পেতে তারই মধ্যে কোন মানুষজনার হৈ-হুল্লোড়, লাঠি-সোটার শব্দ কিংবা ঐ ধরনের অন্য কিছু শুনবার চেষ্টা করল ও। সামনের দিকে আকাশ। আকাশ আর নক্ষত্র। ধ্বকধ্বক করে নক্ষত্র জ্বলছে। কুয়াশার মধ্যে ঢাউস হয়ে ফুলে ফুলে অনেক নিচ অবদি নেমে আসছে। যেন লগি দিয়েও নাগাল পাওয়া যায় নক্ষত্রের। সব মিলিয়ে নবচন্দ্র যেন ভৌতিক কোন দৃশ্য দেখছে। ঘোলাটে চোখে কচি

শেখের দিকে তাকাল। তারপর আঁৎকে চেঁচিয়ে উঠল, এই বাঙ্কোৎ, বুকের কাছে তাকিয়ে দেখ, চকচক করছে।

কচি শেখ বুকের দিকে তাকাল। হাতের চেটো বুলিয়ে বুঝতে পারল, চটচট করছে এক চাপ রক্ত। ভেলি গুড়ের মত আঠা আঁঠা। লোমের গোড়ায় শক্ত হয়ে কামড়ে বসেছে। অথচ রক্তের সেই লাল রঙটুকু উবে গিয়ে কালো, ভীষণ কালো দেখাচ্ছে জায়গাটা। ওর মনে পড়ল, ভরতকে ডিঙিতে টেনে তুলবার সময় একবার ওকে বুকে চেপে ধরেছিল। তারই চিহ্ন রয়ে গেছে বুকে।

কচি শেখ অর্থহীনভাবে নবচন্দ্রের দিকে তাকাল, তাকিয়ে হাসতে লাগল।

নবচন্দ্র শিউরে উঠল হাসি দেখে। এমন দুঃসময়েও কেউ হাসতে পারে! আশ্চর্য। কচি শেখ কি ভুলে গেল, ওরা জীবন নিয়ে এখন ছিনিমিনি খেলছে। যে কোন মুহূর্তেই এখন যে কোন ঘটনা ঘটতে পারে তা ছাড়া ভরত ডিঙাল সড়কির ঘায়ে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে কাতরাচ্ছে এখনো ছইয়ের ভিতর। সড়কির ফলাটা ভরতের বুকে না লেগে কচি শেখের গায়েও তো লাগতে পারত। কপাল ভাল, মাথা ঠাণ্ডা রেখে ভরত তবু মাছের মত লাফাতে লাফাতে ডিঙিতে এসে উঠতে পেরেছিল। লোকটা যদি বেঁচে যায়, কলজের জোরে বাঁচবে। নবচন্দ্র খানিকটা বিরক্ত হয়ে শুধাল, হাসছিল যে? মুছবি না রক্তটা?

মুছব। স্বাভাবিকভাবেই উত্তর করল কচি শেখ। তুই বেটা এমন ঘেবড়ে গিয়েচিস—বলতে বলতে জলের ঝাপটা দিয়ে বুক ভোজাতে লাগল কচি শেখ।

নবচন্দ্র বলল, এবার তা হলে আলো জ্বালি? আর কোথাও রক্ত আছে কিনা দেখে নে এ বেলা।

ডিঙিটাকে জলে না চুবলে রক্ত যাবে না রে। ভিতরে যা, গোটাটাই রক্তে ভেসে গেছে, দেখে আয়। বলল কচি শেখ।

নবচন্দ্রের বুকের ভিতর মুচড়ে উঠল। ভরতটা বুঝি এতক্ষণে শেষই হয়ে গেল। সাড়া পাচ্ছিস কিছু?

দুজনে এবার দু' গলুই থেকে ছইয়ের দিকে দৃষ্টি পাতল। ডিঙির দুলুনিতে ছইটাও দুলছে। খুব স্তিমিতভাবে, বুকের স্পন্দনের মত একটু একটু উঠছে আর নেমে আসছে। আর গলুইয়ের সঙ্গে ঠেঠার ঘষা খেয়ে অদ্ভুত একটা আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। যেন ভরত ডিঙাল ছইয়ের ভিতর গড়াতে গড়াতে

যন্ত্রণা প্রকাশ করছে ও রকম ভাষায়। আজ পাঁচ বছর হল ওরা তিনজন আর এই ডিঙি নৌকো এক হয়ে মিশে আছে। এই পাঁচ বছরে কত কি যে ঘটে গেল! কতবার ওরা বাঁচল। কতবার ওরা মরেও মরল না। অথচ আজ ভরত ডিঙাল, কতক্ষণইবা, আর কতটুকুবা পরমায়ু ওর। এইবার একজনকে ওরা বিদায় দেবে। ভরত ডিঙাল ওদের স্মৃতি থেকে ধীরে ধীরে মুছে যেতে থাকবে। আরো কতজনাইতো মন থেকে একে একে মুছে গেছে ওদেব।

তুই একবার ভিতবে যা নব। কচি শেখ বলল। বাইরে আমি পাহারা দেই, তুই দেখে আয় একবার।

নবচন্দ্র চারপাশে আর একবাব তাকাল, কুয়াশা আর অন্ধকার। ডিঙিব নিচে গাঙের জল ঘষঘষ করে গা ঘষছে। তুই তীরের কিছুই ওর চোখে পড়ল না। অন্ধকার ছাড়া কিছুই না। ডিঙিটা বোধহয় মাঝগাঙ দিয়ে চলেছে এখন। ভরতের নাম ধরে ও ডাকল, ভবত, এই ভরত।

উত্তর এল না। পরস্পর আর একবাব ওরা মুখ চাওয়া-চাইয়ি করে অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ। তারপর হামা দিয়ে ছইয়ের ভিতর ঢুকে পড়ল নবচন্দ্র। অন্ধকার আরো জটিল এখানে। জমানো একটা পাথরের মত ভারি মনে হচ্ছে ভিতরটা। এখানেই পড়ে আছে ভরত।

নরম গলায় আবার ডাকল নবচন্দ্র, ভরত রে, এই ভবত।

এবারও কোন সাড়া পেল না ও। তা হলে কি শেষ হয়ে গেছে ভরত! আতঙ্কে ছইয়ের গায়ে লণ্ঠনটাকে খুঁজবাব চেষ্টা করল। কিন্তু নড়তে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ভরতেরই গায়ে। গা, না পা এটা? লোমশ, গুলি-পাকানো মাংস পেশি শীতল মনে হল ওর! পায়ের নখ কি ধাবাল, বাপ্‌স! হাঁটুতে ওর পায়ের নখ আঁচড় কাটছিল। হাঁটু সরিয়ে খানিকটা ঝুঁকে এল নবচন্দ্র। ভরত শ্বাস টানছে কি না বুঝবার জন্য খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল।

কি রে নব, বলে কি ভবত? ছইয়েব বাইরে থেকে কচি শেখ নবচন্দ্রকে শুধোল।

নবচন্দ্র উত্তর করল না।

ভরতের হাঁটুর কাছটায় চটচট করছে। এ্যাঁ, এতদূর অবদি রক্ত গড়িয়েছে তাহলে। ঝনাৎ করে আর এক পলকের জন্য সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলীতে ঝাঁকানি খেল নবচন্দ্র। নিজেকে সামলাবার জন্য কপাড়ের খুঁটে দ্রুত হাত ঢুকিয়ে দেশলাই বার

করবার চেষ্টা করল। ধুত্‌তোর, দেশলাটা গেল কোথায়?' এই কচি, মাচিস আছে? অন্ধকারে ছাই কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না।

রোশ, নিয়ে আসছি। ডিঙিটা একটু দুলে উঠল। নবচন্দ্র বুঝল, কচি শেখ ছইয়ের দিকে এগিয়ে আসছে। স্থির হয়ে রইল ও।

তুই বেটা ভয়েই মরে গেলি! এত যদি ভয় তবে এ লাইনে কেন বাবা! বলতে বলতে কচি শেখ উটের মত ছইয়ের ভিতর গলা ঢুকিয়ে দেশলাই জ্বালল।

এক চিলতে আলোয় চমকে উঠে নবচন্দ্র দেখল, ভরত কুৎসিত একটা ভঙ্গি করে বেকায়দা ভাবে পড়ে আছে। এক হাঁটু ভাঁজ করা, দোমড়ান। আর এক পা ছড়িয়ে টান টান হয়ে আছে কালির ফটোর দিকে। বুকের উপর রক্তের ভুজভুজি; ভেলি গুড়ের মত রক্ত ছড়ান পাটাতনে।

কি রে, কি হল? কাঠিটা নিভে যাচ্ছে দেখে খিঁচিয়ে উঠল কচি শেখ। হাঁ করে বসে থাকবি নাকি বেকুফ?

নবচন্দ্রের নড়তে কেমন ভয় করছিল তখন। জখমিটা বড় মারাত্মক। বাঁচবে তো ও। নাকি এই শেষ।

কচি শেখ আবার কাঠি জ্বালল। দেখল, এক হাতে রক্ত খামচে পড়ে আছে ভরত। আর এক হাত শিয়রের দিকে, গয়নার বাক্সটার দিকে টেনে রেখেছে। বাক্সটায় জ্যাবড়াভাবে কয়েক গুচ্ছ গোলাপ আঁকা, গোলাপগুলি যেন ধরতে চাইছে ভরত।

এই। কচি শেখ শুধোল, চোখ দুটো দেখেছিস?

নবচন্দ্র দেখল, ভরতের চোখ দুটো খোসা ছাড়ান লিচুর ফলের মত সজল, ফ্যাকাশে। কাঁদছে নাকি ও!

এই প্রথম ওর চোখে জল দেখলাম। বলল কচি শেখ।

আমিও। বলল নবচন্দ্র। আমিও কোনদিন ওর চোখে জল দেখব ভাবি নি।

আর একটা জ্বলন্ত কাঠি নিঃশেষ হওয়ার পর কচি শেখ আবার একটা কাঠি জ্বালল। আঙুলের ডগায় ছেঁকা খেয়ে ও এবার চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, উহ্‌, আঙুল পুড়িয়ে দিলি আমার! এবার তুই লণ্ঠনটা জেলে নে নবচন্দ্র।

নবচন্দ্র খানিকটা সম্বিৎ ফিরে দেখল, ভরতের বাঁ পাশে বেড়ার গায় লণ্ঠনটা ঝুলছে। হামা দিয়ে ও ভরতকে ডিঙোল, তারপর অস্পৃশ্য জিনিসের মত দু'আঙুলে আলতোভাবে লণ্ঠনটাকে তুলে নিল।

কাঠি নিভে যেতে আবার অন্ধকার। কচি শেখ বলল, বাইরে আয় জ্বেলে নিয়ে যা।

বাইরে এল ওরা। চিমনি কল খুলতে খুলতে নবচন্দ্র বলল, ভরতের গাটা কেমন শীতল মনে হল রে কচি। বোধ হয়—

কচি শেখ খুব জোরে শ্বাস টানতে টানতে বলল, শালার এই লাইনটাই বড় খচরা। এরচে যদি পুলিশে ধরত অনেক ভাল হত। ছোটখাট কিছু ঘঁাতানি খেয়ে হাজতে ঢুকে থাকাও অনেক ভাল। জানে তো আব খতম হত না কেউ। সবই ওর কপাল।

নবচন্দ্র দেশলাই জ্বেলে লণ্ঠনের পলতেয় আগুন ছোঁয়াল। তাবপব চিমনিটাকে উপুড় করে বসিয়ে কচি শেখেব দিকে চোখ ফেবাল। ওব চোখ ত্নটো গুলিখোরের মত লাল টকটক কবছে। কপালেব নিচে চুল গড়াচ্ছে, থুতনির কাছে খোঁচা খোঁচা দাড়ি জমে আছে, অনেকদিন কামায় নি ও। যেন অনেকদিন ধবে একটানা নেশা কবেছে ও। নবচন্দ্রেব কেমন ঘেন্না হচ্ছিল ওব দিকে তাকাতে।

সামান্য একটু নেশা ওরা তিনজনেই করেছিল। নেশা না কবলে এসব কাজে হাত বসে না। নেশা না করলে এমনভাবে হাজারটা লোকেব মাঝখান থেকে পালিয়েও আসা সহজ হয় না। কিন্তু একটি লোকও বটুখালিব বাজাবে ওদের ঘুরতে দেখে বুঝতে পারেনি, কি ওদের অভিসন্ধি, কি অঘটন আজ বাতে ওরা ঘটাতে চলেছে।

সমস্ত ঘটনাকেই আশ্চর্য রকম নাটকীয় বলে মনে হতে লাগল নবচন্দ্রেব। নাটকের বিভিন্ন দৃশ্যের মতই উত্থান-পতনময় ঘটনাগুলো সারাক্ষণ ঘটে গেছে।

সন্ধ্যায় বটুখালির ঘাটে নৌকো বেঁধে, বাজারে। বাজাব থেকে সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ির বাইরের বারান্দায় রাত্রিবাসের জন্য আশ্রয় গ্রহণ, তারপর গভীব রাতে ঘরে ঢুকল ত্নজনে, ভরত আর কচি। দরজায় নবচন্দ্র ক্ষীণ আলোয় টর্চ ঘোরাল এপাশে ওপাশে। সিন্দুকও পাওয়া গেল। সিন্দুক খোলা অবধি কাকপক্ষীও টের পেল না। বাড়ির কর্তা মশারী কাঁপিয়ে একবার কেশে উঠলেন। বুঝতে পারল না ওরা লোকটা ঘুমের চোখেই কাশল কিনা! তিনজনেই ছায়ামূর্ত্তির মত খানিক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। নিশ্বাসের শব্দও চেপে রইল।

নাহ্, ঘুমিয়েই আছে লোকটা। সিন্দুক থেকে গয়নার বাক্সটা টেনে

বার করল ভরত। ভারি মনে হচ্ছে কি। বাক্সটা বুকে চেপে নাচতে ইচ্ছে হল ওর।

আর ঠিক এই সময়ই অতর্কিতে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। মশারীর ভিতরে সেই লোকটা পুরোপুরি জেগে উঠেছে। একলাফে লোকটার বুকের উপর চড়ে বসে ড্যাগার তুলে ধরল কচি শেখ। তারপর, তড়িতেই আবার তিনজনে লাফিয়ে ঘরের বাইরে এসে ছুটতে শুরু করল।

ঘাটের কাছাকাছি এসে বল্লমের খোঁচায় চিৎকার করে লুটিয়ে পড়ল ভরত। বুক থেকে তবু ও বাক্সটাকে আলাদা করল না। মাছের মত লাফাতে লাফাতে নৌকায় এসে আছড়ে পড়ল।

তারপর—

হ্যাঁ তারপর এক দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেছে। ভাবতে ভাবতে নবচন্দ্র কচি শেখের দিকে তাকাল। লণ্ঠনের আলোয় কুয়াশাটাকে স্পষ্ট এখন ধরা যাচ্ছে। জম্পেশ করে চেপে বসেছে কুয়াশা। পাটাতনের উপর টুপ টুপ করে জল গড়াচ্ছে। নদীতে জলের টান এখন ভাঁটার দিকে। ফলে তেমন কোন ঢেউ নেই আজ। ঢেউ থাকলে আরো বিপাকে পড়ত ওরা।

কি রে, কি দেখছিস? চোখ নাচিয়ে প্রশ্ন করল কচি শেখ।

তোকেই দেখছি। নবচন্দ্র ম্লান চোখে তাকাল।

আমাকে? ফুঃ, তুই এমন ভয় পেয়েছিস নব। তোদের মত লোক নিয়ে বড় কাজে হাত দেওয়াই ঠিক নয়।

ভ্রূ কুচকে তাকাল নবচন্দ্র। বলল, ভরতটার জন্য বড্ড খারাপ লাগছে, নইলে আর কি। বাক্সটাও তো পাওয়া গেছে! বাক্সটার কথা এই প্রথমবার উচ্চারণ করল নবচন্দ্র।

বেশ মালদার বাক্স কিন্তু! কচি শেখের লোভাত চোখ চকচক করে উঠল। কয়েক মাস পায়ের উপর পা তুলে জিরিয়ে নেওয়া যাবে, কি বলিস?

হুঁ। ছোট্ট করে উত্তর করল নবচন্দ্র। হ্যারিকেনে শিষ উঠছে খেয়াল হওয়ায় পলতে-কলটাকে খানিক ঘুরিয়ে শিখাটাকে খাটো করে নিল ও।

তাছাড়া একটা কথা বলব? কচি শেখ নবচন্দ্রের দিকে তাকাল।

কি কথা?

হয়তো শুনতে তোর খুব খারাপ লাগবে, তবু সত্যি বলেই বলতে পারব।

কি কথা? বল না।

ধব্, ভরত আর বাঁচল না। কচি শেখ গলা নিচু করে বলবার চেষ্টা করল। এতবড় জখমির পর কেউ বড় একটা বাঁচে না। কিন্তু কি বলতে চায় ও। নবচন্দ্র বড় বড় চোখে তাকিয়ে রইল ওর দিকে।

যদি শেষে পর্যন্ত না-ই বাঁচে ও তাহলে এবাব গয়নার বাক্সটা ভেঙেচুরে আমরা দুজনেই ভাগ করে নেব। ব্যাপারটা কিন্তু কম নয়রে নব। বরাবব তো আমবা তিনজনে পেতাম, এবার নেব দুজনে।

আর যদি ও বেঁচে ওঠে ?

সে তা হলে অন্য কথা। অবশ্য ও না মরলেই ভাল ; আমাদেব তিনজনের কেউই যেন না মরে·· শুকনো ঠোঁটে খুব শীতলভাবে হাসল কচি শেখ। তারপর একটু সজাগ হয়ে বসে গলা তুলে বলল, বাহ্ ওস্তাদ, লণ্ঠন জ্বেলে বসে বাইরেই থাকবি নাকি ! ভিতরে যা ; কিছু করা যায় কিনা দেখে আয়।

যেন এইমাত্র আবার দায়িত্বজ্ঞান ফিবে পেল নবচন্দ্র। .হন্তদন্ত হয়ে লণ্ঠন নিয়ে ছইয়েব ভিতর ঢুকে পড়ল।

ডিঙিখানা নিতান্তই ছোট বলে ছইয়ের ভিতর পরিসরটা নেহাতই কম। তারই গায় একপাশে সিঁদুরমাখা মা-কালীর একটা ফটো ঝুলছে। আব ওপাশে একখানা ক্যানেস্তাবা টিনের বাক্স। তার গায় গুটি কয়েক মেয়ের ছবি আঠা দিয়ে সাঁটান। ছবিগুল্যের গায়ে আঙুল ঘষা বিশ্রী সব দাগ পড়েছে। একটু তফাতেই একটা মাছ ধরা জাল, মাছ কোপাবার কাঁটা। প্রয়োজন হলে ঐ কাঁটাতেই মানুষ কোপানো যায়। একবার তাক কবে ছুঁড়ে মারলে সুড়সুড় করে ঢুকে যাবে, বেব করার টান পড়লে নাড়ি-ভুড়িতে উলটো কাঁটায় জড়িয়ে থাকবে।

লণ্ঠনটাকে কাঁটার গায় ঝুলিয়ে দিল নবচন্দ্র। হেই ভরত, ভরত রে—ভরতের হাঁটুতে একটু ধাক্কা দিল ও।

সাড়া শব্দ পাচ্ছে না দেখে বুকেব দিকে ঝুঁকে পড়ল। ইস, কি রক্ত রে বাবা! পায়ের নিচে চিটচিট করছে। ভরতের এলানো হাতটাকে একটুখানি তুলে ধরল ও। আরে ব্বাস্, এখনো রক্ত বেরুচ্ছে রে কচি! প্রায় চেঁচিয়েই উঠেছিল নবচন্দ্র।

হাতটাকে ও তুলে রাখল। ক্ষত জায়গাটায় একতাল মাংসপিণ্ড জবার

পাঁপড়ির মত বেরিয়ে এসেছে। বল্লমটা বড় বেয়াড়া জায়গায় ঢুকে গেছে ওর। আর একটু নিচে লাগলে ফুসফুসটা বেঁচে যেত। হয়ত বা বাঁচতেও পারত ভরত। বেচারা ; সবই কপালের লেখা।

হাতটাকে নামিয়ে কাটা জায়গাটায় একটুখানি চাপ দিয়ে রক্ত বন্ধ করবার চেষ্টা করল নবচন্দ্র। ভরতের মাথার দিক খানিকটা বাঁকাভাবে ঘুরে গয়নার বাক্সের দিকে এলিয়ে পড়ে আছে। কপালের পাশে কাটা দাগটা চিকচিক করছে আর একটা ঘায়ের মত। এই দাগটা কবে হয়েছিল নবচন্দ্র মনে করতে পারল। আজ যদি ভরত বেঁচে ওঠে ওর এই পেটের কাছের দাগটাও চিরকাল চিহ্ন হয়ে থাকবে।

রক্তের ফেনায় হাতের মুঠো ভরে উঠল দেখে নবচন্দ্র ক্ষত জায়গা থেকে হাত সরাল। অসহায়ভাবে ও দেখল, মাঝে মাঝে মুখ খুলে বড় বড় শ্বাস টানছে ভরত। একটু জল দেব মুখে! ভাবতে ভাবতে আবার ও কচি শেখকে ডাকল, এই কচি ভিতরে আয়। ব্যাপারটা কিন্তু ভাল নয় এখন।

কচি শেখ বলল, বাইরে একজনের থাকা দরকার। তুই আয়, আমি যাচ্ছি।

প্রস্তাবটা খারাপ নয়। এইভাবে ভরতের কাছে বসে বসে মৃত্যু দেখার চেয়ে বাইরে গিয়ে কুয়াশার নিচে বসা ভাল। সঙ্গে সঙ্গে ও উঠে পড়ল। বাইরে এল। আহ্, বেশ ঠাণ্ডা এখানে। বাইরে বসে দম ভরে শ্বাস টানা যাবে কিছুক্ষণ।

এই নে। বৈঠাটা নবচন্দ্রের হাতে দিয়ে কচি শেখ উবু হয়ে ছইয়ে ঢুকল। ঢুকে এক নিঃশ্বাসে ও ভরতের আপাদমস্তক একবার দেখে নিল। তারপর আর্তভাবে চেঁচিয়ে উঠল, এ যে হয়ে এসেছে রে নব?

নবচন্দ্র উত্তর করল, হুঁ। ভোর অবদিও টিকবে না আর। পারলে একটু জল খাওয়া কচি। এ সময় নাকি খুব তেষ্টা পায়।

কচি শেখ উত্তর করল, দাঁড়া খাওয়াচ্ছি।

যেন এইখানেই সব কথা ফুরিয়ে গেল ওদের। কচি শেখ এবার ভরতের গলায় জল ঢেলে দেবে ফোঁটা ফোঁটা করে। মৃত্যুকালে জল দিলে পুণ্য হয়। এক অর্থে কচি শেখ পুণ্য করবে এবার। করুক। নবচন্দ্র বাতাসের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বাতাসের ঝাপটায় শীতল হবার জন্য স্থির হয়ে বসে রইল।

তারপর, অনেকক্ষণ পর হঠাৎ লক্ষ্য করল ডিঙিখানা খানিক বেচাল-ভাবে দুলছে। বুঝতে পারল, কচি শেখ এপাশ ওপাশ দুলতে শুরু করেছে

ছইয়ের ভিতর। আরো কিছুক্ষণ পর ও বাক্স ঘষার শব্দ পেল। পাটাতনে ঝাপট মারার শব্দ, কান সজাগ রেখেই নদীর কুয়াশার দিকে তাকিয়ে রইল নবচন্দ্র।

আরো খানিকক্ষণ শূন্যতার মধ্যে কেটে যাওয়ার পর ও বুঝতে পারল, কচি শেখ ছইয়ের ভিতর থেকে বাইরে আসছে। এক হাতে রগড়ে রগড়ে একটা টিনের পাত্র নিয়ে আসছে। পাত্রটি দেখেই ও চিনতে পারল। আবার এখন মদ খাবি কচি?

আলবাত খাব। না খেলে আমরা তিনজনেই মরে যাব।

অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে রইল নবচন্দ্র। মদ খেলে একদিক থেকে সত্যি সত্যি বাঁচা যায় বলে মনে হল ওর। খেয়েই ডুবে থাকা যাক। কপালে যা আছে ঘটবেই।

কচি শেখ ঝাঁকি দিয়ে টিনটাকে মুখের কাছে ধরল। বুঝলি নব, রাতটা হয়ত কোনরকমে টিকে যাবে ভরত, কিন্তু তার বেশি নয়। বলতে বলতে ওর গলা কেঁপে এল। শত হলেও মরা বাঁচা হাতে নিয়েই তো এতকাল ঘুরছে ওরা। আজ স্রেফ এতটুকু ভুলের জন্য।

ডিঙির নিচ থেকে জলের শব্দ গলে গলে কানে আসছে। বাতাসে কুয়াশার গন্ধ। বালির মত গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে কুয়াশা ঘুরছে। ছইয়ের ভিতর থেকে কয়েক টুকরো আলো নদীর উপর ফোঁটা ফোঁটা পনিয়ে রেখেছিল। ফোঁটাগুলি জলের ঢেউয়ে একটু একটু করে কাঁপছে, ভেঙে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। আবার গুঁড়োগুলো একসঙ্গে মিশে গোলাকার ফোঁটা হয়ে উঠছে।

ফোঁটাগুলির দিকে তাকিয়ে রইল নবচন্দ্র। অনেক কথাই ওর মনে পড়ছিল। ভাঙা ভাঙা হারিয়ে যাওয়া, বহু পুরনো স্মৃতির গুঁড়ো সারা মন ভরিয়ে দিচ্ছিল ওর।

টিনের গায়ে শব্দ করে চেতনা ফেরাল কচি শেখ। কাছে ডাকল, আয়, গলা ভিজিয়ে নে।

নবচন্দ্র এগিয়ে এল। মিষ্টি মোলাম গন্ধটা ওর নাকে লাগল।

যাই বলিস মালটা কিন্তু খারাপ দেয়নি ওরা।

মগ থেকে খানিকটা গিলে নিয়ে ম্লান একটু হাসল নবচন্দ্র।

খানিকটা চাট পেলে ভাল হত। ভীষণ ক্ষিধে পেয়েছে, না রে?

নবচন্দ্র বলল, হুঁ। বলে মগটা আবার ও কচি শেখের দিকে ফিরিয়ে দিল। একটাই মগ। ফলে দুজনে একই মগে সইয়ে সইয়ে গিলতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর কচি শেখ বলল, তুই কি ভাবছিস আমি বলব?

কি ভাবছি? পাল্টা প্রশ্ন করে কৌতুকে তাকাল নবচন্দ্র।

তুই ভাবছিস, ভোর অবদিও টিকবে না ভরত। আমার কিন্তু মনে হয়, অত তাড়াতাড়ি ও মরবে না।

কুয়াশার জন্য ভোর হতে কত বাকি ধরা যাচ্ছিল না, তবু যতই সময় থাক, ভরত আর কয়েক পলক মাত্র বেঁচে আছে। অসম্ভব, তার বেশি আয়ু নেই ওর। কাটা জায়গাটা তুই ভাল করে দেখেছিস কচি? দলাখানেক মাংস ঝুলে আছে। তাছাড়া যা রক্ত।

রক্ত তো বেরুবেই। স্বাভাবিক গলায় বলল কচি শেখ। জখমটা তো আর কম নয়। তা হলেও বলছি সূর্য ওঠার আগে মরছে না ও। ততক্ষণে আমরা জঙ্গলের ধারে পৌঁছে যাব।

যখনই মরুক, ওকে কিন্তু কবর দেব আমরা। কবরের উপর ছোট ছোট ফুলগাছ পুঁতে দেব। আবার যদি সময় পাই, বেঁচে থাকি, গাছগুলো এসে দেখে যাব।

তোর বুকটা বড় নরম রে নব। অদ্ভুতভাবে হাসল কচি শেখ। এসব লাইনে না এসে উচিত ছিল তোর মায়ের দুধ খাওয়া।

খানিকটা অস্বস্তি বোধ করল নবচন্দ্র। তা হলে বলছিস মরে গেলে ওকে ভাসিয়ে দিবি?

না দেব কেন? কবরই দেব। ব্যাস, সব তখন ফুরিয়ে যাবে

আবার মদ ঢেলে মগ ভর্তি করল। টিনটা প্রায় খালি হয়ে এসেছিল।

ভর্তি মগ থেকে চোঁ চোঁ করে খানিকটা খেয়ে চোখ দুটোকে কুঁচকে ছোট করে, আবার ও খুলে ধরল।

তা যাই বলিস না কেন, এক ব্যাপারে কিন্তু ভালই হয়েছে আমাদের। ভরতটা এখনই মরুক আর পরেই মরুক সোনা-গয়নায় তো ভাগ বসাতে পারবে না। এবার আমরা পুরো গয়নাই দুভাগ করে নিতে পারব।

নবচন্দ্রের মনে হল ও যেন সত্যি সত্যি বাক্স থেকে আধা-আধি বখরায় গয়না তুলে নিচ্ছে। যতই নিষ্ঠুর হোক ব্যাপারটা, ওরা কিন্তু লাভবানই হচ্ছে শেষ পর্যন্ত।

কি রে নবচন্দ্র, তুই কিছু বলছিস না?

কি আর বলব। নবচন্দ্র মগটাকে কাচ শেখের দিকে এগিয়ে ধরল। থরথর করে হাত কাঁপছিল ওর।

আচ্ছা ধর, যদি আমরা আর একটা ব্যাপার করি। তাকাল কচি শেখ।

চোখের সামনে কুয়াশায় গুঁড়োগুলো আলোর ফুলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে নবচন্দ্রের। আকাশের তারাগুলোই নেমে এল কী! বুঝতে পারছিল না ও।

ধর, আজকে আমরা গয়নাগুলো দুভাগ করে না দিয়ে যদি একভাগ করে নেই।

মানে?

মানে আর কি। মানে খুব সহজ। ধর, তুই তো বলছিস, ভোর হওয়া অবদি টিকে থাকবে না ভরত। তাই যদি সত্যি হয় আমি তোকে পুরো বাক্সটাই দিয়ে দেব। আর না হলে আমিই নেব গয়নাগুলো।

ভরতকে নিয়ে জুয়া খেলবি। আর্তভাবে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল নবচন্দ্র।

কেন, দোষ কি তাতে। ওর যদি বেঁচে ওঠার আশা থাকত তা হলে না হয়,—

নবচন্দ্র অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে রইল। বাজি ধরা উচিত কি অনুচিত কিছুই ও বুঝতে পারছিল না।

মরে যাওযার পর তাসের পাত্তি আর ভরত তফাৎ থাকে কিছু? কচি শেখ এগিয়ে এসে নবচন্দ্রের ঘাড় ধরে ঝাঁকি দিল। নে নে, কপাল ঠুকে এবার লেগে পড়। সূর্য ওঠার আগে মরলে তুই পাবি সব গয়না, পরে মরলে আমি পাব।

নতুন করে সূর্যের মুখ আর দেখবে না ভরত, নবচন্দ্র স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছিল। তবু, তবু ওর এ ধরনের বাজি ধরতে বুক কাঁপছিল। আবার বলল, শেষ পর্যন্ত ভরতকে নিয়ে বাজি ধরব।

যাহ্ শালা তোর আবার সব কিছুতেই ধুকপুক করা। ওকে কি আর বাঁচাতে পারবি, তা হলে না হয়—

আবার শূন্য চোখে তাকাল নবচন্দ্র।

তা যখন পারবি না, তা হলে যা বলছি তাই কর। কপালে থাকলে লেগে যাবে তোর।

নবচন্দ্র বলল, বেশ ডুবেছি যখন সব দিক দিয়েই ডুবব। রাজি।

ডিঙির নিচে জলের শব্দ। জলের উপর আলোর ফোঁটাগুলি কাঁপছে। সামনে অন্ধকার, পেছনেও অন্ধকার। অন্ধকার আর কুয়াশা। নবচন্দ্র উঠে গিয়ে অন্য গলুইয়ে বসল। হাতে বৈঠা তুলে নিল। কচি শেখ খালি টিনটাকে লাথি কষিয়ে জলে ফেলে দিল। মগটা কেবল গড়াতে লাগল পাটাতনের উপর।

ছইয়ের ভিতরে ভরত। ক্ষত জায়গায় জবা ফুলের মত রক্ত মাংস দলা পাকিয়ে জমে আছে। ভুজভুজ করে তাই দিয়ে এখনো বুঝি রক্ত গড়াচ্ছে। মানুষ মরে যাওয়ার পরও কি রক্ত গডায়। ভেতবেব রক্তটা কি জমে যায় না কখনো।

নবচন্দ্র মাথাটাকে ঝাঁকিয়ে সাফ করার চেষ্টা করল। ভীষণ ধোঁয়াটে লাগছে এখন। হে মা কালী! রাতটা যেন রবারেব মত লম্বা, অনেকখানি লম্বা হয়ে যায়! ভরত বেচারা না মরা অবদি বাতটা যেন না ফুরায় মা। গুম হয়ে ছইয়ের ওপাশের গলুইয়ে ও কচি শেখকে দেখতে থাকে।

কচি শেখ ঢুলতে ঢুলতে বৈঠা চালাচ্ছে জলে। হঠাৎ ওব মনে হল, কি প্রযোজন ছিল এই বাজি ধরার। ডবপুক নবটাকে একটা কোঁৎকা মেরে জলে ফেলে দিলেই তো চকে যেত সব।

কি রে নবচন্দ্র, কি ভাবছিস?

কিছু না।

কিছু না কি রে? বাক্সটা না জানি তোব কপালেই বযে গেছে। কুৎসিত-ভাবে হেসে ওঠে কচি শেখ।

অমনভাবে হাসল কেন ও। সন্দেহ হল নবচন্দ্রেব। ত কি ওর অন্য মতলব মাথায় এসেছে। চোখটা কেমন ধ্বকধ্বক করে জ্বলছে ওর। তবে কি শালা বাক্সটাকে গায়েব করে কলা দেখাতে চায়। সঙ্গে সঙ্গে ওব চাবিটার কথা মনে পড়ল। চাবিটা কোথায়? কচি শেখ কি সবিয়ে রাখল। তাই বা সম্ভব কি করে? বাক্সটা তো কেউ আমরা খুলে দেখিনি এখনো। ছুঁয়েও দেখিনি। থাকলে তো চাবিটা ভরতের কাছেই থাকা উচিত।

ফলে ভাঙা ভাঙা গলায় শুধাল, চাবিটা কোথায়? এই কচি, চাবিটা পেয়েছিস?

বাক্সটা যখন হাতের কাছে, চাবি না হলেও চলবে আমাদের। উত্তর করল কচি শেখ।

না, তবু বলছি চাবিটার কি হল ? দেখেছিস ?

কি আবার হবে। ভরত হয়ত গিলে রেখেছে।

অসম্ভব নয়, অনেক সময়ই এসব জিনিস গিলে ফেলতে হয়। তবু নাবালকেব মত নবচন্দ্র শুধাল, তা হলে ওটা পাবি কি করে ?

কি কবে আবাব, পেট চিরে বাব কবে নেব।

নিবি। বিস্ময়ে প্রশ্ন করল নবচন্দ্র। পারবি তা ?

কেন পারব না। মবা মানুষের পেট চিবতেও ভয় নাকি। নে নে, ঘাই মাব ঘাই মার. এখনো বাত ভোব হতে বহুত্ সময়।

ভয়ে ভয়ে বেঠাটাকে জলে নামাল নবচন্দ্র। জলের শব্দ ছাড়া আব কিছুই ওর কানে আসছে না এখন। আলোব ফুল ছাড়া কিছুই ও দেখছে না আব।

কিন্তু হঠাৎই ওব মনে হল, ভবতটাও কি বাজি ধরেছে ওদেব সঙ্গে, ওর পাওনাটা ও আগেভাগেই কি ভাগ বসিয়ে বাখাব জন্য চাবিটাকে পেটের মধ্যে সেঁধিযে বেখেছে। যেন বলতে চাইছে ভবত, পাওনা গণ্ডা এক কানাকডিও ছাডব না আমি। আমার বখবাটা মিটিয়ে দিসবে নব, মিটিয়ে দিস।

নবচন্দ্র বুঝল, ওব হাত পা আবাব অবশ হযে আসছে।

দধীচির হাড়

এখানে থেকে দিগন্ত দেখা যায় না। আকাশ আর জল একসঙ্গে মিশে অতিকায় একটা গোলক রচনা করেছে বলে মনে হয়। গোলকের নাভিবিন্দুতে তুমি শুয়ে আছ। ভাসমান তোমার দেহটাকে ঘিরে সমুদ্র জল ঝলকে ঝলকে বয়ে যাচ্ছে। সীমাহীন জল, কোদাল চালান জমির মত ভাঙা ভাঙা ঢেউয়ের উপর দিয়ে বিদ্যুৎ-বেগে নক্ষত্রের আলো গড়িয়ে যাচ্ছে। এখন মধ্যরাত বলে নিস্তব্ধ আকাশের বুকে কালপুরুষ অসি ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নক্ষত্রপুঞ্জ জুড়ে জুড়ে নারদ ঋষিকেও কল্পনা করা যায়। দেখ, একহাতে উনি বাউলের মত বীণা তুলে ধরেছেন।

নিশ্চয়ই তুমি চিনতে পারছ, এ এক নদী মোহনা। সামনেই সমুদ্র। ভাটায় তুমি সাগরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছ, আবার ফিরে আসছ জোয়ারে। তোমার বিকৃত দেহটা কেমন দুমড়ে মুচড়ে একাকার হয়ে বস্তার মধ্যে পড়ে আছে। তোমার পিঠের জখমি দাগগুলোর মধ্যে সাদা সাদা দুধে দাঁতের মত হাড়ের অংশ কিছু কিছু দেখা যাচ্ছে।

তুমি কি জান, কে তোমাকে লোকালয় থেকে গুম নদীর এই নির্জন স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছে? তুমি কি জান, কতদিন তুমি এইভাবে জলের বিছানায় গড়িয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে কাতর হচ্ছ?

না, জান না। অথচ কি আশ্চর্য বল তোমার ঠোঁটের উপর ঐ যে ছোট্ট রুপোলি মাছটা পরম নিশ্চিন্তে এখন বসে আছে ওকে শুধোও, সব কিছু বলে দেবে ও। তুমি যদি দরবার করো কখনো, মাছটাকেই সাক্ষী মেনো।

বরং আজ থেকে দিন দুয়েক আগে এক সন্ধ্যাবেলা ফিরে যাই চল। তখনো জলের উপর ক্ষীণ আলোর আভা তিরতির করে কাঁপছিল। স্রোত লক্ষ্য করে বিপরীতমুখী ছুটবার চেষ্টা করছিল ঐ মাছ। সূর্যের রঙ তার দেহের উপর দিয়ে বিলি কেটে শিউরে উঠছিল। সামনেই একটা সদ্যজাগা চর দেখা যাচ্ছে। চরের উপর সামান্যভাবে জলের একটা আবরণ। হ্যাঁ, কে না জানে,

এমনি খাঁরা গোপন চরের দিকেই খাদ্য জোটে। রূপোলি মাছ তার খাদ্য অন্বেষণে বেরিয়েছিল তখন। সে দেখল, একটা আলিশান জীব ছুটে ছুটে ভিন্ন দিকে স্রোত লক্ষ্য করে এগিয়ে যাচ্ছে। থমকে দাঁড়াল ও। যেন জলের পরমাণুর সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেল। পরক্ষণেই বুঝতে পারল, জীবটা বহু দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। সে তখন জলের উপর ভেসে উঠে সমস্ত চরাচবটা দেখবার আশায় প্রস্তুত হল। তারপব জল ছেড়ে এক ঝটকায় লাফ দিযে উপরে উঠে আবাব জলের উপব লাফিয়ে পডল। এক পলকে দেখে নিল, পশ্চিম দিকে সূর্যটা বিরাট একটা বৃত্তের মত। দ্যুতিময় ঐ গোলকটাকে লক্ষ্য করে একঝাঁক পাখি উডে যাচ্ছে। পাখিগুলোকে চিনতে পাবল রূপোলি মাছ। ওদের ধাবাল ঠোঁটের কথা কল্পনা করে কেমন যেন আঁৎকে উঠল। ফলে, মুহূর্তেই ও জলের অনেকখানি নিচে তলিয়ে এল।

তখন জলেব স্রোতে এমন কোন বৈচিত্র্য ছিল না। কিন্তু সেই ক্ষুধার্ত মাছ অনুমান করল, যেন সে ক্ষীণ ভিন্ন একটা স্রোতেব শব্দ শুনতে পাচ্ছে। ভয়ে আবাব ওকে থমকে দাঁড়াতে হল। কিসের শব্দ। আবাব কোন হিংস্র জীব কি তেড়ে আসছে। ঠিক মত বুঝতে পাবল না ও। ক্ষুধাব তাডনায যেন ছটফট করে ছুটে বেডাচ্ছে বিশ্বের সবকটি প্রাণী। কে কাকে হাতে পাবে তাই নিয়ে ছোটাছুটি। যে আসছে সে কি ওকে দেখতে পেল। নিস্পন্দ হয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে রইল মাছটি। তারপব এক সময ভুল ভাঙলে দেখল, ছোট্ট একটা জেলে ডিঙি। ডিঙির শব্দটাই স্রোতেব সঙ্গে মিশে গিয়ে অমন ভযাবহভাবে ভেসে আসছিল। শব্দ লক্ষ্য কবে ও এগোতে লাগল।

তুমি তখন ডিঙির উপব মুখ থুবডে পডেছিলে। বিশ্বাস করো তোমাকে তখন অতিকায় একটা মহিষেব মত দেখাচ্ছিল। তোমাব আটপৌরে ধুতিখানা কোমরের কাছে আলগা হয়ে লেগে ছিল। তোমাব গায়ে কোন জামা ছিল না। তোমাব ফ্যাকাসে পায়ের পাতা রোদের আলোয হলুদ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তোমার চোখের তারা কাঠের পাটাতনের সঙ্গে ছুঁয়ে ছিল বলে মুখের কোন ভাষা বোঝা যাচ্ছিল না।

বিশ্বাস করো, তখন কেবল মাছটাই একা সেই রোমাঞ্চকর দৃশ্যটা দেখল। দেখল, কিছুক্ষণের মধ্যেই ডিঙির লোকগুলি তোমাকে একটা বস্তার মধ্যে ভরে ফেলবার চেষ্টা করছে। অথচ অত বড় দেহটাকে ঐটুকু বস্তার মধ্যে কিভাবে

ঢোকাবে ওরা! যেন আলাদিনের দৈত্যটাকে ছোট্ট একটা কৌটায় ঢোকানোর চেষ্টা চলছে।

রূপোলি মাছ এমন সময় শুনতে পেল, কে একজন তোমার গায়ে থুতু ছিটিয়ে দিতে দিতে বলছে, থুঃ, আর কখনো মানুষ হয়ে জন্ম নিস না শুয়ার। আর যেন আমাদের মানুষ খুন করে পাপ করতে না হয়। থুঃ—বলতে বলতে সে তোমার হাঁটুর কাছে আঘাত করে পা দুটোকে ভাঁজ করবার চেষ্টা করল। হ্যাঁ, ভাঙা পা দুটোকে সে উলটিয়ে এনে বুকের কাছে চেপে ধরল। দেহটা তোমার ঐভাবে অনেকখানি ছোট হয়ে এসেছে। তবে, ঘাড়ের উপরও একইভাবে চাপ দিয়ে মাথাটাকে বুকের দিকে ঝুলিয়ে দেবার চেষ্টা করতে হল ওদের। অনেকখানি ঝুঁকে এল মাথাটা। তোমার হাতের আঙুলগুলি শূন্যে উঠে এ সময় হাওয়া আঁকড়ে ঝুলে রইল। এইবার ওরা ধীরে ধীরে দেহটাকে বস্তার মধ্যে ভরে ফেলবে। তোমাকে ওরা তুলে ধরল, হ্যাঁ, ভরে ফেলল চাপ দিয়ে। বস্তার মুখ আঁটো করে বেঁধে দিতে দিতে অন্য একজন বলল, যা শালা, নরকে যা। এবার থেকে আমরাই তোর বিষয় আশয় দেখে বেড়াব।

ঘটনাগুলো এত দ্রুত ঘটে যাচ্ছিল যে, মাছ তার ক্ষুধা তৃষ্ণার কথাও সেই মুহূর্তে ভুলে গিয়েছিল। সে দেখল, লোকগুলি তোমাকে এইখানে ফেলে দিয়ে ঝড়ের বেগে ডিঙি নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। তোমার দেহটা যেন তিমি মাছের মত বিরাট একটা শব্দ করে হাওয়ায় লাফিয়ে জলে পড়েছে। ছোট ছোট অসংখ্য ঢেউ ছুটল তোমাকে কেন্দ্র করে। লোকগুলি পালিয়ে যাচ্ছে দেখে স্বস্তি পেল মাছটা। এইবার ও বস্তার কাছে যেতে পারে। জলের নিচে ডুব দিয়ে তোমার কাছে নিমেষেই এগিয়ে এল মাছটা।

বস্তার কাছে এগিয়ে এসে ও বুঝতে পারল, তোমার দে ব গন্ধটা ওকে সম্মোহন করছে। আশ্চর্য একটা ঝাঁঝালো সুপরিচিত গন্ধ। মৃতদেহের গন্ধ। বস্তার গায়ে ঠোঁট ছুঁইয়ে উত্তেজনা আমেজে প্রখর করে নিচ্ছিল ও। যেন কোন এক গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছে হঠাৎ। এমন গুপ্তধনের জন্য মাথা কুটে মরতে হয়। অথচ আজ অযাচিতভাবেই ওর হাতের মুঠোয় চলে এসেছে।

চারপাশে দ্রুত ভঙ্গিতে একবার ও ঘুরে নিল। ঘুরতে ঘুরতে ও বুঝতে পারছিল ওর মত ক্ষুধার্ত আর একজনও নেই। না, সারাদিনের অনাহারী, এতটুকু খাদ্য পায় নি ও। অথচ এখন কি বিপুল খাদ্য ওর নাগা.-র মধ্যে। ফেলে ছেড়ে খেয়েও কুল পাবে না রূপোলি মাছ।

ও হিসেব কয়ার চেষ্টা করল, একটা পূর্ণদেহ মানুষ, অর্থাৎ তার বুক, উদর, চোখ, উরু না, অগুনতি বছর লাগবে ও দেহটাকে খেয়ে ফুরোতে। উত্তেজনায় ক্রমশই ও অস্থির হযে উঠতে লাগল।

বস্তার ভিতর ঢুকবার জন্য পথ খুঁজল রূপোলি মাছ। মুখের দিকটা অসম্ভব আঁটো ভাবে বাঁধা। না, এখান দিয়ে ভিতরে যাবার আশা নেই। দড়িটাকে ঠোঁট দিযে টানবার চেষ্টা কবল, মনে হল, ঠোঁটের পাতলা চামড়াটাই যেন ছিঁড়ে যাবে। তা হলে। পাগলের মত ছোটাছুটি শুরু করল। নিচে উপবে এপাশে ওপাশে বস্তাব গাযে গা ঘষতে ঘষতে এগোতে লাগল। হঠাৎ দেখল, দড়িব বুনোটেব মধ্যে একটুখানি অংশ কেমন যেন নরম মনে হচ্ছে। ঠোঁট দিযে আঘাত কবল। হ্যাঁ, আবাব ঠুকল পিছিযে এসে। যেন ভিতবে ঢুকবাব দবজায এসে দেখতে পাচ্ছে আগল বন্ধ। মবিযা হয়ে ঠুকতে লাগল দড়িব উপর। তাবপব এক সময সত্যি সত্যি লেজের চাড দিয়ে পিছলে ভিতরে ঢুকে পড়ল সে।

সেই থেকে ও তোমাব দেহটাব তদাবকি কবছে। বিশ্বাস করো, ও তোমার মুখ-গহ্ববেব মধ্যে অনেকখানি ঢুকে গিয়ে আবাব ফিবে এসেছে। ওব ইচ্ছে ছিল তোমাব কণ্ঠনালির বাস্তা দিযে পাকস্থলিটা একবাব দেখে আসে। ও তোমার অক্ষি গোলকের উপব চুম্বন কবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা কবল, হে ভগবান আমাকে অযুত বছব আয়ু দাও। পবমায়ু ভিক্ষা কবতে কবতে সমস্ত দেহ ওব বোমাঞ্চে কেঁপে কেঁপে উঠছিল তখন। এ সময আব কি কি করা উচিত ও ঠিক বুঝতে না পেবে তোমার সর্বাঙ্গে ঘুবে ঘুরে বেডাতে লাগল। দেখল, তোমার পিঠেব দিকে বিরাট কয়েকটা ক্ষতচিহ্ন। তোমার চোখ দুটোব চাহনি ছিল নিতান্তই ভাষাহীন। তোমার ব্রহ্মতালুর উপর কোঁকডানো চুলেব গুচ্ছ দাউ দাউ করে উপব দিকে ভেসে উঠেছে। কিন্তু এতটুকু বক্তের দাগ দেখা যাচ্ছিল না। যেন নদীর জলে তোমাকে ফেলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার সমস্ত শিরা উপশিরা থেকে বঙিন রক্তস্রোত বেরিয়ে জলের সঙ্গে মিশে গেছে। এখন কেবল নোনা জলে পূর্ণ হযেছে শিরাগুলি। একটুখানি চাপ দিলে ফিনকি দিযে বেরিয়ে পড়বে।

তোমার আঙুলে সোনার আংটিটা তখনো জলজল করে জলছিল, হঠাৎই ও দেখল। আংটির পাশ থেকে খুঁটে খুঁটে মাংস ছাড়িয়ে নিতে ইচ্ছে হচ্ছিল ওর। ও নিশ্চিন্ত ছিল, তুমি ওকে বাধা দেবে না। তোমার এখন প্রতিবাদ

কয়ার ক্ষমতা নেই। তোমার উপর এখন থেকে ছোট্ট রূপোলি মাছটাই জারিজুরি খাটিয়ে যাবে। যতকাল ও বেঁচে থাকবে ওর আর খাদ্যের জন্ত হন্তে হয়ে ঘুরে মরতে হবে না। বস্তা দিয়ে তোমার দেহটা ঢাকা বলে অন্ত কেউ আর তোমার দেহের উপর ভাগ বসাতে পারবে না। ও তাই লোভাতুর চোখ মেলে তোমার আংটিটাকে পরখ করছিল। ও বুঝতে পারছিল ওর কোন বাসস্থানের অভাব নেই। তোমারই দেহের একটা গোপন ভাঁজে ও লুকিয়ে থাকতে পারে। ফলে স্বল্পায়ু জীবনের জন্য ওর বড় ক্ষোভ জাগছিল। ও কাকুতি মিনতি করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা শুরু করল, হে ঈশ্বর আমাকে অফুরন্ত আয়ু দাও। আমি অনন্ত-কাল ধরে বেঁচে থেকে ভোগ করতে চাই। ভোগের বাসনায় থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে অনেকক্ষণ ধরে ও তোমার ঠোঁটের উপর গা এলিয়ে বসে রইল। অনেকক্ষণ। তারপর পলে পলে সময় বয়ে গেছে। এর মধ্যে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সন্ধিক্ষণও পেরিয়ে গেছে। এখন এই মধ্যরাতে দিগন্তহীন বিরাট একটা তারকাখচিত গোলকের নাভিবিন্দুতে তুমি শুয়ে আছে। নিশ্চয়ই তুমি চিনতে পারছ, এ সেই নদী-মোহনা, যেখানে অফুরন্ত পলি ঢেলে ঢেলে নতুন একটা ব-দ্বীপ গঠনের চেষ্টা করছে নদী।

হ্যাঁ, নদীর স্রোতে ভাসতে ভাসতেই তুমি এই চরের উপর আটকে গেছ। তোমার দেহটা এখন নরম পলির উপর বিছানো। অথচ তোমার দেহের উপর দিয়ে ক্ষীণ ধারায় স্রোত বয়ে যাচ্ছে। ঢেউ তোমাকে একটু একটু করে আরো কিছু ঠেলে তুলবার চেষ্টা করছে।

আর ধীরে ধীরে তোমার দেহটাও এখন অস্বাভাবিকভাবে ফুলে গলিত হবার চেষ্টা করছে। তোমার চোখের মণি দুটো কোটর থেকে বেরিয়ে এসেছে। যে কোন সময়ই ফিনকি দিয়ে ভিতরের নির্যাসটুকু পিছলে বেরিয়ে পড়বে। তোমার উরুর কাছে গাছের বাকলের মত চামড়া ঝুলে রয়েছে এখনো। তোমার পিঠের দিকে বল্লমের চেরা অংশে দুধে দাঁতের মত যে হাড়ের টুকরোগুলি দেখা যাচ্ছিল তা আবার ফুলে ওঠা মাংসের চাপে ঢাকা পড়ে গেছে। তোমার চোয়ালের মাংস যে কোন সময় কাদার তালের মত খসে পড়তে পারে। অথচ এর জন্ত এতটুকু তে.ার দুঃখ নেই। মৃত্যুর পর

দেহের প্রতিটি অংশ প্রকৃতিতেই মিশে যায়, তুমি জলের সঙ্গে মিশে যেতে চাইছ।

কিন্তু তুমি কি জান, যেভাবেই থাক তুমি, মাছটা তোমাকে চোখ-ছাড়া করবে না। ঐ দেখ, ও তোমার চোখের ডিম দুটো নিয়ে খেলা করতে চায়। চোখেব উপর থেকে গলিত পর্দার ভাঁজটা ও খুলে সবিয়ে দিতে চায়। দেখছ না, লোভাতুব দৃষ্টি নিয়ে মাছটা কেমন তোমার দিকে এগিয়ে আসছে।

হ্যা, হালকাভাবে ও তোমার চোখেব মণিতে আঘাত করল। ও জানে তুমি ওকে বারণ কববে না এখন। তোমার যদি হঠাৎ এখন বোধশক্তি জেগে যায়, তুমি ওকে আঘাত কবতে বারণ করতে। না, কোন বারণই ও শুনত না। ও তোমাকে বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য কবে না আব। ও তোমাকে বাববাব আঘাত কববে। আঘাত কবে ও দেখতে চাইবে কতখানি অসহায় তুমি। নিশ্চিত জেনো, এই দেখায় রূপোলি মাছ তৃপ্তি পাবে। ও বলবে, ভোগেব জন্য তোমাকে আমি দখল কবেছি, তোমাকে আমি ভোগ কবব সয়ে সয়ে। ভাগ্য থেকে এ অধিকার আমি পেয়ে গেছি।

এ সময সমুদ্রেব জলে গোপন স্রোতেব টান বাড়ছিল। বোঝা গেল জোযাব এখনো বয়ে চলেছে। জোযাবে তোমাব দেহটা এখন আবো একটু উপব দিকে উঠে আসবাব চেষ্টা করছে। এখনো তোমাব চুলের ডগা ছুঁয়ে ছুঁযে জল ছুটছে। জলের টান বেশি থাকলে হয়ত তুমি সত্যি সত্যি আবো একটু উঠে আসতে পারতে। ভাটায আবার জল নেমে গেলে কে বলতে পাবে আবার তুমি নিচেব দিকে নেমে আসবে কি না।

তা তুমি যেখানেই যাও, যেখানেই থাক, ছোট্ট মাছটা তোমাকে আগলে আগলে থাকবে। দেখছ না কেমন তোমার বুকের উপর গা ঘষে ঘষে নাভির দিকে এগোচ্ছে ও। আর একটু এগোলেই ও তোমার কোমরে জড়ান তাগা আর মাদুলিটাকে দেখে ফেলবে। তোমার কাপড়টা এখন পাযের সঙ্গে জড়িয়ে কোমর থেকে সরে গেছে বলে সত্যি সত্যি মাদুলিটা ওর নজরে পড়ছে।

কিন্তু প্রথমটায় ও বস্তুটাকে বুঝতে পারল না। ফলে, ও তোমার চোখের কাছে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল, ওহে কি ওটা?

না, তুমি কোন উত্তব কবলে না দেখে মাছটা বড বিরক্ত হল। তোমার

কোন উত্তর দেবার ক্ষমতা নেই জেনেও যেন আকস্মিক কিছু ঘটার আশায় ও প্রশ্ন করেছিল। ওহে, বলবে না আমাকে, কি ঝুলছে ওখানে?

তোমাব চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে ও ধরে নিয়েছিল সত্যি সত্যি তুমি উত্তর করবে। চোখের কাছ থেকে ও সরে যেতে চাইছিল না তাই।

তোমার দেহটা এখন একটুও নড়ছিল না। স্থির পাথরের মত পড়ে আছে। জোয়ারের এখন শেষ ধাপ। এরপর ভাঁটা আসবে, জল নামবে। জল যদি পুরোটাই নেমে যায়, কি হবে তখন! কিন্তু রূপোলি মাছের গ্রাহ্য নেই। সারা চোখে কৌতুক খেলছে ওর। তোমাকে তাই আবার প্রশ্ন করল, ওহে, বলবে না, ওটা কি বস্তু?

এমন সময় সত্যি সত্যি তুমি কিছু বলতে চাইছিলে। রূপোলি মাছ তাই আগ্রহ নিয়ে আবার তোমাকে প্রশ্ন করল, কি? কি বলছ?

মাদুলিটা তোমার দেহের অঙ্গ। ওটা যেন কেউ এসে ছিনিয়ে না নেয়। এই কথাই বলবার চেষ্টা করছিলে তুমি।

কেন; কি হয় ওতে? মাছ তোমাকে প্রশ্ন করল।

তুমি বললে, জন্ম হওয়াব পর থেকেই ওটা তোমাব কোমরে রয়েছে। ওতে তোমাব মঙ্গল হবে বলে তোমাকে ওটা পরানো হয়েছিল। (মাদুলির গুণে তোমার যত আপদবালাই দূরে থাকবে।)

তোমাব কথা শুনে মাছেব হাসি পাচ্ছিল। বোধহয় করুণাও হচ্ছিল। কারণ ও নিজের চোখেই দেখেছে শত্রুদের। ও দেখেছে কেমন হিংস্রভাবে তোমাকে বস্তায় ভরে নদীর জলে ওরা ফেলে দিয়ে গেছে।

শত্রুরাও বড একটা শান্তিতে নেই। স্পষ্ট গলায় তুমি বললে। [illegible] থেকেও মৃত্যু ভয়ে ওরা মরে যাচ্ছে এখন। জানো, ওরা সবাই অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। এটা এই মাদুলিরই গুণ।

তা হোক, তুমিও তো আব রেহাই পেলে না। মাছ তোমাকে পালটা কথায় ঘায়েল করল।

না, পাই নি ঠিকই। কেউই পায় না পৃথিবীতে।

মিথ্যে কথা আমি পেয়েছি। দন্ত নিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে রূপোলি মাছ বলল। আমার এখন ভয় নেই, ভাবনা নেই। ভাবনা যদি থাকে, কেমন করে তোমাকে ভোগ করব সেইটাই ভাবনা আমার।

ভাবনা থেকেই ভয় জন্মায়। ভয় থেকে মৃত্যু। তার চেয়ে বরং এখান

থেকে পালিয়ে গিয়ে প্রাণে বাঁচবার চেষ্টা কর রূপোলি মাছ। তুমি ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলে।

পাগল নাকি! আমি যদি লক্ষ বছর আয়ু পেতাম, দেখতে পেতে, তোমাকেই আগলে আছি আমি।

তুমি ভুল করছ রূপোলি মাছ। অমনি ভুল আমিও করেছিলাম।

তাই বলে তোমাকে আমি ছাড়তে পারি না আর। না, কক্ষনো না। ভাল মন্দ জ্ঞান আমি হারিয়ে ফেলি নি এখনো। বলতে বলতে মাছটা তোমার পেটের দিকে আবার নেমে এল। তোমার মাদুলিটাকে আলতোভাবে ঠোঁট দিয়ে ছুঁয়ে দেখল। মাদুলিটা বড় ঠাণ্ডা হে। সারা গায়ে ওর রোমাঞ্চ ধরল।

ওর মনে হল, তুমি শুধু সংস্কারের মধ্যেই ডুবে আছ। তোমার ধারণা মাদুলিটা হারিয়ে গেলে তোমার আর গতি নেই। বেশ আছো। এ ব্যাপারে তোমাকে কেউ এতটুকু আঘাত দেবে না। না, মাদুলি থেকে বেশ খানিকটা তফাতে সরে এল রূপোলি মাছ।

রাত ক্রমশ ফিকে হয়ে আসছে। প্রতিদিন এমনি সময় নদীর জলে সাঁতার কাটতে কাটতে ও সূর্যোদয় দেখে বেড়াত। আজ আর দেখবার কোন উপায় নেই। বন্যার আবরণ ভেদ করে সূর্যের আলো কি এত দূর আসতে পারবে!

পারবে না। তুমি ওকে সূর্যোদয় দেখে আসতে উপদেশ দিলে। বললে. এখনো বলছি সময় আছে, যাও, সূর্যের আলো দেখে এস।

কিন্তু ও ভাঙা আলস্যে তোমার বুকের ওপর এলিয়ে পড়ল। এইখানেই শুয়ে বসে যতটুকু আলো পাবে তাইতেই যেন যথেষ্ট ওর। ঐ দেখ, ও বলছে, তোমার বুকে শুয়ে থেকে যতটুকু দেখতে পাব, তাইতেই আমার চলে যাবে। তোমাকে ছাড়া আর আমার লোভ নেই।

তুমি তা হলে সত্যি সত্যি সর্বনাশে ডুবে যাচ্ছ।

সর্বনাশ কেন! আমার ধারণা অন্যরকম। কতদিন আর বাঁচব বল, ভোগের বস্তু ফেলে দেব এমন মূর্খ হয়ে লাভ নেই।

ভোগ শুধু সম্পদ আগলে বসে থাকা নয়। সর্বহারাও ভোগ করে। সেই ভোগে তৃপ্তি থাকে।

মাছ বলল, ওটা তোমার সান্ত্বনা। তুমি আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে ভোলাতে চাইছ। বলতে বলতে ও তোমার চোখের দিকে এগিয়ে এসে দেখতে পেল, টুপ করে তোমার চোখের মণি খসে পড়েছে। খসে তোমার কপালের কাছে

ভেসে উঠল। আহা এর জন্য এতটুকু দুঃখ পেল না মাছ। বরং ও দেখল নদীতে এখন ধীরে ধীরে ভাঁটা শুরু হয়েছে। ভাঁটায় জল তিরতির করে নেমে যাচ্ছে। তোমার মাথায় দাউদাউ করা চুলের গোছা জলের অভাবে কপালের উপর বিছিয়ে পড়েছে। আর সেই কপালের উপর দুটো চারটে আলোর ফোঁটা চন্দনের মত লেগে আছে।

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ, সূর্য উঠেছে এখন। মাছ বলল। এখানে বসেও সূর্যের চেহারা আমি দেখতে পাচ্ছি। জানো, সূর্যের তাপ আমি অনুভব করতে পারছি।

সত্যি সত্যি সূর্যের কয়েকটা ঝিমানো রশ্মি জল ভেদ করে ভিতরে এসে কাঁপছিল। বস্তার ফাঁক দিয়ে কয়েকটা আলোর ফোঁটা দেখা যাচ্ছিল। সূর্যোদয় দেখতে হলে সূর্যের কাছে যেতে হয় না। মাছ বলল, এইভাবেই আমি এখান থেকে কল্পনায় আজীবন সূর্যোদয় দেখব।

তুমি কোন উত্তর করলে না আর। তুমি এখন নিস্তব্ধ পাথরের মত পড়ে আছ। তোমার এখন সামর্থ নেই ঘাড় উঁচু করে আলোর ফোঁটাগুলি দেখে নাও। তোমার চোখের মণিখানা খসে যাওয়ায় কোটরের দিকে তাকালে তোমাকে কেমন অমানুষ বলে মনে হচ্ছে এখন।

জলের সীমারেখা পলে পলে নেমে যাচ্ছে। তোমার দেহের খানিকটা অংশ জলের উপর বস্তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এইভাবে জলরেখা নামতে নামতে শেষ পর্যন্ত যদি পুরো দেহটাই তোমার চরের উপর ভেসে ওঠে তুমি হয়ত খুশি হবে। কিন্তু রূপোলি মাছ!

না, বিন্দুমাত্র ভয় নেই ওর। দেখছ না, এখনো কেমন ... নিয়ে ও তোমার চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জানো, তোমার জন্য নাকি দুঃখ হয় ওর। তুমি তোমার সারা দেহ ওর কাছে সঁপে দিয়েছ, এইটুকুই নাকি সান্ত্বনা ওর। তুমি তোমার দেহ দিয়ে এই যে ওর সেবা করবে এই জন্য নাকি তুমি ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাবে। ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।

তুমি কোন উত্তর দিলে না। তুমি লক্ষ্য করছিলে জলের দিকে। নিঃশব্দে জল নেমে যাচ্ছে দেখে তুমি খানিক আশান্বিত হচ্ছিলে এখন।

ঐ দেখ রূপোলি মাছটা, কি পরিমাণ জল নেমে যাচ্ছে দেখবার জন্য উপরের দিকে ভেসে উঠেছে। ভারি ভিজে বস্তাটায় আঘাত খেয়ে আবার ও নিচে তোমার পিঠের দিকে নেমে এল। ভাঁটার শুরুতেই ভর

হুহু করে জল নেমে যাচ্ছে। সমুদ্র যেন বিরাট একটা শঙ্খের মত আকার নিয়ে সমস্ত জল তার গহ্বরে শুষে নিচ্ছে।

তুমি তবু সাবধান করে দিয়ে বললে, এটা একটা মধ্য চরা, সব জল নেমে যাবে এক সময়। তাই বলি, সময় থাকতেই পালিয়ে যাও।

থামো দেখি, আমি পাপ পুণ্য বিশ্বাস করি। আমি কোন পাপ করি নি যে সমস্ত জল শুষে যাবে। মাছ বলল নিচু গলায়। তাছাড়া ভেবে দেখ, বাইরে গেলেও কি স্বস্তি পাব। তুমি তো জান, এক কণা খাদ্য জোগাড় করা কতখানি কঠিন কাজ।

তবু বলি পালিয়ে যাও। মৃত্যুর সঙ্গে যুঝে যদি বাঁচতে পার সে বাঁচায় আনন্দ আছে।

এই বলে তুমি আমাকে ভোলাতে চাও। তোমার চাতুরি আমি জানি, তুমি আমাকে ফাঁকি দিতে চাও।

না, শুধু সাবধান করে দিতে চাই তোমাকে।

রূপোলি মাছ হেসে উঠল, প্রকৃতির নিয়ম জানো? কেউ কেউ ভোগ করে, কেউ কেউ ভুক্ত হয়। আর প্রকৃতির নিয়ম মানাই পুণ্যের কাজ। ফলে, যতই বল, আমি আর কোথাও যাব না। তোমাকে ঘিরেই বেঁচে থাকব, মরতে হয় তোমাকে ঘিরেই মরে যাব।

জল অস্বাভাবিক গতিতে নেমে যাচ্ছে লক্ষ্য করছিলে তুমি। এইটাই তুমি চাইছিলে। নেমে যাক, সমস্ত জল শুষে নিক সমুদ্র। সূর্যের খরতাপে ধীরে ধীরে গলতে গলতে তুমি মাটির সঙ্গে মিশে যাও এমনি ধারাই ইচ্ছে ছিল তোমার। যেভাবেই হোক মাছের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার আকাঙ্খা হচ্ছিল তোমার।

এমন সময় তুমি লক্ষ্য করলে রূপোলি মাছ বস্তার গায় ঠোঁট ঘষে বেরুবার রাস্তাটা খুঁজে দেখছে। কোন ছিদ্র দিয়ে ঢুকেছিল ও! নাহ্, ঠিক মত চিনতে পারছে না এখন। হারিয়ে গেছে। তুমি এখন নির্বাক হয়ে দেখছ সব।

বাইরে কেমন গনগন করে সূর্য উঠেছে। আলোর কণা জুটো একটা রেখার আকারে রূপোলি মাছের দেহ ছুঁয়ে যাচ্ছে। তোমার চিবুকের উপর আলোর বিন্দু স্থির হয়ে অপেক্ষা করছে।

তোমার মুখগহ্বর থেকে গলিত কষ বেরিয়ে আসছে দেখতে পেল রূপোলি মাছ। তোমার পিঠের দিকে ক্ষতের উপর মহিষের মুখের মত ফেনার পুঞ্জ

জমে উঠছে এখন। তোমার পায়ের দিকে এখনো কিছু কাদা জল অবশিষ্ট আছে সেই জলে আশ্রয় নিয়েছে রূপোলি মাছ। তুমি শুনতে পাচ্ছ, উত্তেজনায় কেমন অসংলগ্ন কথা বলছে মাছটা। কেমন করে ও বাইরে বেরুবে!

তুমি ওর কোন কথাই আর সঠিক ভাবে ধরতে পারছ না। অথচ ও এমন ভাব করছে যেন জল শুকিয়ে যাচ্ছে বলে ওর দুঃখ নেই। দুঃখ ওর তোমার জন্য। ও দেখতে পাচ্ছে বিচিত্র বহুমুখী ধারায় তোমার দেহ থেকে গলিত কষ বেরিয়ে এসে মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। এইভাবে তিলে তিলে তুমি মাটির সঙ্গেই মিশে যাবে।

অবশেষে মৃত্যুশয্যায় রূপোলি মাছটা করুণভাবে বলল, জলের জন্য দুঃখ না, আমি যে হাতে পেয়েও ভোগ করতে পারি নি তোমাকে।

নদীর [illegible] প্রচণ্ড তাপ ছড়িয়ে সূর্য উঠল। ছোট্ট নতুন-জাগা চরের চতুর্দিকে জল। জলের ঢেউয়ে সূর্যের আলো ভেঙে যাচ্ছে গুঁড়ো হয়ে। গড়িয়ে যাচ্ছে। গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। চরের মাটিতে গাছপাতা গুল্মলতা কিচ্ছু নেই। কেবল মাটি, নরম নির্ভাজ মাটি। সেই মাটির উপর প্রাণশক্তি বিছিয়ে দেবার জন্য দেহ দুটি নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে আছে। একটি সেই মৃতদেহ, যে এক অজ্ঞাত কারণে লোকালয় থেকে গুম হয়ে গিয়েছিল অন্যটি সেই রূপোলি রঙের ছোট্ট সুন্দর মাছ, যার ধবধবে সাদা আঁশ দেখে অনায়াসেই বোঝা যায় সে বড় সুখী, সাধ্বী প্রাণী হতে চেয়েছিল। দুজনের দেহ এখন গলে নরম মাটিতে প্রথম জৈব সার বিছিয়ে দেবে। এ মাটিতে যদি কখনো ছোট্ট সুন্দর ফুল ফোটে কেউ কি তা চিনতে পারবে, কেমন করে এই ফুল জন্ম নিল এখানে, কে পুঁতেছিল এ ফুলের প্রথম বীজ। কারা দিয়েছিল প্রথম সার।

গোলোকধাম

বারোয়ারীতলার চাতালে এসে ফুটকুরি কাটল রসসিন্ধু, ও বিনোদী, মাথায় দে'লো ঘোমটা।—খানিকটা নাচের ভঙ্গিমায় ও দাঁড়াল এসে। দুই হাতে তাসের পাত্তির মত চটি চটি বই—লায়লা মজনু, বিষের তীর, খনার বচন, অমুক তমুক তন্ত্রসার; সারা বুকে লকেটের মত এক আনা সাইজ চিত্রতারকার ছবি ঝুলছে। পিঠ বেয়ে নেমে এসেছে বেহুলার ভেলা, ভারতমাতা, যম নরকের চিত্রপট, আরো কত কি! এক কথায় রসসিন্ধুর ফুটকুরি শুনে যে একবার ওর দিকে নয়ন পেতেছে, সেই মজেছে। সেই বলবে, বাব্‌বা, গোটা একখানা সংসার বয়ে নিয়ে চলেছে, রসসিন্ধু! কেমন, রোজগার পাতি ভালো তো! না কি বৃথাই শুধু বয়ে বেড়ানো।

রসসিন্ধু একগাল হেসে উত্তর দিলে, মন্দ না, চলে যাচ্ছে একরকম।

সেই রসসিন্ধুর পায়ে ধূসর কেডস জোড়ার একটু উপরে একজোড়া ঘুঙুর বাঁধা। কায়দা আছে। হাঁটতে চলতে ঝুমুর ঝুমুর তাল ঠোকে। মাথায় একখানা ঝালর লাগান টুপি, টুপির ডগায় হালকা কিছু রঙ বেরঙের পালক। কপালের নিচে রোদে পোড়া তামাটে ভুরু। কালো ফ্রেমের চশমা। গোঁফ জোড়ার বাহার কত, মোম ঘষে ডগা দুটো ছুঁচলো করা। দাড়ির কোন বালাই না থাকলেও বাবরি জুল্‌পি পরিপাট করা, যেন নতুন-কেনা বইয়ের মতই ছাপা বাঁধাই চমৎকার। আর গায়ে একটা ডোরাকাটা ফতুয়া, পরনে কালো ছাতির কাপড়ের প্যাণ্টালুন। যেই দেখে সেই হাঁ হয়ে থাকবে। সেই বলবে, তোমার ঐ চশমাটায় কি কাচ নেই নাকি হে? কিংবা, বেড়ে সাজগোজ হয়েছে রসসিন্ধু, একদম যেন কলকি অবতার হয়েছ আজ।

এ সব কথায় বড় একটা কান দেয় না ও। বরং স্বাভাবিকভাবেই ও ফুটকুরি কেটে মস্করা করে, ও বিনোদী মাথায় দে'লো ঘোমটা—আর তাইতেই ওর কাজ হয়, তাইতেই ওর খদ্দের জোটে।

সেই রসসিন্ধু সারাদিন টো টো করে শেষ পর্যন্ত বিকেলের আলোয় এই

দিকেই বেরিয়েছিল। বারোয়ারীতলার চাতালে এসে ফুটকুরি কেটে গণেশ গোছের হাসল।

তখন বিলাসবাবুরা ওখানে বসে পাশা খেলছিলেন। ফুটকুরি শুনে ওর দিকে তাকালেন, এই যে রাজপুত্তুর, তোমাকেই খুঁজছিলাম।

বলুন, আঁজ্ঞে! রসসিন্ধুও বিগলিত হল। ভারতমাতা নেবেন, না গান্ধী মহারাজ? বলতে বলতে ও ভারতবর্ষের মানচিত্রের উপর ত্রিবর্ণ পতাকা হাতে ভারতমাতার ছবিখানা ঝোলা থেকে বার করে চোখের সামনে মেলে ধরে।

বিলাসবাবু বললেন, একখানা ধারাপাত বার করো তো দেখি বাবা, বউমা আমার মাথা খেয়ে ফেলছে।

আঁজ্ঞে, শুধু একখানা ধারাপাত! ছবিটবি নেবেন না? এই দেখুন না বিবেকানন্দের বিশ্বজয়, ক্ষুদিরামের ফাঁসি, মকরবাহিনী গঙ্গা—দেখুন দেখুন, নয়ন ভরে দেখুন, আঁজ্ঞে দামেও সস্তা। না হয় যমপুরীই নিন; যমপুরী সম্পর্কেও বুঝিয়ে বলতে শুরু করে, এই ধরাধামে পাপী-তাপীকে যমরাজার বিচারে কেমন ধারা শাস্তি পেতে হচ্ছে দেখুন।

এ্যাঁ, ও ছবি দেখলে যে গা গুলোয় রসসিন্ধু, তার চে বরং ধারাপাতখানা দিয়েই আজ রেহাই দাও। আর একদিন না হয় ছবি টবি কেনা যাবে।

রসসিন্ধু যমপুরী গোটাতে গোটাতে ডান পা স্থির রেখে নাচের বোলের মত বাঁ পা দিয়ে ঘুঙুর বাজায়। তা হলে আঁজ্ঞে এই ছবিখানা দেখুন আজ।

বিলাসবাবু দেখলেন; দেখলেন পালতোলা নৌকো, নদী নারকেল গাছ আর কুঁড়েঘর বসানো একখানা সিনারী। তার মধ্যে কটকটে ন রঙের সূর্য উঠছে, আকাশে কালো কালো কয়েকটা পাখী উড়ছে। নদীর ওপারে জঙ্গল। বললেন, ওসব ধুয়ে কি জল খাব নাকি হে! তোমারও যেমন কাণ্ড!

ওদিকে পাশার চালে ইতি পড়েছে দেখে বিলাসবাবুর শ্যালক খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেঁকে উঠলেন, অন্য সময় আসতে পারিস না, যা যা কেটে পড় এখন।

সঙ্গে সঙ্গে নিধু চক্রবর্তীও সায় দিলেন, বউঝিদের কাছে যা না, রথ দেখা কলা বেচা দুইই করবি। এখানে এই বারোয়ারীতলায় কেন?

অগত্যা ছ'আনা পয়সা বাকি রেখে ধারাপাতখানা বিলাসবাবুর হাতে তুলে দিয়ে রসসিন্ধু আবার ফুটকুরি কাটতে কাটতে বিদায় নেয়, হুনের ভাঁড়, তেলের

ভাঁড়, তাকে কি বলি ভাঁড়। ভাঁড়ের মত ভাঁড় এসেছে রসসিন্ধু ভাঁড়। রূপের বাহার। খানিকক্ষণ পরই আবার শোনা যায় রসসিন্ধু ফিরিস্তি গাইছে

গোপাল ভাঁড়ের রহস্য পাবেন—গোপনীয় প্রেমপত্র।
আরো পাবেন চীনা ডাকাত, আরো কিছু পুঁথিপত্র।
বশীকরণ তন্ত্র পাবেন, কৃত্তিবাসের রামায়ণ
আরো পাবেন চটকদারী বাৎসায়নের কামায়ণ।
মা লক্ষীর ব্রতকথা, কাক চরিত্র, ক্ষুদিরাম
সবার সেরা পাবেন দাদা জন্ম মৃত্যু গোলোকধাম॥

গোলোকধাম চার আনা, বাজারে কিনলে আটআনা। কমিশন দেয় রসসিন্ধু সস্তাকে সস্তা, টাটকাকে টাটকা। অর্থাৎ যেমন চাই তেমন পাই। অথচ ঐ পরিমাণ কমিশন গুণে, শত্রুর মুখে ছাই গুঁজে রসসিন্ধু দিব্যি তার সংসার চালায়। নেহাত তেমন ফেঁপে ফুলে বড় গোছের সংসার নয় বলেই চলে যায়। এক পরিবার এক কন্যা। কন্যার কান ফুটো করা হয়েছে সবে। পরিবারের নাকছাবিও গত সন পুজোর শেষে কিনতে পেরেছে রসসিন্ধু। এ সব ওর কপাল কুষ্ঠিরই ফল। লোকে বলে, কপাল কুষ্ঠি বলতে হয় বলেই বলা। আসলে এসব মুখবাজী। মুখেন মারিতং জগৎ। মুখ যার নেই সে মূর্খ। রসসিন্ধু মুখ্যু নয়, তা হলে ঐ করে পেটের অন্ন জোগাড় করতে অক্ষম হত ও।

অন্য দিক দিয়ে জিনিসটাকে বিচার করে ও। বলে, এই যে আছে গোলোকধাম, এর দিকে তাকান। বাহান্নঘর; আঁতুড় ঘর থেকে শুরু করে স্বর্গারোহণ অবধি এই যে দীর্ঘ পথ এর মাঝে আছে কাঞ্চি, কোশল, কুরুক্ষেত্র, আছে যমদুয়ার, জটিলা কুটিলার চোখ। অথচ কড়ি চেলে চেলেই এর উপর দিয়ে এগোতে হয়। পাঁচ কড়ি চিত না হলে আঁতুড় ঘরে ঘুঁটি বসবে না। অর্থাৎ জন্ম হওয়ার পর থেকেই শুরু হল কড়িচালা। তিন কড়ি চিত হলে বৃন্দাবন, আবার এক কড়িতেই নেমে আসবে—। চোখ বুজে হাতের মুঠোয় ফুঁ দিয়ে কপালে তিনবার ঠুকে নিয়ে কড়ি চেলে দিতে হবে। দিয়ে কপালের উপর হাত রেখেই দেখতে হবে, তিন না এক! তা হলেই বলুন, কপাল নয়ত কি? আসলে কপাল জোরেই সবাই টিকে থাকে, এইভাবেই ও টিকে আছে। ছড়া আউড়ে ও বলে, কপালে নেই ঘি, ঠক ঠকালে হবে কি? যদি থাকে, আপসে পাব।

কপাল জোরেই ও কিছু কিছু খদ্দের পেয়েছে। বাঁধা খদ্দের। জাঙ্গল কাশির বুড়োকর্তা, গিন্নীমা, শ্যামকুণ্ডের বিলাসবাবু, উত্তরপাড়ার বউদিরানী

এমনি ধায়া আরো অনেকেই। এরাই ওর মনের জোর। এরাই ওর কপাল কুষ্টি। খদ্দের আছে, সওদা আছে, ওর কাজ হল গা গতর খাটিয়ে, মিষ্টি রসাল গোছের বাক্য বলে যোগাযোগ ঘটানো। ও কেবল যোগাযোগ ঘটায়, যোগাযোগের জন্য ওকে সারাদিন ভাঁড় সেজে বন বন করে ঘুরপাক খেতে হয়, ও ঘুরপাক খায়, খাটে।

আর গান্ধী মহারাজের কথাও মনে মনে স্মরণ করে, আরাম হারাম হায়। ফলে, কখন কখন মেলা বসে, কোথায় কোথায় কোন তিথিতে হাট, বেবাক খবর ওর নখের ডগায়। এখন ভাদ্রমাসের শেষ বর্ষণের সময়। ওর কাছে মরা মাস। হাট বসলেও জলে ভেজা মাছ আর পুঁই কুমড়ো কিংবা কাদামাটিরই সওদা। প্যাচপ্যাচে পথঘাট। ভয়ে ভয়ে বেরুতে হয় ওকে। শুকনো খটখটে আকাশ দেখতে দেখতে কখন যে আবার মলিন থমথমে হয়ে উঠবে বলা চলে না। এক কথায় কেনা বেচাব মরসুম নয় এখন। হোত চোত বোশেখ মুড়ি মুড়কির মত পাঁজি বিকোত। কিংবা পুজোর মরসুম, যে কোন মণ্ডপে বই ছড়িয়ে বসে পড়লেহ হল।

দিন কয়েক ধরে আকাশখানা ঝকঝকে কাক চক্ষুর মত পরিষ্কার চলেছে। টনটনে রোদ ; আশ্বিনের কাশফুলের আমেজ বাতাসে, বিকেলের আলোয় ডালে ডালে অঙ্কুরের চেহারা মনে কবিয়ে দেয়, আসছে, আশ্বিন আসছে। এমন ঝরঝরে দিনে অনায়াসেই বেরুতে পাবে রসসিন্ধু। আজ তাই সাজগোজ করে বেরিয়ে পড়েছে।

পায়ের তালে ঘুঙুর বাজছে। কাচহীন চশমার ফ্রেমে চোখের মণি বন বন করে কাচের গুলির মত ঘুরপাক খাচ্ছে। টুপির ডগায় বাত লেগে ফুরফুর করে পালক উড়ছে।

রসসিন্ধু বারোয়ারীতলার চাতাল ছেড়ে জারুলকাশির পথে রওনা হল। জারুলকাশির বুড়ো কর্তা রসের লোক। কথায় আছে, রসিকের ঘরে ফাটে রসের বেলুন। রসসিন্ধু হাজির হলে তো কথাই নেই। সেই বাড়িতেই আর এক রসিক গিন্নীমা। গিন্নীমার সঙ্গে প্রথম দিনকার আলাপ ওর মনে পড়ল। বুড়ো কর্তা বাড়ি ছিলেন না, রসসিন্ধু বিরস হয়ে ফিরে যাচ্ছিল, গিন্নীমা জানালায় মুখ গলিয়ে হাঁকলেন, ওহে রসসিন্ধু, তোমার কাছে মোহন বাঁশি আছে ?

ফিরে দাঁড়াল রসসিন্ধু। আজ্ঞে, কিসের বাঁশি ? প্রথমটায় ঠিক বুঝতে পারে নি ও, আসলে ওটা পট না বই।

মোহন বাঁশি গো। সেই যে ছোটবাবু বাঁশি বাজাতেন, আর সেই বাঁশির তানে কুলমান জলাঞ্জলি দিল ঠাকুরঝি।

রসসিন্ধু বুঝল, ও নামের কোন বই আছে। বলল, না মা ঠাকুরুণ, ও জিনিস নেই। তবে ছেছুমোল্লার কেচ্ছা আছে, সেটাও ঠিক ওরকমই। তা ছাড়া বিশে ডাকাত, রেলে খুন, সতীলক্ষ্মী···গরগর করে অনেকগুলি বইয়ের নাম ও করে ফেলল।

তা হলে ছাই আছে। ঠোঁট ভাঁজ করে গিন্নীমা অদ্ভুতভাবে হাসলেন।

রসসিন্ধুও দমবার পাত্র নয়। বলল, তা হলে এই গোপন প্রেমপত্রখানাই দেখুন আজ। কিংবা এখানা, এই সচিত্র কোকশাস্ত্রখানা।

মোহন বাঁশিই নেই, ওসব নিয়ে কি করব। গিন্নীমা জানালা থেকে সরে যাবাব চেষ্টা করছিলেন, রসসিন্ধু কয়েক পা এগিয়ে এল। ছবিই নিন না একখানা, এই দেখুন লক্ষ্মীনারায়ণ, দশভুজা দুর্গা, রাবণের সীতাহরণ···চকচকে রঙিন কিছু দেবদেবীর ছবি দেখাল ও। কিন্তু গিন্নীমার ভাব দেখে বুঝতে পারছিল, পছন্দ হচ্ছে না কিছুই। বলল, না হয় একখানা গোলোকধামই নিন। দামেও খুব সস্তা। বলতে বলতে গোলোকধামের ছক মেলে ধরে রসসিন্ধু।

দাম কত ?

কত আর, আপনার কাছে কি আর বেশি নিতে পারি চার আনাই দেবেন। বাজাবে কিনলে আটআনা। আব খেলবার কড়ি এমনিই দেব। নিন মা, বড় মুখ করে এসেছি এখানে। বাদলার দিনে ঘরে বসে খেলবেন।

অনেক কষ্টে গোলোকধামখানা গছিয়ে দিয়েছিল রসসিন্ধু। তারপর থেকে হামেশাই ও ওপথ দিয়ে ঘুরে আসে। গিন্নীমা আছেন, বুড়ো কর্তা আছেন, এক বাড়িতেই দু দুজন খদ্দের। বাঁধা খদ্দের।

রসসিন্ধু কুটকুরি কাটতে কাটতে এগোতে লাগল, ও বিনোদী মাথায় দে'লো ঘোমটা। বেছে বেছে আনলি জামাই, চিরদিন যে নেংটা। তাতা তাতা তাতই তাতা· ·ইত্যাদি।

নিস্তেজ সূর্যের আলোয় ঘুঙুর বাজছে ঝুমঝুম করে। ফাঁকা পথ। কাক-পক্ষীও চোখে পড়ছে না। মনে হল, বৃথাই ওর ছড়াকাটা। গলার স্বরও নামিয়ে আনল। গুন গুন করে ভাঁজতে লাগল ছড়াটা।

যেতে যেতে আরো দুচার ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেল ও। একজন হল ছোট

সাধু খাঁ। পুজোয় প্যাণ্ডেল মাতিয়ে দিয়ে যাত্রা গায়। সে বলল, হ্যাঁ হে যমরাজ, যমরাজ অর্থাৎ রসসিন্ধু, ভাল দেখে একখানা পালা এবার আনিয়ে দাও না, আসর জমাই।

. রসসিন্ধু শুধাল, পৌরাণিক না সামাজিক? চাষার মেয়ে চলবে? নয়তো বউ চোর, নয়তো শাজাহান টাজাহান?

ধুত্ ছাই, ওসব বস্তা পচা পুরনো মাল নয়, টাটকা গোছের আনো কিছু। কলকাতার অপেরাকেও হার মানাতে হবে এবার। বলতে বলতে খানিকক্ষণ থেমে টেম্পো দিয়ে আবার বলে, বেশ, একটা ফিলিং টিলিং, মানে কান্নাকাটি থাকবে। মাঝখানে কিছু জমজমাট যুদ্ধ। এবার একটা ফাসকেলাস বিবেক পেয়েছি দেখো।

আর একজন, যার সঙ্গে দেখা হল, সে হচ্ছে স্বর্ণময়ী মুদিখানার সাবু ঘোষ। সাবু ঘোষ আমিবী চালে শুধোল, কোন দিকে যাওয়া হচ্ছে বাবাজীর? সন্ধ্যে যে হল বটে।

রসসিন্ধু ঘুংগুর নাচিয়ে বুঝিয়ে দিল, সময় নেই ওর কথা বলার। যেন, কোন হাটে বা মেলায় চলেছে ও।

এরপর যে দলটার পাশ দিয়ে বেরিয়ে এল রসসিন্ধু তারা গিয়েছিল বড় চকে মাটি কাটতে। তাদের ওসব বালাই নেই, গাঁটের কড়ি খরচ করে ছবির বই কিনে নেবার। তাদের দিকে শান্তভাবে কেবল পরিচিতের হাসি হাসল রসসিন্ধু।

এমনি করে সারা গাঁয়ে চক্কর মেরে এক সময় ও জাৰুলকাশির বাঁধান পুকুরের পাশে এসে হাজির হল। দেখল, একপাল রাজহাঁস পানা খুঁটছে। আর দেখল, কুকুরের লেজে টিন বেঁধে যে ছেলেগুলো হৈ হুল্লোড় করছিল, তারা সব কুকুর ছেড়ে দিয়ে ওকে এসে ঘিরে ধরেছে।

ছেলেগুলো বলছিল, যমপুরী গোলোকধাম, ভুলিয়ে দেব বাপের নাম!

রসসিন্ধু বিপাকে পড়ল। সত্যি সত্যি ছেলেগুলো এক ঝামেলা। পেছনে লাগলে পাগল করে ছাড়ে। তেড়ে এল ও। এই শুয়ার এক চড়ে দাঁত ফেলে দেব বলছি।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। যমপুরী গোলোকধাম, ভুলিয়ে দেব বাপের নাম। ছেলেগুলো আরো জোরে চেঁচিয়ে ওঠে। এমন সময় অদূরেই চালতে গাছের ডাল থেকে একজোড়া পাখি ঝগড়া করতে করতে নীচে এসে পড়ল। আর ছেলেগুলোও পাখির লোভে ঐ দিকে ছুটে গেলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

খানিকক্ষণের জন্য দ্রুত তালে ঘুঙুরদানারই শব্দ হল কেবল, ঝুমঝুম ঝুমঝুম। তারপর রসসিন্ধু নতুন করে মনে মনে ছড়া আউড়ে নিয়ে বুড়োকর্তার বাড়ির সদরে এসে দাঁড়াল। ফুটকুরি কাটল,

নুণের ভাঁড় তেলের ভাঁড়
তাকে কি বলি ভাঁড়।
ভাঁড়ের মত ভাঁড় এসেছে
রসসিন্ধু ভাঁড়॥

কৈ গো গিন্নীমা, আসন দিন, বসি। রসসিন্ধু হাঁক দিল বটে, কিন্তু ভাবগতিক ভাল লাগল না ওর। কেমন যেন ছন্নছাড়া থমথমে ঘর দরজা। এ বাড়ির এমন চেহারা আর কোনদিন দেখে নি ও। ফলে হাঁকডাক বা ছড়া কাটা বন্ধ করল। বাড়ির ঝি হৈমকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে খানিকটা ও এগিয়ে এল, কি ব্যাপাব গো হৈম?

হৈম বলল, পালিয়ে যাও আজ, বাবুরা সব শ্মশানে গেছে।

শ্মশানে গেছে! ব্যাপার কি?

বুড়ো কর্তার খবর শোন নি! দুপুরবেলা মারা গেছেন, খবর পাও নি?

অনেকক্ষণ ধরে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল রসসিন্ধু তারপর এক পা নডতেই মনে হল ঝমঝম করে ওর পায়ের ঘুঙুর বেজে উঠেছে। ঘুঙুরদানার শব্দ যে অমন বেয়াড়া হয় এই প্রথম যেন টের পেল ও। পা টিপে টিপে শব্দ চেপে ও পালাতে চেষ্টা করল। শেষ পর্যন্ত পালিয়েই এল। সিঁডিকাটা পুকুর পাড়ে এসে সিঁড়ির ধাপে ধপ করে বসে পড়ল। মাথার মধ্যে ঝিমঝিম কবছিল বুড়ো কর্তার কথা ভাবতে। অলসভাবে ও হাতের বইপত্তর সব একে একে ব্যাগের ভিতর ঢুকিয়ে নিল। ঘুঙুরদানার হটকা খুলে পলকেই ও পা থেকে যেন জেঁাক ছাড়াল। টুপি খুলবার আগে চশমা খুলল। চশমা খুলল, টুপি খুলল। তারপর হাঁ হয়ে এদিক ওদিক খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। দেখল, ঝিম ঝিম করে একটানা সন্ধ্যা নামছে। পুকুর পাড়ের গাছগাছালিতে একটু একটু করে অন্ধকার এসে আশ্রয় নিচ্ছে। জলো বাতাসে কেমন যেন বিমর্ষতা ছড়িয়ে পড়ছে।

বুড়ো কর্তার কথাই কেবল মনে পড়ছে এখন। জলজ্যান্ত রসিক লোকটাকে ও দিন কয়েক আগেও হেঁটে চলে বেড়াতে দেখেছে। বুড়োর বুড়ো তস্য বুড়ো। ও বুড়ো যে এমন সহজে মরে যাবে ভাবতে পারে নি ও। মরে যাওয়া কি

এতই সোজা। মনে হল, এমনি ভাবে সবাই মরবে। তারপর? মরার পর …গোলোকধামের খেলা ফুরুলে যমপুরীর বিচারশালায় গিয়ে হাজির হবে।

যমপুরীর ছবিটার কথা মনে পড়ল। এ জন্মের পাপগুলোর জন্য কৈফিয়ত দাও। না দিতে পার জহ্লাদ তোমার জিব টেনে গনগনে লোহার শলা ঢুকিয়ে দেবে। তুমি কি কখনো এমন কিছু করেছো যাতে তোমাকে গরম তেলের লোহার কড়াইয়ে ছ্যাঁৎ করে ছেড়ে দিয়ে এপিঠ ওপিঠ ভেজে নেবে; কিংবা… অনেক দৃশ্যই ওর ছবির সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে মনে পড়ছিল। বুড়ো কর্তার অদৃষ্টের কথা ভাবতে গিয়ে নিজের বুকটাই কেমন যেন খাঁ খাঁ করে শুকিয়ে আসছিল। সিঁড়ি বেয়ে কয়েক ধাপ নেমে এসে আজলা ভরে জল খেল ও। তারপর হাঁটতে শুরু করল শ্মশানের দিকেই।

এক হাতে টুপি, অন্য হাতে ব্যাগ। পায়ে এখন ঘুঙুর নেই, ফলে কোন শব্দও নেই। চোরের মত পা টিপে টিপে এগিয়ে যাচ্ছিল রসসিন্ধু, হঠাৎ অন্ধকারেই কে যেন পথ আগলে দাঁড়াল।

কে? আৎকে উঠেছিল ও। কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিল নিজেকে। রাজু কর্মকার না?

হুঁ। এদিকে তুমি কোথায় যাচ্ছ? শুধাল রাজু।

রসসিন্ধু বলল, বুড়ো কর্তা মারা গেছেন শুনেছ?

শুনেছি। তা শ্মশানের দিকেই যাচ্ছ বুঝি। দাহটাহ এতক্ষণে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা।

ভূতগ্রস্তের মত জুলজুলে চোখ মেলে তাকিয়ে রইল রসসিন্ধু। তারপর বলল, লোকটা কিন্তু মস্তোবড় রসিক ছিল। তাই না?

রাজু বলল, হারামী ছিল। ও যাওয়ায় হাড়ে এখন বাতাস লাগবে।

রসসিন্ধু চিবিয়ে চিবিয়ে প্রতিবাদ করল, কি জানি বাবা বদলোক হলে এমন দরাজ হাসতে হাসতে যেতে পাবে কেউ। এতটুকু না ভুগে না ভুগিয়ে মারা গেলেন।

তা গেলেন। তবে দেখ, নরকে ওর কি ধরনের গতি হয়।

রসসিন্ধু হাঁ হয়ে শুনল। বুড়ো কর্তা সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানে না ও। চুপ করে থাকাই বিধেয়।

রাজু বলল, যাক গে ওসব। বটতলার দিকেই যাচ্ছ তো; চল একসঙ্গেই যাই।

শ্মশানের পাশেই বটতলা। রাজুর মতলব বুঝতে পারছিল রসসিন্ধু। গাঁজাব আড্ডার লোভে পড়েছে ও। লোভ দেখাচ্ছে ওকেও। বলল, চল যাই, ঘুরেই আসি। তবে তোমাদের সঙ্গে বসব কি না—

আরে ভাই ভয় কিসের! সঙ্গে থাকলে রসালো কিছু ছড়া শুনতে পেতাম, এই যা। বলতে বলতে বসসিন্ধুব পিঠেব ওপব চাপড়া কষিয়ে রাজু বলল, চলো।

বাজুব সঙ্গেই চলল ও।

শ্মশানে তখন শ্মশান বন্ধুরা বুড়ো কর্তাব অস্থি খুঁজছিল। একতাল কাদা হাতে দাঁড়িয়ে ছিল বুড়ো কর্তার নাতি। অস্থির টুকরো কাদায় ভবে বাখতে হবে। কাশী অথবা গযাব তীর্থে ভাসিয়ে দিয়ে সৎকর্ম কবতে হবে।

এক দৃষ্টে তাকিয়ে বইল রসসিন্ধু। শ্মশান-বন্ধুরা খুঁচিযে খুঁচিয়ে ফুসকুবি ফুসকুরি আগুন ওড়াচ্ছিল চিতায়। নিভন্ত শেষ সময়ের আগুন। কলস ভর্তি জল তুলে এনেছে কয়েকজন, জল ঢালবে চিতাব ওপর।

রাজু বলল, এখানে না দাঁড়িয়ে বটতলায় বসি চল। ওখান থেকেই দেখা যায়।

রসসিন্ধু রাজুব সঙ্গে বটতলায় এল। ওপাশে একটা একচালা। তারই সামনে ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছে কয়েকজন। রসসিন্ধু গেঁজেলদের দেখে চিনতে পাবল। আর একটু পরেই হয়তো দেহতত্ত্বের আসর বসবে। তিথি থাকলে, অথবা তেমন তেমন লোকজন হলে কেত্তন বসে। একপাশে চাটাইয়েব উপর বসল রসসিন্ধু। বইয়ের ব্যাগ আর টুপিটাকে কোলের ওপব পেতে রাখল।

দেখল, চারপাশেই অন্ধকার। চিতার কাছ থেকে কয়েক গজের তফাতে বুড়ি খুস্তির থাল। দিনের বেলা গা ভিজিয়ে মোষ বসে জল শোষে ওখানে। কখন কখন মরা কুকুরের খুলিতে বসে কাক ভাসে। ওপারের কুল বাগানে শিয়ালের গর্ত, উইয়ের ঢিবি। কুল ঝোপের ডাল বেয়ে লতার মত সাপ। এপারে এই শ্মশান, শ্মশান-বন্ধুরা মড়া এনে ওপারের ঐ জঙ্গলের দিকে চোখ রেখে চেঁচায়, বলহরি—হরিবোল। যেন চীৎকার করে ডাক দেয় চিত্রগুপ্তকে। শুনতে পাচ্ছ চিত্রগুপ্ত, এসো, আর একজনকে নিয়ে এসেছি আমরা, খাতা মিলিয়ে নামধাম কর্মকাণ্ড দেখে নিয়ে রেহাই দাও আমাদের।

চিত্রগুপ্ত খাতা নিয়ে দাঁড়ায়। রক্তমাংস মজ্জা নিয়ে করব কি? তোমরা বরং দাহ কর, ভিতরকার আত্মাটাকে নিয়ে আমরা বিদেয় হই।

শ্মশান-বন্ধুরা দাহ করে। বুড়ো কর্তাকে দাহ করা শেষ হয়েছে। অস্থি খুঁজেও পাওয়া গেল শেষটায়। কলসী কলসী জল ঢেলে দগ্ধ চিতাকে শান্ত করে ওরা। তারপর সেই কলসীখানা চিতার বুকে বসিয়ে রেখে টলতে টলতে গ্রামের পথে অন্ধকারে মিশে গেল এক সময়।

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল রসসিন্ধু।

কৈ হে এক ছিলিম হবে না নাকি? এগিয়ে দিল গনগনে কলকেখানা ওর দিকে। রসসিন্ধু মন্ত্রমুগ্ধের মত কলকেব গোড়ায় গামছা জড়িয়ে চোখ বুজে টান কষল। চোখ খুলে দেখল, সব ফাঁকা। জনমানব, কাকপক্ষী, অন্ধকার আলো কিচ্ছু নেই। দেহ নেই, দেহী নেই, মেদ-মাংস-মজ্জা, বোধ-অবোধ কিচ্ছু নেই। সুখ নেই, অসুখ নেই। মুহূর্তের জন্য অদ্ভুত এক জগতে যেন আশ্রয় পেল ও।

তবে কি আছে তোমার? কে যেন ওকে কঠোব গলায় প্রশ্ন করছে।

আঁজ্ঞে, রসসিন্ধু ভয়ে ভয়ে তাকাল, আঁজ্ঞে জানি না তো! এবং উত্তর দেওয়ার পর ও বুঝল, ওর প্রাথমিক নেশাটা কেটে যাচ্ছে।

কৈ হে এদিকে দাও। হাত থেকে কলকেখানা কে যেন ছিনিয়ে নিল। যে নিল তার রক্তবর্ণ চোখ। তার বুকের লোমে হীরের টুকরোর মত জোনাকি আটকে আছে। একবার জ্বলছে, একবার নিভছে। সে তখন আরো একটু লম্বা হয়ে গলা ছড়িয়ে টান কষল কলকেয়। রসসিন্ধু দেখল, কলকের আগুন চড়াৎ করে লাফিয়ে উঠে আফিমের ফুল পুটপুট করে ফুটতে লাগল। যেন মস্তো একটা চিতার আগুনে কারো একজনার মাথার খুলি ফটফট করে ফেটে যাচ্ছে।

কে যেন 'ব্যোম ব্যোম শঙ্কর' বলে উর্ধ্ববাহু হয়ে রইল কিছুক্ষণ। রসসিন্ধু চিতার দিকে তাকাল। দেখল, কিছু কিছু কাঠকয়লা, সাদা হাড় আর ভ্যাপসা ধুঁয়ো। আর দেখল, অন্ধকারেই গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে কি একটা জন্তু যেন কলসীর গায়ে নাক ঘষছে। কি ওটা?

রাজু বলল, যমরাজ গো। শেয়াল সেজে দেখতে এসেছে। বলতে বলতে আবার কলকেখানা ও রসসিন্ধুর হাতে গুঁজে দিল।

হাত ফেরতা কলকে ফিরল অনেকবার। যার বুকে জোনাকি জ্বলছিল, সে একবার বুকের উপর হাত বুলাল, বোধ হয় . াবেই ফেলল। সেই লোকটাই বলল, অমন চুপ মেরে বসে আছ কেন রসসিন্ধু, কিছু বল টল!

কি বলব! উঠি এবার।

এই তো সবে সন্ধ্যে গো। সারাদিনের চরকি ঘানি ঘোরার পর এখন একটু আরাম করা, তাও বাপুর সয় না নাকি।

রসসিন্ধু বলল, সইবে না কেন। তবে যত আরাম তত কান্না, বলে গেছে রাম সন্না। এত আরাম ভাল নয় কর্তা, উঠি এবার।

রাজু বলল, গিন্নী বুঝি দিব্যি দিয়ে রেখেছে? সন্ধ্যার পর বাইরে থাকা মানা বুঝি?

কথার মধ্যে খোঁচা থাকলেও আমল না দিয়ে উঠে দাঁড়াল রসসিন্ধু। চোখের সামনে একঝলক হিজিবিজি অনেক কিছু খেলে গেল। কিছু কিছু হলদে ফুল, কিছু কিছু কালো ফুটকি। পা বাড়াতেই বুঝল, পায়ের নিচে মাটি হড়কাচ্ছে। মাথার দিকটা দুলছে কেমন। মনে হল, একপাল নিশি পোকা তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠেছে, যমপুরী গোলোকধাম ভুলিয়ে দেব বাপের নাম। জোর করে মাথা থেকে শব্দগুলো তাড়াবার চেষ্টা করল রসসিন্ধু। হাত পা কেমন অবশ ঠেকছিল। এমন কেন, বুঝতে পারছিল না ও। টুপিটাকে যত্ন করে মাথায় আবার চড়িয়ে নিল। কাচহীন নকল চশমা নাকের ডগায় বসিয়ে নিল; উবু হয়ে দুই পায়ে ঘুঙুর বাঁধল। তারপর আরো কিছু সহজ হতে চেষ্টা করে ডান পা তুলে বাঁ পা দিয়ে ঝুমুর ঝুমুর, বাঁ পা তুলে ডান পা দিয়েও ঝুমুর ঝুমুর নেচে নিল!

রসসিন্ধুর কাণ্ড দেখে আর সকলে মজা পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, হরিবোল হরিবোল। রাজু কর্মকার সলাজ ভঙ্গিতে মাথার উপর গামছা বিছিয়ে ঘোমটা দিল। কে একজন উলুধ্বনি দিতে দিতে খিল খিল করে হেসে ভেঙে পড়ল।

রসসিন্ধু আমল দিল না এবারও। ফুটকুরি কেটে সওদা দ্রব্যের ফিরিস্তি শুনিয়ে টলে টলে হাঁটতে লাগল, মা-লক্ষ্মীর ব্রতকথা, কাকচরিত্র, ক্ষুদিরাম। সবার সেরা পাবেন দাদা জন্ম মৃত্যু গোলোকধাম।

হাঁটতে ওর কষ্ট হচ্ছিল খুবই। অন্ধকারে দিক দিশা পাচ্ছিল না ও। টলতে টলতে এগোতে লাগল। হঠাৎ মনে হল, চিতার উপর কলসীর গায়ে নাক ঘষছিল যে জন্তুটা সেটা এখন সামনে সামনে পথ দেখিয়ে চলেছে। ভালভাবে চোখ কচলে দেখল রসসিন্ধু, ক্যাংটা গোছের কুকুর একটা। ওরই মত ধুঁকে ধুঁকে এগিয়ে চলেছে। হেই, হেই, কুকুরটাকে তাড়াবার চেষ্টা করল ও। পরক্ষণেই সারা দেহ শিউরে উঠল ওর। তবে কি ওটা যমের সহচর কুকুর

হয়ে সামনে সামনে এগিয়ে চলেছে! সারা দেহের স্নায়ুতন্ত্রী ঝিমঝিম করে কাঁপছিল ওর। বুদ্ধি শুদ্ধি বিবেক বিষয় কেমন যেন তিলে তিলে এক বিন্দুতে মিশে গিয়ে হারিয়ে যাচ্ছিল। এখন যেন ভাল নেই, মন্দ নেই; পাপ নেই পুণ্য নেই, ওসব বিচার অন্য জায়গায়। এখন শুধু টিকে থাকা। এখন শুধু টলতে টলতে কোন রকমে এগিয়ে যাওয়া। আরো জোরে, আরো শক্ত হয়ে এগোবার চেষ্টা করল ও। অথচ ওর বোধ ছিল না, পায়ে ওর ঘুঙুর বাজছে। মাথায় রয়েছে ঝালর বসানো টুপি, চোখেব উপর নকল একটা চশমা। তা ছাড়া আছে বইয়ের বোঝা। মনে পড়ছিল, মালতীর কথা। মালতী আর কোলের বাচ্চা মেয়েটার কথা। এইটাই কি বাড়ির পথ? গ্রামের মুখে এগিয়ে এসে অনেকক্ষণ ধরে বুঝবার চেষ্টা করল রসসিন্ধু। কুকুরটা তখনো পথ ছাড়ে নি।

হেই হেই, আবার ওটাকে তাড়াতে চাইল। এক হাত শূন্যে তুলে চাপড় কষিয়ে দেখাল ও।

মানুষজন বাড়িঘর সবাই যেন ঘুমিয়ে আছে। গাছগাছালির অন্ধকার, মাঝে মাঝে ফুলের গন্ধ। একটানা ব্যাঙ ডাকছে ঝোপের গায়। রাতে কি আবার বৃষ্টি হবে। রসসিন্ধু পা টিপে টিপে অনুমানেই চলতে লাগল। চলতে চলতে একসময় ও নিজের ঘরের সামনে এসে সব কিছুই চিনতে পারল। দড়ির দোলনা, খড়ের চাল, লাউ মাচা সব কিছু আপন বলে মনে করতে পারল। ও ডাকল, মালতী। ও মালতী। দরজা খোল।

কুকুরটাকেও খানিক দূরে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখল ও। অ র নষ, বকের মত লাফিয়ে লাফিয়ে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল রসসিন্ধু। দে তে দেখতে খিল তুলে দিয়ে হেলান দিয়ে দরজা আগলে দাঁড়াল।

প্রদীপ জ্বালতে জ্বালতে মালতী শুধাল, কি হয়েছে? কি হল তোমার? অমন করছ কেন?

রসসিন্ধু সত্যি সত্যি বুঝতে পারছিল না, কি হয়েছে ওর। ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে রইল মালতীর দিকে। আর দেখল, খাটের একপাশে ঘুমে অচেতন বাচ্চা মেয়েটা।

মালতী এবার আরো কাছে এগিয়ে এসে হাত ধরল ওর। কি? কি হল?

রসসিন্ধু হাতের চেটোয় ঘাম মুছতে মুছতে বলল, কুকুর। একটা কুকুর।

কুকুর! ওমা ওর জন্য এত ভয়। মালতী ওকে টানতে টানতে খাটে এনে বসাল। তারপর কাঁধ থেকে ব্যাগটাকে নামিয়ে নিল। এমনিভাবে রোজই ও ব্যাগটাকে নিজের কাছে টেনে নেয়, তারপর চোরাপকেটে হাত ঢুকিয়ে পয়সা বার করে। গুনে দেখে। আজও পয়সা বার করল, গুণতে শুরু করল।

রসসিন্ধু ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। মনে হল, হয়ত একদিন পথ ভুল করে কুকুরটার সঙ্গে অন্য কোথাও চলে যাবে ও। আর তা হলে কি হবে এদের, এই মালতী আর এই বাচ্চাটার! কাল থেকে আরো বেশি করে আয় বাড়াতে হবে ওকে। আরো বেশি, অনেক বেশি।

অনেকক্ষণ পর ও ঝাপসা গলায় বলল, দেখ তো মালতী, দরজার বাইরে কুকুরটা এখনো দাঁড়িয়ে আছে কিনা। দেখলেই তুমি চিনতে পারবে, কালো মিশমিশে ধরনের একটা কুকুব।

কালোজল

ডিঙিখানা তরতর করে এগোচ্ছিল। ভোর অবধি ভাঁটার টান থাকবে, ভোর অবধি যদি বাতাস থাকে, তাহলে তো কথাই নেই। রুস্তম গলুইয়ে অর্ধশায়িত হয়ে পায়ের খাঁজে বৈঠা ধরে রেখে বুঝতে পারছিল, অলস ঝিমুনি আসছে স্নায়ুর মধ্যে। যেন এই কুয়াশা-আচ্ছন্ন নদী সুশীতল মৃদুমন্দ বাতাস যেন এই প্রকৃতির মোহিনী মনোহারিণী নেশা ওর রক্তের কোষে কোষে নিথর হয়ে জমে এসেছিল। এ সময় ঘুম আসাটাই স্বাভাবিক। রুস্তম অর্ধনিমীলিত চোখে সামনের বঙ্গোপসাগরের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত রাখবার চেষ্টা করছিল। কখনো বা চকিতেই কি যেন এক-একটা কষাঘাতে সজাগ হয়ে উঠছিল। রুস্তম যেন রুপোলী মাছেব ঝাঁক, জলের উপর বৃষ্টির ফোঁটার মত লাফিয়ে উঠে ওকে সতর্ক করে তুলছিল। হায়, কতকাল উজাড় করে মাছ নিয়ে ফিরি নি। কতদিন মাছের হাটে ঝুড়ি নামিয়ে বুক টান করে দাঁড়াতে পারি নি। দেখে নে পদ্মিনী, রুস্তমের বুড়ো কবজিতে এখনো কেমন বাঁশবাজির ভেলকি খেলে, দেখে নে। এখনো যদি বুড়ো রুস্তম বাঘের মত গান্ধারীর টুঁটি চেপে ধরে, কোন বাপ তোর ছাড়িয়ে নেবে দেখে যা। দিনকয়েক আগে জমির দাঙ্গায় চালান হয়ে গেছে গান্ধারী, তবু ঘটনাটা কেমন যেন বুকের মধ্যে নিশপিশ করে আঁচড়ায় রুস্তমের।

ঘটনাটা কয়েকদিন আগে ঘটলেও মাছির মত চেতনার মধ্যে যেন ঘ্যান ঘ্যান করছিল। তাড়িয়ে দিলেও যায় না, স্বস্তি ছিল না, শান্তি ছিল না। যেন রুস্তম সেই জোয়ান বয়সের রক্তের সন্ধান এখনো তার বুকের মধ্যে খুঁজে পায়। আবেগের দাস হয়ে হাওয়ার মধ্যে ঘুষি আছড়ায়। বয়স এখন তিন কুড়ির কাছাকাছি, দেহের খোলসটা আজ সত্যি সত্যি শেওলা ধরা বড় পুরনো মনে হয়। মনে পড়ে কি তোমার, সেই কাঁচা বয়সের রুস্তমের ইচ্ছাগুলো কেমন সন্তোলা মাছের মত জলের মধ্যে ছটফট করত। কত নিষ্ঠুরভাবে সে সময় ঘুমিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছিলে তুমি। খোদাই জানে ইাদশের চোখের মণিদুটো

সমূলে উপড়ে নেওয়ার পিছনে কি. এমন মাদকতা তোমাকে পেয়ে বসেছিল। মনে পড়ে কি তোমার, এই নদীপথেই জল-ডাকাত রুস্তমের ভয়ে ঢেউগুলিও মাথা নুইয়ে কেমনভাবে কুর্নিশ করত। সেই দোর্দণ্ড প্রতাপ, সেই প্রতাপশালী রুস্তম আজ বয়সের প্রান্তে এসে কেমনভাবে নির্জীব, মৃত মাছের মত নিথর হয়ে পড়ে আছে। কেমনভাবে পদ্মিনীর সোহাগ স্পর্শে সমস্ত পাপের উপর বিস্মৃতির একটা প্রলেপ বুলোতে চাইছে। কেমনভাবে সেই রুস্তমই শেষ পর্যন্ত একটা ভাল মানুষের বাচ্চা হয়ে স্থিতধী হতে চাইছে আজ। এ বয়সে বোধ হয় এরকমই হয়।

রুস্তম গলুইয়ে মাথা রেখে স্মৃতির অন্ধকারে ডুবুরি হয়ে যেন ডুবছিল, ভাসছিল। এখন আর বাসনা জাগে না লুঠেরা হতে, পরধনে লোভ নেই। কেমন যেন কাপুরুষ মনে হয় অবলা নারীর গলা থেকে সোহাগের হার ছিনিয়ে নিতে। মনে হয় ধর্ম-অধর্মের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে বাতাসে। এ বয়সে বোধ হয় এমনই হয়। ধর্মের কাছেই বোধ হয় হাতকড়া পবেছে রুস্তম। ফলে অধর্মগুলো ভুলে যাও রুস্তম, ভুলে যাও।

সহসা ডিঙির গায় কি যেন একটা ভারী জিনিস ধাক্কা খেয়ে পিছলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিভেজা গাছেব মত অকস্মাৎ ঝুরঝুর করে জল গডিয়ে পড়ে রুস্তম যেন সজাগ হল। ধাক্কাটার প্রকৃতি বুঝবার জন্য ক্ষণিকের মধ্যেই সতর্ক হয়ে উঠে বসল রুস্তম।

ডিঙিতে পাল ছিল না। লগি দাঁড় করিয়ে পদ্মিনীবই একটা পুরনো শাড়ি উড়িয়ে দিয়েছিল রুস্তম। বাতাসে তাই ফুলে উঠে ভার-ভরন্ত একটা চেহারা নিয়েছিল। পদ্মিনী এখন ছইয়ের ভিতরে হযত বা জলের দোলায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। চাপা নীচু একটা ছই, একটু উঠে বসলে ওলগুইও চোখে পড়ে। রুস্তম ছইয়ের উপর দিয়ে প্রসারিত কুয়াশার স্তরের দিকে তাকাল। নদীর এই মোহনায় কুলকিনারা দেখবার উপায় নেই। হয়ত একটু বেশী রকম ভিতর দিকেই ঢুকে পড়েছিল ওর ডিঙি। সঙ্গী নৌকোগুলোরও হদিশ নেই। একসঙ্গে পনের-বিশখানা ডিঙি ছেড়েছিল, একসঙ্গে পনের-বিশ জোড়া মেয়ে-পুরুষের কাকলি. দুর্গা দুর্গা, আবার আমাদের ফিরিয়ে এনো দুর্গতিনাশিনী। লক্ষ্য ছিল, নতুন জাগা চর। যে যেখানেই জলের টানে হারিয়ে যাও চরায় এনে লগি পুতে নৌকো বেঁধো বুঝলে হে। সারবন্ধ নৌকো এনে দাঁড় করিও এখানে। তারপর সমস্ত দিন মাছ মারার কসরত, তারই ফাঁকে দুই

ইটের উনুন জলবে চরায়, কাঁচা কাঠের গন্ধের মধ্যে বসে ভাত ফুটিয়ে নিও হাঁড়িতে।

রুস্তমের মনে হয় এ যেন একটা অকথিত নিয়ম। অথচ কি যেন একটা এখনো ওর প্রকৃতির মধ্যে গোপনে গোপনে রয়ে গেছে। এত নিয়ম কি কখনো মানা যায়! এমন গোছানো জীবন। অথচ জেলে হয়েই বাকি জীবনটাকে ওর টেনে নিতে হবে। পদ্মিনীর চোখের দিকে চেয়ে, জিয়োন মাছের মত ছোট্ট একটা হাঁড়িতেই আজ বাসা বাঁধতে চায় রুস্তম। গান্ধারীই বুঝি বাধ সাধাতে চেয়েছিল। সেজন্য যেন তৈরিও ছিল রুস্তম, বেঘোরে বা বেআড্ডায় ওর ঘাড়ে কাটারি বসিয়ে দিয়ে একটা কিছু ফয়সলা করে নিত ও। কতকাল, কত দীর্ঘকাল পরে আবার এমন একটা ঝুঁকি নিয়ে চিরকালের মত ফেরার হয়ে যেত রুস্তম। ধর্ম-অধর্মের কথা বোধ হয় আর মনেও আসত না।

ডিঙিখানা আবার একটু হোঁচট খেয়ে দুলে উঠতেই বৈঠা হাতে শক্ত হয়ে গেল রুস্তম! নির্ঘাত কিছু একটা ভারী মত বস্তু এবারও ধাক্কা মেরেছে। কি হতে পারে! পদ্মিনীর গলা শুনতে পেল রুস্তম। পদ্মিনী ছইয়ের ভিতর থেকে চেঁচিয়ে উঠেছে, আহ জ্বালা! ডিঙিটাকে উলটে দেবে নাকি?

রুস্তম আশেপাশে তন্ন তন্ন করে খুঁজল। কালো জলের ভাঁজে ফসফরাস জ্বলছে। কিছুই দেখা গেল না। এমন ঘন কুয়াশা যে নিজের চেহারাটাও স্পষ্ট মালুম হচ্ছে না। ডাকল, লম্ফটা একবার নিয়ে আয় দেখি, ধারগুলো একবার দেখি।

পদ্মিনী তেলের ডিবে হাতে হামা দিয়ে ছইয়ের বাইরে এল। আলোটাকে ঘিরে ধরল কুয়াশা। পদ্মিনী দেখল রুস্তম কোথায়, এ যেন এক আলাদীনের দৈত্য বসে আছে। স্তব্ধ হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। বৈঠা নামিয়ে একবার দেখ না চরার কাছে এলাম কি না! চিবিয়ে চিবিয়ে বলল তারপর।

এত সকালেই চরায় এসে পৌঁছবার কথা নয়। এখন মাঝরাত, শেষরাতের দিকে আকাশে চাঁদ দেখা যাবে। কুয়াশার মধ্যে চাঁদের আলো গুঁড়ো গুঁড়ো রেণুর মত গড়াবে। এত সকালেই ডিঙির নীচে চর জেগে যাওয়া সম্ভব নয়। তবু ঝুঁকে বৈঠা ডোবাল রুস্তম, অথই জল। জলের টানে আবার ভেসে উঠল বৈঠার ফলা। লম্ফটাকে এদিকে ধর। এদিকে দে। বৈঠা তুলে রেখে

এগয়ে আলো ধরল রুস্তম। তেরছা আলোর ধাঁধা থেকে চোখ বাঁচাবার জন্ম হাতের আড়াল করল খানিকটা। তারপর ঝুঁকে আলোটাকে জলের দিকে নামিয়ে আনল। দেখ ত কিছু ভাসছে কিনা ধারে-কাছে।

পদ্মিনীও ঝুঁকে দেখবার চেষ্টা করল। শুধু জল আর জল। জলের ঢেউয়ের গাঁ-চাটা ছোট ছোট আঘাত, এ আঘাতে অমন দুলে উঠবার কথা নয়। পদ্মিনী দেখল ঢেউয়ের ভাঁজে কুচি কুচি আগুন গড়াচ্ছে। ফসফরাস, চাঁদ উঠলে যেন দাউ দাউ করে জলে উঠবে। কিন্তু দিনের আলোয় বিলকুল সাফ হয়ে যাবে সব। কে বুঝবে রাতের এই কালো জল দিনের আলোতে আবার কেমন ঘে না হয়ে উঠবে।

কিছু চোখে পড়ল? রুস্তম শুধাল।

পদ্মিনীর ভারী দেহ, ভারী মোমের মত উরু, গ্রীবা, দেহের রঙে তামাটে একটা আভা। বুকের উপব দিয়ে দেড় পাকে শাড়িখানা জড়ান ছিল, কোমরে শক্ত করে আঁচল গুঁজল। তারপর উবু হয়ে দেখতে গিয়ে বুঝল, চুল বাঁধা হয় নি আজ। চুলের ঢল পিঠ থেকে গড়িয়ে এসে চোখের উপর নেমে এল। ফলে আবার সোজা হয়ে বসে দুই হাতের শঙ্খ-প্যাঁচে মাথায় একটা হটকা দিয়ে খোঁপা বানাতে বানাতে বলল, কুমীর টুমীর হতে পারে।

অবশ্য কুমীর হলেও তেমন কিছু ভয় নেই। কুমীর ছাড়া অন্য কিছু বিরাট আকারের যদি জীব হয়, যদি একটা মস্ত টস্ত তিমি হয়। ডিঙি উলটে ফেলতে হলে যত বড় তিমির দরকার তত বড় তিমি নয় নিশ্চয়ই। রুস্তম বলল, কুমীর নয়; কাঠের গুঁড়িটুড়ি লেগে আছে কিনা কে জানে। দেখ না।

পদ্মিনী বলল, তুমিই দেখ! দূরে দূরে দৃষ্টি ছড়িয়ে সঙ্গী নৌকাগুলোর খোঁজ কবল পদ্মিনী। জলো বাতাস, কুয়াশা আর আঁধার ছাড়া কিচ্ছু নেই। তীর নেই, চরা নেই, জল আর জল। সামনেই সাগর। বেহুঁশ হয়ে চলতে চলতে সাগরেই ঢুকে পড়লাম কি। সাগরটার শেষ কোথায়? অন্য পারেও কি লোকালয় আছে। গোলপাতার ঘর, [illegible]চুরিপানা, ওপারেও কি দিনের আলোয় জাল শুকোতে দেয় লোকে। গান্ধারীকে বোধ হয় অমন কোন দ্বীপেই চালান করে দেওয়া হয়। বাতাসটা বড় শীতল শীতল মনে হল পদ্মিনীর।

রুস্তম হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়ল। দু'চোখ ধারাল করে জলের দিকে তাকিয়ে রইল। লম্ফটা তুলে ধর দেখি, পেয়েছি মনে হচ্ছে।

পদ্মিনী আগ্রহে খানিকটা এগোল। কি গো, কি দেখেছ? কি ওটা?

লম্ফটা আগে তুলে ধর। কাছির গায়ে কি যেন একটা লেগে রয়েছে।

পদ্মিনী আলো ধরল জলের দিকে তাকাল। সত্যি সত্যি কাছির সঙ্গে কি যেন একটা ভারী মত বস্তু জড়িয়ে আছে। চিনতে পারল না পদ্মিনী।

রুস্তম বলল চিনতে পারলি না বুঝি? চিনবি কি করে। এসব কখনো দেখিস নি। এই দেখ— বলতে বলতে বস্তুটার ওপর বৈঠা দিয়ে একটা খোঁচা মারল রুস্তম।

পদ্মিনী আবার আঁতকে উঠল, ওমা মানুষ নাকি! আহা রে!

রুস্তম বলল, মেয়ে মানুষ! কাছির সঙ্গে বৈঠাটাকে জড়িয়ে একটু চাড় দেবার চেষ্টা করল।

ওমা, শিউরে উঠে পদ্মিনী দেখল, এক জোড়া পা, রূপোর মল ধব ধব করছে।

রুস্তম বলল, এখনও পচন ধরে নি। পচন ধরলে আর টেকা যেত না।

পদ্মিনীর বুক কাঁপছিল, পেটের মধ্যে ঘুল ঘুল করে কেমন যেন ঘুলিয়ে উঠল।

রুস্তম বলল, মুখ দেখবি এই দেখ,—বৈঠা দিয়ে পায়ের দিকে খোঁচা মেরে ডুবন্ত মাথার দিকটা ভাসিয়ে তুলবার চেষ্টা করল রুস্তম। পিছলে গেল। আবার খোঁচা মারল, তারপর বৈঠার চাড়ে মাথার দিকটা ভাসিয়ে তুলল।

এলোমেলো চুল বিছানো মুখের ওপর। একটা ডেলা পাকান চোখের মত কি যেন চকিতেই দেখতে পেল পদ্মিনী। শাড়ির খানিকটা অংশে মাজার দিকটা ঢাকা। গায়ে কোন [illegible] নেই। ধবধবে হলদে লাগল গায়ের রঙ।

রুস্তম বলল, গয়না আছে গলায়। ঘণ্টা কয়েকের আগের মরা। চামড়া এখনো শক্ত আছে।

আবার মাথার দিকটা জলের নীচে তলিয়ে গেল। মাজার দিকটা ভাসল বটে, মাজার ভাজ ফুটতে না ফুটতেই রূপোর মলপরা পা দুটো খুঁটির মত আবার উপর দিকে জাগিয়ে উঠল।

রুস্তম বলল, আহা লম্বটাকে কায়দা করে ধর না দেখি। ঝুঁকে কাছিয়ে সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়া শাড়ির একটা প্রান্ত ধরল রুস্তম। টেনে উপরে তুলে নিংড়ে নিল কিছুটা। বেশ জেল্লা দেওয়া শাড়ি।

পদ্মিনী দেখলে গাঢ় কমলা রঙের জমিন। জলের মধ্যে ওটাই অমন কালচে লাগছিল। কিন্তু করছে কি রুস্তম। একটু টান করলেই উদোম নেংটা হয়ে যাবে যে। মেয়ে না বউ। যেই হোক চোখের সামনে অমন উলঙ্গ একটা যুবতী ভাসবে, ভাবতেও কেমন শিরশির করে হাত-পা। মেয়েটার পা দেখেই বোঝা যাচ্ছে বুকের চেহারা কেমন হবে, পেটের চেহারা। চোখটা যেন খাই খাই ভাব করে তাকিয়েছিল একবার। পদ্মিনী অনুনয়ের স্বরে বলল, দোহাই তোমার কোথাকার মরা হদিশ নেই, কাপড়টাকে ফেলে দাও।

রুস্তমের চোখে যাদুকরের মত রহস্য যেন চিকচিক করছিল। যেন প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে ঐ মেয়েকেই আবার নিজের বিবি করে ফেলতে পারে রুস্তম।

পদ্মিনীর কেমন ঘিন ঘিন লাগল রুস্তমকে। বলল, ছাড়বে কি না বল! না ছাড়বে তো আমি চেঁচিয়ে লোক জড় করব।

পদ্মিনী গুম হয়ে শুনল। গয়নাগুলোর কথা তেমন করে ভাবতে পারে নি এতক্ষণ। চারপাশে তাকাল। না, কুয়াশা ছাড়া কিচ্ছু নেই। কেউ নেই আশেপাশে। একটা ডিঙিও চোখে পড়ল না ওর ; গয়নাগুলো খুলে নিলেই তো চুকে যায়। বলল, গয়নাগুলো খুলে নিয়ে ছেড়ে দাও।

রুস্তম হাসল, গলাটা রয়েছে পাতালে, পায়ের মল দুটোই কেবল খুলতে পারি। বাকিগুলো নিতে হলে টেনে তুলতে হবে।

পদ্মিনী বুঝতে পারল না কি করা উচিত ওর। কোথাকার মরা জানা নেই, ডিঙিতে তুলবে? পরে যদি কিছু হয়!

রুস্তম বলল, তুলব আর গয়নাগুলো খুলে নিয়েই ছেড়ে দেব। কাপড়টা কিন্তু বড্ড মনে ধরেছিল পদ্মিনী। এ কাপড় যদি তুই পরিস, তোকেও ঠিক সত্যিকারের বেগমের মত মনে হবে। খোদাই আমাদের শাড়ি গয়না জুটিয়ে দিয়েছে, খোদার দান ফেলতে নেই।

রুস্তমের চোখের মণিতে যেন নেশা লেগেছিল। এতগুলো ডিঙি থাকতে ওদের কাছেই বা এলো কেন! আর এলোই যদি জিনিসগুলো না খুলে নিয়ে

আপশোস রাখি কেন। পদ্মিনীর মন মেয়েমানুষের মন। ওতো একটু কিন্তু কিন্তু করবেই। রুস্তম বলল, দাঁড়া শাড়িটা দিয়েই শক্ত করে বেঁধে নেই। ডিঙির ঝুঁকটা রাখিস পদ্মিনী, ডুবেনা যাই আবার।

পদ্মিনী অলসভাবে লম্ফটাকে একপাশে সরিয়ে রাখল। বৈঠা দিয়ে বিপরীত দিকে জল টেনে রাখবার চেষ্টা করল।

রুস্তম বুকে ভর দিয়ে জলে ঝুঁকে শাড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে দেহটাকে একটা শক্ত গিঠে বেঁধে ফেলল, গা বড় শীতল। চামড়াটা কেমন পেছল পেছল লাগল। এত মসৃণ যেন মাছি বসলেও পিছলে যাবে। মেয়েটির যৌবন দেখে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল রুস্তমের। পদ্মিনীর দিকে তাকাল। পদ্মিনী কেমন যেন ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে আছে। রুস্তম এবার নিজের পায়েব সঙ্গে শাড়ির প্রান্ত জড়িয়ে দুই বাহু দিয়ে শীতল শক্ত বুক দুটোকে পেঁচিয়ে ধবল। সাবধানে ঝুঁক বাখিস পদ্মিনী। এবার এটাকে তুলে আনব।

পদ্মিনী অন্য পাশে সরে এল। দেহেব ঝাঁকানি দিয়ে নৌকার দোল ঠিক রাখবার চেষ্টা কবল।

রুস্তম মৃতের পিঠের দিকে দুই হাত ছড়িযে দিয়ে আঙুলে আঙুলে কবজা আঁটল। তারপর অস্ফুট একটা শব্দ কবে হেঁচকা দিযে দেহটাকে পাটাতনের উপর তুলে আনল। ঝরঝর করে একরাশ জল উঠে এল। সপসপে ভেজা দেহটার কোমরের দিকটা ধনুকেব মত খানিক বাঁকা মত মনে হল। দেহটা ধপ করে পাটাতনের উপব বিছিয়ে পড়ে বার দুয়েক দোল খেল। একটা হাত আচমকা লম্ফটার উপর চেপে বসে বাতিটিকে উলটে ফেলে নিবিয়ে দিল।

হঠাৎ অন্ধকার নামল, হঠাৎ এই অপবিচিত মৃতদেহ, ভয়ে ায় আর্তনাদ করে উঠল পদ্মিনী, মাগো, ই আল্লা।

দেহটাকে তুলতে গিযে রুস্তম একটা ছোট মত আঘাত খেল ওর চোয়ালে। মৃতেব কনুইটা যেন লোহা পাথবেব মত শক্ত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিয়ে বলল, লম্ফ জ্বেলে নে, পদ্মিনী। চটপট আমাদের কাজ সেরে নিতে হবে।

পদ্মিনী আর্ত চোখে ছইয়ের ভিতব থেকে দেশলাই আনল। জ্বালাল।

এইবার পুরো দেহটাকে দেখা যাচ্ছে। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত। গলার হারটা চিকচিক করছে, হাতে কয়েকগাছা কাচের চুড়ি, পা দুটো পাটাতন থেকে খানিক উপরে রয়েছে। খোলা বুকে পাথরের মত

যৌবন। চোখ ছুটো নিতভাবে গোল। চোখের পাতা ছুটো বন্ধ থাকলে যেন স্বস্তি পাওয়া যেত। মুখের গহ্বরটা অন্ধকার। বেকুফের মত জল গিলেছে মেয়েটা, জলেই মরেছে। চোখ মুখের অবস্থা দেখে ডাঙার মরা বলে মনে হল না রুস্তমের।

বলল, দু-চারটে বিড়ি আনত পদ্মিনী! মরে গেলে ওজনটা কি বেড়ে যায়! আর একটু হলে আমাকেই জলের ভিতর টেনে নামাত।

পদ্মিনী বিড়ি আনল। থরথর করে হাত কাঁপছিল পদ্মিনীর। প্রচণ্ড শীত শীত করছিল। মাঘ মাসের শীতের মত পেটের কাছ থেকে যেন পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছিল। যেন এখন ওর ঠাণ্ডা হাতের আঙুলগুলো আলোর শিখার উপর পেতে রাখলেও ক্ষতি হবে না কোন।

রুস্তম বলল, মানুষের যে কখন কি সব হয়ে যায়, নইলে জলে ঝাঁপিয়ে মরে কেউ!

মেরেও তো কেউ ভাসিয়ে দিতে পারে। পদ্মিনী ভাঙা গলায় বলবার চেষ্টা করল।

তাও পারে। তবে গায়ে কোন চিহ্ন নেই, আর গায়ের গয়নাগুলোও খুলে রাখত তা হলে।

পদ্মিনী বলল, হয়ত নৌকাডুবি হয়েছে কোথাও।

রুস্তম ভাবছিল, কি হতে পারে এক্ষেত্রে। কেমন করে ভাসতে ভাসতে ও এল। নৌকাডুবি! এই সাগরের মুখোমুখি এমন কার নৌকো এল রে বাবা। গামছায় হাত মুছে বিড়ি ধরালো রুস্তম।

পদ্মিনী বলল, আগে ওর গয়নাগুলোর গতি করে নিলে হত না।

রুস্তম গল গল করে গলার ভিতর থেকে ধোঁয়া বার করল। খুলে নে এবার গা থেকে। আমি একটু জিরিয়ে নেই।

পদ্মিনী বলল, মাগো। তুমিই খুলে দাও। আমার হাত কাঁপছে এখনো।

রুস্তমের চোখ আরো রহস্যময় হয়ে উঠেছিল যেন। জীবনে কখনো মরামানুষের গা থেকে গয়না খুলি নি। এই বুড়ো বয়সে খুলব বলছিস! বরং আমাকে আজ রেহাই দে। বরং আমি আজ পাহারাদারের মত বসে থাকি, তুই খুলে নে।

পদ্মিনী হাঁটুর উপর ভর দিয়ে বসেছিল। বলল, ডাকাতের প্রাণে আবার

জ্যান্ত-মরার বিচার আছে নাকি! সারাটা জীবনে তো এসব কর্মই করেছ। আমাকে কেন পাপের ভাগী করাও।

পাপ কথাটা কেমন দুর্বোধ্য লাগে রুস্তমের কানে। ডাকাতি করতে গিয়ে কতবার কত অসহায় মেয়ের গলা থেকে সোনার হার ছিনিয়ে নিয়েছে ও। এতটুকু মমতা বোধ করে নি ও। মনটাকে যদি পাথরের মত শক্ত করা যায় তাহলেই হল। তোমাকে এমন করতে হবে যে, তুমিই যেন হর্তাকর্তা বিধাতা। রুস্তমের মনে পড়ে, ছোট ঘেরির পাশ দিগে ইদ্রিশ মিয়া লণ্ঠন হাতে চলেছিল। এই পথেই ওর যাওযার কথা, আগে থেকেই তৈরি ছিল রুস্তম। হঠাৎ বাঘের মত লাফ দিয়ে এসে মুখোমুখি পথ আগলে দাঁড়াল।

কে? চমকে উঠেছিল ইদ্রিশ।

আমি রে শালা। হারামির বাচ্চা, পুলিসকে কি কি বলেছিস, বল। দুম করে লণ্ঠনের গায়ে একটা লাথি কষিয়ে দিয়েছিল রুস্তম। হাত থেকে আলোটা ছিটকে ঘেরির জলে গিয়ে পড়েছিল।

ইদ্রিশ তৈরি হবার আগেই টুঁটি টিপে ধরল রুস্তম। তারপর রদ্দের একটা ঘা বসিয়ে বুকের উপর চেপে বসল। ইতিহাসে শিবাজীর ছিল বাঘনখ। রুস্তমের হাতে তেমন কোন অস্ত্র ছিল না। ছিল লোহার মত কয়েকটা আঙুল। তাই সে আমূল চোখের মণি দুটোতে বিঁধিয়ে দিয়ে দু হাত দিয়ে উপরে এনেছিল ডিম দুটো। তারপর রক্তমাখা হাত শান্ত মনে ঘেরির জলে ধুয়ে ফেলেছিল।

এমন দিনও গেছে রুস্তমের। এখন ঝিমিয়ে আসার দিন। এখন বাতাসে কান পাতলে শোনা যায় ধর্মযুদ্ধের দুন্দুভি বাজছে চারদিকে। তুমি কোন দলে? ওহে রুস্তম, কোন দলে তুমি বেছে নাও।

রুস্তম আর একগাল ধুঁযো ছাড়তে ছাড়তে বলল, খোদার কাছে কৈফিয়ত দেওয়ার আর কিছুই থাকল না আমার। মরাটাকে টেনে তুলেছি। বাকি কাজটা অন্তত তুই-ই সেরে নে পদ্মিনী। গয়নাগুলো খুলে নিজের গলায় একবার পর। গলায়, কানে, পায়ে রুপোর মলটাও পরতে পারিস। তারপর শাড়িটা খুলে ছইয়ের উপর বিছিয়ে দে। শুকুতে দে।

পদ্মিনী উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছিল। এগিয়ে এসে মৃতের গলায় হাত ছোঁয়াল। উহ্, কি শীতল গো। বরফের শীতলতা যেন দেহের মধ্যে চইয়ে এল। হাত তুলে নিয়ে পদ্মিনী বলল, কেমন ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে

আছে দেখ না, বয়সটা নেহাতই কাঁচা ছিল। মরবার সময় কত কষ্টই না পেয়েছে।

মরবার সময় সকলেই কষ্ট পায়। ওসব কথা আর চিন্তা করলে চলে না।

পদ্মিনী বলল, তোমাদের মত ডাকাতদের চলে না। তোমরা বড় নিষ্ঠুর। বলতে বলতে মৃতের গলায় আঙুল দিয়ে হারটাকে তুলে ধরল। আলোটা একটু একটু কাঁপছিল। হারের ফাঁস খুলবার জন্য হুমড়ি খেয়ে এগিয়ে এল পদ্মিনী।

রুস্তম বিড়ির টুকরোটা জল লক্ষ্য করে ছুঁড়ে ফেলে বৈঠা নামাল। কুয়াশার ঘনত্ব যেন ক্রমশই বাড়ছে। কিচ্ছু চেনা যাচ্ছে না। পথটা কি হারিয়েই ফেললাম। অথচ এমন কিছু একটা ঢেউ নেই বা জলের টানের এমন কিছু লক্ষণ নেই যা থেকে পুরোপুবি সাগরেই ঢুকে গেছি কিনা বোঝা যাবে। বৈঠাটাকে হালের মত বসিয়ে দড়ির ফেঁসো আঁটকে দিল রুস্তম। তারপর লম্ফটাকে মুখের কাছে ধবে আবার একটা বিড়ি ধরাল।

পদ্মিনী ওর গলার হার খুলে নিয়ে কানে হাত দিয়েছে এবাব। চুলেব সঙ্গে দুলটা জড়িয়ে ছিল। চুল সবাতে গিয়ে আবার কেমন পেটেব কাছে ঝাকি দিয়ে শীত থামচে এল। থরথর কবে হাত কাঁপছে, কানের লতিটা সিসের মত শক্ত। ভারী মাংসের ভাঁজে যেন শক্ত হয়ে জমে বসেছে। সহজে খুলতে চাইল না।

রুস্তম বলল, হেঁচকা টান দিয়ে ছিঁড়ে নে পদ্মিনী। জলে জলে ভিতরটা ওর ফুলে অমন আঁটকে আছে।

পদ্মিনী রুস্তমের দিকে তাকাল। এত স্বাভাবিক গলায় বলছে কি করে রুস্তম। কেমন নির্বিকার, অথচ এমনও তো হতে পারে যাদের মৃতদেহ তারা এতক্ষণ জল তোলপাড় করে খুঁজতে বেরিয়েছে। অবশেষে আমাদের দিকেই ছুটে আসছে। যদি কোন জল পুলিসের বোট এসে হাজির হয় এ সময়। নৌকায় মৃতদেহ দেখলে আমাদেরই খুনী ভেবে হাতকড়া পরাবে। কত ধরনের বিপদ হতে পারে আমাদের। কানে একটা হেঁচকা টান দিতেই দুলটা খুলে এল। অন্য দুলটাও পদ্মিনী খুলে নিল।

রুস্তম বলল, রূপোর মল দুটোও খুলে রেখে দে পদ্মিনী, কাজে লাগবে।

না বাপু। মল আমি পরব না। দুল হারই যথেষ্ট আমার।

না পরলেও রেখে দে। বাজারে বিক্রি করলেও কিছু পয়সা হয়। আমরা

না রাখি আর যে দেখবে সেই রাখবে। রুপোর ভরি আজকাল কত করে কে জানে, কিন্তু যতই হোক মল দুটোর বেশ ওজন আছে কিন্তু।

পদ্মিনী পায়ের দিকে এগোল। উরু দুটো নিটোল, শ্বেত পাথরের মত অটুট। চোখ ফিরিয়ে নিল। মলটাকে পায়ের গোছে ঘোরাল পদ্মিনী। আঙুর দানার মত গোল গোল কিছু আঙুর যেন রুপো দিয়ে বানান হয়েছে। কত শখ করেই না মেয়েটা পরেছিল। আহা, মরবার আগের মুহূর্তেও হয়ত কত ধরনের বাসনা ছিল মেয়েটার। সব বাসনা যেন ঠুনকো কাচের মত ভেঙে যায়। পদ্মিনী পা গলিয়ে মল দুটোকে বার করবার চেষ্টা করল। পারল না। পায়ের পাতা অসম্ভব রকম ফুলে বিকৃত হয়ে আছে। খুলব কি করে ? এ খুলতে হলে পা কাটতে হবে যে।

কবজা আছে কি না খুঁজে দেখ। পর পর বিড়ি ধরিয়ে চলেছে রুস্তম। যেন বিড়ির উত্তাপে নিজেকে উষ্ণ রাখবার চেষ্টা করছে।

পদ্মিনী বলল, পারব না আমি। পারলে তুমিই খুলে নাও। আমার হাত কাঁপছে। আমি পারব না।

রুস্তম ঠোঁট দিয়ে বিড়ি চেপে রেখেই এগোল। তারপর বলল, নে লম্ফটা তুলে ধর, আমিই খুলছি।

পদ্মিনী আলো ধরল। রুস্তম ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মলটাকে দেখল, তারপর এক সময় রুপোরই একটা চোরা কবজা খুঁজে পেয়ে বলল, এই নে, এই যে কবজা। মল দুটোকে খুলে আনল রুস্তম। তাবপর উঠে এসে গলুইয়ে বসল। ব্যস সব ঝামেলা চুকে গেল।

পদ্মিনী তখনো আলো হাতে। আলোটা হাতের [illegible] অসম্ভব রকম কাঁপছিল, ধীরে ধীরে পাটাতনের উপর ওটাকে নামিয়ে রেখে বলল, এবার ওটাকে ফেলে দাও। দোহাই তোমার।

রুস্তম বলল, কাপড়টা ? কাপড়টা রয়ে গেল যে।

পদ্মিনী দৃঢ় গলায় ধমকে উঠল, না। কাপড় চাই না আমি। ও কাপড় আমি পরব না। যেন কাপড় খোলার সঙ্গে সঙ্গে যে কুৎসিত নগ্ন দেহটা রুস্তমের চোখে প্রকাশ হয়ে পড়বে তা সহ্য করতে পারবে না পদ্মিনী। বলল, বেশি লোভ ভাল নয়, এইভাবেই ফেলে দাও।

রুস্তম পদ্মিনীর চোখের দিকে তাকাল। তারপর সেই আলাদীনের দৈত্যের মতই হেসে উঠল। বলল, ডাকাতরা কিন্তু সব সময়ই স্বার্থপর হয় না।

কখনো তারা যার কাছ থেকে কিছু নেয়, তাকে আবার কিছু কিছু ফিরিয়েও দেয়।

পদ্মিনী কৌতুকে তাকাল, কি দেয়?

রুস্তম বলল, যা নিয়েছি তাও ওকে ফিরিয়ে দিতে পারি। মানে হার, দুল, পায়ের মল—সব কিছু। রুস্তমের চোখ রহস্যময়ভাবে কাঁপতে শুরু করল।

পদ্মিনীর হাতের মুঠোয় গয়নাগুলো চকচক করছিল। বুকের ভিতরটা কেমন যেন কঁপে উঠল, মানে? ফিরিয়ে দেবে। তাহলে আর আমাকে দিয়ে এতক্ষণ মরা ঘাটালে কেন। তোমার কোন ভাব বুঝি না আমি।

রুস্তম হেসে বলল, তুই যেগুলো নিয়েছিস ওগুলো নয়। ওগুলোর কোন দামই নেই এর কাছে। যে জিনিসের দাম আছে তেমন জিনিসই ওকে আমরা ফিরিয়ে দেব।

পদ্মিনী কেমন যেন ঝাপসা দেখছিল চারদিক। তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। যাই বল, আমার এসব ভাল লাগছে না কিন্তু। যতক্ষণ এটা চোখের সামনে এভাবে পড়ে থাকবে ততক্ষণ আমার কাঁপুনি থামবে না। তুমি আমার গায়ে হাত দিয়েও দেখতে পারো, আমার ভেতরটা কেমন যেন ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে। আমি যে এখনো বসে আছি এই বেশী।

রুস্তম বলল, আমি সঙ্গে আছি এ কথাটা ভুলে যাস না পদ্মিনী। বয়স হয়েছে, কিন্তু এখনও আমি এই লাস কাঁধে দৌড়তে পারি।

থাক, আর দৌড়তে হবে না। ওটাকে এবার দোহাই তোমার ফেলে দাও।

রুস্তম বলল, দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে আবার ওকে গয়নাগুলো ফিরিয়ে দেই, তারপর। বলা যায় না ফিরিয়ে না দিলে যদি আবার সঙ্গ না ছাড়ে। নে, আলোটাকে ধর।

পদ্মিনীর দেহটা কেমন অবশ হয়ে আসছিল। গয়নাগুলো শাড়ির আঁচলে শক্ত করে বাঁধল পদ্মিনী। তারপর আলোটাকে রুস্তমের দিকে এগিয়ে ধরল।

রুস্তম বিড়ির আগুনটাকে ফুঁ দিয়ে আরো খানিক জ্বালিয়ে নিয়ে বলল, মনে কর এই ওকে দুল পরিয়ে দিচ্ছি—বলতে বলতে জোনাকি পোকার মত ছোট্ট আগুনটা ও মৃতের কানের লতিতে চেপে ধরল।

পদ্মিনী স্তব্ধ হয়ে দেখল।

রুস্তম বলল, এবার ও কানের দুল। বিড়িটাকে আবার আগুনে ফুঁ দিয়ে

জ্বালিয়ে নিল। অপর কানের লতির উপরও একইভাবে আগুনটাকে চেপে ধরে বলল, তুমি যেই হও মেয়ে, তোমার কান থেকে যে দুল খুলে নিয়েছি তা কিন্তু ফিরিয়ে দিলাম। মনে কোন ক্ষোভ রেখ না তুমি।

পদ্মিনী শুধাল, এইভাবে ওর গলার হারও পরাবে নাকি?

গলার হার, পায়েব মল সব কিছু পরিয়ে দেব।

পদ্মিনী উৎসাহ পেয়ে লম্ফটাকে এবার মৃতের বুকের কাছে তুলে আনল। রুস্তম বলল, আর গোটা দুই বিড়ি দে। কুয়াশায় আর ঠাণ্ডায় আগুনটা ঠিক জুত হচ্ছে না।

পদ্মিনী বলল, রোসো একটা ব্যাখাবি ভেঙে দেই। বলতে বলতে ছইয়েব গা থেকে এক টুকরো শুকনো ব্যাখারি ভেঙে আনল ও। এই নাও, এটাকেই ধরিয়ে নাও।

রুস্তম বিড়ির টুকরোটা জলে ফেলে দিয়ে বাঁশের চাঁচটায় আগুন ধরিয়ে নিল। আগুনের ফলকি উডল কয়েক টুকরো। তাবপর এক সময় জলন্ত অঙ্গারের টুকরো দিযে মৃতেব গলায আগুনেব রেখা, হাবেব মত কবে পবিয়ে দিল। মেয়ে, তোমার হাব তোমাকে ফিবিয়ে দিলাম, মনে কোন ক্ষোভ বেখ না।

এইভাবে পায়েব মলও পবান হল।

রুস্তম বলল, ওকে ওর গয়নাগুলো ফিবিযে দিযে আবার আমাদেব পাপ কাটিযে নিলাম পদ্মিনী।

এই রুস্তমই আজ পাপ-পুণ্যের চিন্তা করে। একি সেই যুবক বয়সের রুস্তম নাকি। রুস্তম নিজেই নিজের পবিণতির কথা ভেবে স্তব্ধ হয়ে যায়। অথচ এটাই বুঝি নিয়ম। তুমি কোন দলে থাকতে চাও রুস্তম? ধ অধর্মের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে বাতাসে। তোমাকে এখন বাছতেই হবে কোন পথে থাকতে চাও তুমি। আজও যদি পাপ-পুণ্যেব বিচারটা তুমি না কর রুস্তম, তোমাব জীবনটাই বুঝি বৃথা গেল।

রুস্তম হয়ত অত কিছু বোঝে না। কিন্তু কি যেন একটা বহুকাল থেকে অপূর্ণ থেকে গিয়েছিল সেটাই পূর্ণ কবার লোভে আজ ও মৃতের দিকে বোধ হয় এমন করে সম্মান দেখাল।

বলল, এবার তাহলে ফেলা যায। ওদিকটা সামলে থাকিস পদ্মিনী এবার ওকে জলের দিকে গড়িয়ে দেই।

পদ্মিনী বলল, রোসো, আমারও একটা কথা মনে এল।

রুস্তম তাকাল। তোর আবার কি কথা? তুই তো বিদেয় করবার জন্যই ব্যস্ত ছিলি।

ছিলাম। কিন্তু, একটা কাজ বাকি থেকে গেল না আমাদের? হ্যাঁ গো এটা হিন্দু, না মুসলমানের মরা?

রুস্তম বলল, মরে যাওয়ার পর আর হিন্দু মুসলমান থাকে না কেউ। সবই যখন ফুরিয়ে গেল, তখন ধর্মটাও আর থাকে কি করে। ওটাও গেছে।

না, তবু বল না। যদি হিন্দু হয়, তাহলে তো ওকে শ্মশানে নিয়ে পোড়ান হত, মুসলমান হলে মাটির নীচে গোর দেওয়া হত।

রুস্তম বলল, মাথায় দুবু দ্ধি চাপছে বুঝি? ওসব পোড়ান বা গোর দেওয়ার কথা ভুলে যা পদ্মিনী। জলেই ওর গতি হবে। আর ঘণ্টা কয়েক পরেই পচতে শুরু করবে। নীচ থেকে মাছের ঝাঁক ঠোকরাবে, আর উপরে শকুন বসে জলের দোলায় দুলতে দুলতে এগিয়ে যাবে। এটাই ওর কপালে ছিল!

পদ্মিনী বলল, আমি ওর মুখে খানিকটা আগুন ছোঁয়াব। ও হিন্দুই হোক্ আর মুসলমানই হোক্, কিছু যায় আসে না আমার।

রুস্তম পদ্মিনীর চোখের দিকে তাকাল। পদ্মিনীর চোখে আলো লেগে অস্বাভাবিক মনে হচ্ছিল ওর। বলল, বেশ তাই দে। ওতে যদি শান্তি হয় তাই কর।

পদ্মিনী ছইয়ের ভিতর থেকে একটা ছেঁড়া মাদুরের অংশবিশেষ নিয়ে এল। তারপর তাই গোল করে হাতে পাকিয়ে ধরল।

রুস্তম লম্ফ এগিয়ে ধরে বলল, নে ধরিয়ে নে। আগুনটা সামলে ধরিস।

পদ্মিনী আগুন ধরিয়ে আগুনের হলকাটা মৃতের মুখের গহ্বরে চেপে ধরল। এইভাবেই তো দিতে হয়, নয় কি?

রুস্তম বলল, দিলেই হল। আগুনটা ওর উপরি পাওনা। কে ভেবেছিল যে ওর মুখেও আগুন পড়বে।

আগুনের খানিকটা গড়িয়ে ওর গলার কাছ নেমে এল। ফুলকি উড়ল খানিকটা, তারপর নিবে গেল।

নিবে যাওয়ার পর সব যেন ফুরিয়ে গেল। যত কিছু বলার ছিল, যত কিছু করার ছিল, সব যেন নিঃশেষ হয়ে গেল।

যদি হিন্দু না হয়ে মুসলমান হয়। পদ্মিনী ভাবল, হোক গে আমাদের যতদূর সাধ্য আমরা তো তা করলাম। এবার ওকে ভাসিয়ে দিতে আর বাধা নেই।

রুস্তম বলল, আর বেশিক্ষণ সঙ্গে রাখা ঠিক নয় পদ্মিনী। ডিঙির ওদিকে ঝুঁক রাখ, আমি এবার ঠেলে দিচ্ছি।

পদ্মিনী আলো হাতে একপাশে সরে এল। রুস্তম তার গামছাটাকে গলার উপর পেঁচিয়ে রেখে মৃতের মাথার দিকটা হেঁচড়ে জলের একধারে নিয়ে এল। তারপর মাজার দিকে একটা গড়ান ধাক্কা মেরে এক হেঁচকায় জলে ফেলে দিল।

কদর্য একটা শব্দ উঠল জলের। জল ছিটল, ছিটে ডিঙির উপরও বেশ খানিকটা লাফিয়ে এল। যেন মৃতদেহটা ডিঙির উপর এতক্ষণ পড়ে থেকে যে ছাপ রেখে গিয়েছিল সেটাকেও মুছে দিয়ে গেল।

ডিঙিটা প্রচণ্ডভাবে একান-ওকান দুলে উঠেছিল। দুলুনি থামতে স্তব্ধ হয়ে বসে পড়ল পদ্মিনী। রুস্তমও বৈঠা হাতে গলুই জুড়ে বসে পড়ল। লম্ফটাকে কুয়াশা এসে ঘিরে ধরেছে। লগিতে উড়ছে পালের মত পদ্মিনীরই একখানা শাড়ি। কুয়াশায় বুঝতে পারল না রুস্তম, পদ্মিনীর চোখে আশঙ্কা কেটে গেছে কিনা। অথচ আর কথা বলতেও ইচ্ছে হচ্ছিল না। শেষবারের মত আর একটা বিড়ি ধরাল রুস্তম। বঙ্গোপসাগরের মুখে সেই নতুন জাগা চরে পৌঁছতে আর কতক্ষণ? এবার শুধু অপেক্ষা করে থাকা।

রুস্তম আকাশের দিকে তাকাল। আকাশে বিন্দু বিন্দু নক্ষত্র ছাড়া কিছু নেই। যেন এই নক্ষত্রের আলোর মত স্তিমিতভাবে কোন দ্যুলোক থেকে দুন্দুভির শব্দ ভেসে আসছিল। তিন কুড়ি বছরের কাছাকাছি এসে রুস্তম এই শব্দটাকে যেন চিনতে শিখেছে আজ। ধর্ম-অধর্মের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে বাতাসে। এখন কেবলই অপেক্ষা করে থাকতে হবে। কেউ হয়ত পথ আগলে দাঁড়াবে, প্রশ্ন করবে, তুমি কোন দলে রুস্তম, কোন দলে?

হয়ত উত্তরটাই মনে মনে সারাক্ষণ খুঁজে বেড়াচ্ছে রুস্তম। আমি কোন দলে, যুদ্ধের কোন সারিতে আমি।

সনাক্তকরণ

তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। দেখলাম, গাড়িটা পীচের রাস্তায় আধ ইঞ্চি গভীর দাগ বসিয়ে দিতে দিতে কিছু দূরে এগিয়ে যাচ্ছে। তারপর লাগাম টানা ঘোড়ার মত হঠাৎ সামনের দু' চাকা শূন্যে তুলে কুর্নিশ করার ঢঙে লাফিয়ে পড়ছে। দেখলাম হাত কয়েক দূরে অদ্ভুত ধরনের কিছু একটা যেন কাতরাচ্ছে। কে হতে পারে? সেই মুখোশ পরা ছেলেটাই কি! পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে কিলবিল করে অদ্ভুত একটা অনুভুতি জাগল আমার। পাথরেব মত স্তব্ধ হয়েই ফুটপাথের উপর আমি দাঁড়িয়ে রইলাম।

কিন্তু ততক্ষণে চারপাশ থেকে ভিড় জমতে শুরু করেছে। যেন এমনধারা একটা দুর্ঘটনার সাক্ষী হওয়ার জন্য এতক্ষণ অনেকেই উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিল। ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার পর উৎসাহে এগিয়ে আসছে। আর এখনও আমার শিরদাঁড়ায় সেই বিচিত্র ধরনের অনুভূতিটা ঝঙ্কার দিয়ে দিয়ে উঠছে। আমি নড়তে পারছিলাম না, ভিড়ের দিকে এগিয়ে গিয়ে, মুখোশ পরা ছেলেটাই চাপা পড়ল কিনা, দেখার শক্তিও আমার ছিল না, পালিয়ে যাব এমন ক্ষমতাও না। অথচ কয়েক বছর আগেও ভীরু ছিলাম না আমি। বরং এমন কোন ঘটনা ঘটলে নেশাখোরের মত আমি ছুটে যেতাম। আমার মনে আছে, রেল-লাইনের ধারে যেখানে বিষ্টু পানওয়ালার বউ দু' টুকরো হয়ে কাটা পড়েছিল সেখানে কেমন হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে গিয়েছিলাম। মাইল কয়েক দূরে গলায় ফাঁস দেওয়া মানুষ দেখবার লোভ আমি দমাতে পারি নি কখনো। মানুষের বিকৃত মৃত্যু দেখা এক ধরনের নেশাই হয়ে গিয়েছিল আমার। দেহ থেকে ধড় আলাদা হয়ে পড়ে আছে, কিংবা ঘরের কড়ি-বরগা থেকে ঝুলে পড়া লোহার মত শক্ত অস্বাভাবিক লাট খাওয়া দেহ অথবা জলে ডুবে ভেপসে ওঠা অথবা আগুনে ঝলসে যাওয়া ভিতরের থকথকে মাংস, কেন জানি না এসব আজকাল এড়িয়ে চলতে পারলেই স্বস্তি পাই।

কিন্তু এমন একটা ঘটনা আজ অকস্মাৎ চোখের উপর ঘটে গেল, আর না দেখে আমার পালিয়ে যাওয়া কি উচিত হবে। ভাবলাম, এগিয়ে যাবার চেষ্টা করি। দেখি। হয়ত দেখব, পীচের রাস্তায় ছড়িয়ে পড়া বিক্ষিপ্ত মাংসের মণ্ডের মধ্যে এখনো সংকোচন প্রসারণ হচ্ছে। হয়ত পাশেই কেউ ফিসফিস করে বলবে, দেখছেন দাদা, কলারবোনটা শাঁক-আলুর মত রক্তহীন সাদা দেখাচ্ছে কেমন। কিংবা ওটা চিনতে পারছেন না, ওটা ওর ইনটেস্টাইন। কচ্ছপের মালসার মত ওর বুকের খাঁচাটা দেখেছেন?

এইসব বীভৎস কথা মনে আসায় আমাব পা কাঁপতে লাগল। ঠিক করলাম, এই মুহূর্তে এখান থেকে আমার পালিয়ে যাওয়াই উচিত। শহরের রাস্তায় এমন তো কত ঘটনাই ঘটে যাচ্ছে। খবরের কাগজে তার বিবৃতি বেরুলেও আমি আর উৎসাহ বোধ করি না আজকাল। অনর্থক স্নায়ুর উপর চাপ সৃষ্টি করা যে বুদ্ধিমানের কাজ নয় এ কথা যে-কোন স্বাভাবিক মানুষই স্বীকার করবে। ফলে উলটো দিকেই হাঁটবার চেষ্টা করলাম আমি। ।কন্তু দু পা না এগোতেই দুর্দান্তভাবে আমার পা ভারী হয়ে জমে এল। মনে হল, এমনভাবে পালিয়ে যাওয়ার পিছনে প্রচণ্ড কাপুরুষতা থাকে। হয়ত কাপুরুষ বলেই আমি কাপুরুষতা গোপন করবার মোহে পড়ে গেলাম। ভিড়ের দিকেই আমি পা বাড়ালাম।

আমার অনুমান মিথ্যে হল না। দেখলাম, থিকথিকে রক্ত মুঠো করে ধরে আছে ছেলেটি। যেন চুপসে যাওয়া বেলুনের পর্দা তার নখের ডগায় জড়িয়ে আছে। আর এই সময়ই বোধ হয় ছেলেটার মুখোশটাকে আমি নিখুঁতভাবে দেখতে পেলাম। দেখলাম, মুখো* একটা হিপোপটেমাস জাতীয় জীবের চিত্র ফুটে আছে। চোয়াল ঝুলে পড়া, ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ, ছুঁচলো এক জোড়া দীর্ঘ দাঁত। অথচ এত বড় সর্বনাশ ঘটে যাওয়ার পরও মুখোশটা মুখ থেকে এতটুকু সরে যায় নি। মুখোশটার জন্য ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল আমার। বললাম, ওটাকে খুলে দিন না। কিন্তু যাকে বললাম, সে একখানা বাজারের থলি হাতে, আমার দিকে তাকাল। যেন বলতে চাইল, খুললেই তো ওর আসল চোখ দুটো বেরিয়ে পড়বে। আসল মুখটা দেখতে চান? হয়ত দেখবেন সজল চোখের মণি দুটো খুলে রেখেছে ছেলেটা। আহা, মুখোশ জিনিসটা এই জন্য আমি এবং রম পছন্দ করি না। মুখোশ পরে স্টেজে অভিনয় করা চলে কিন্তু তাই বলে এইভাবে রাস্তায় বেরুনো! আসলে

কেয়ারলেস বাপ মা বলেই এমন হল। বাবাকে ধরে চাবকানো দরকার। চাবুক চালিয়ে কতকগুলি আইন কানুন শেখানো দরকার কাউকে কাউকে। মুখোশ পরে ছুটোপুটি করার পিছনে এবং এইভাবে রাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটাবার পিছনে ছেলেটার যেন আদৌ কোন দোষ ছিল না। মুখোশের কাগজে নিজের আসল মুখটা ঢেকে রেখে ছেলেটার বাহাদুরি নেবার হক জমে গিয়েছিল যেন। স্টুপিড কোথাকার।

তাই বলে এখানে সবাই এইভাবে শুধু ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে কেন! একটু সার্ভ করা উচিত নয়। ছেলেটা কিন্তু একবারও কাঁদে নি। অবশ্য আপনি হলে আপনিও বোধ হয় কাঁদতেন না। জাস্ট ঐভাবে, হাতের পাঞ্জা উলটো দিকে ঘুরিয়ে, নটিবয় শু-এর মধ্যে হাঁটুর মালাইচাকি প্রেস করে রেড সিগন্যাল দিয়ে বসে থাকতেন। তাই বলে কিছুই করবেন না কেউ! একজন ডাক্তার নেই ধারে কাছে! একটা গাড়ি দাঁড় করান না হয়।

মুখোশটা খুলে দিন না মশাই। অমন হিপোপটেমাস! হেল। আমি এগিয়ে এলাম ছেলেটার দুমড়ে যাওয়া দেহটার কাছে। হাওয়াই চপ্পলের নিচে আঠাল রক্ত কামড়ে বসল। রক্তের উপর পা পড়ায় আবার সেই শিরশিরে অনুভূতিটা আমার সর্বদেহে চলকে উঠল। আমি ভিড়ের জমাট বাঁধা লোকগুলোর দিকে তাকালাম। বুঝতে পারছিলাম না, ওরা আমাকে এইভাবে এগিয়ে যাওয়া সমর্থন করছে কিনা। অথচ এ যেন আমার কর্তব্য। কাপুরুষের কর্তব্যের মতন এগিয়ে এসে অসহায় ভাবে ছেলেটার পকেট থেকে পড়ে যাওয়া মার্বেলগুলি কুড়িয়ে ওর জামার পকেটে ঢুকিয়ে দিলাম। মুখোশটা যেন সেই মুহূর্তে আমাকে ব্যঙ্গ করে উঠল! যেন হাঃ হাঃ, আমি হিপ্পো! চিড়িয়াখানার হিপো, হালুম! সুইডেন বা ঐ ধরনের কোন দেশ থেকে প্রীতি-সম্ভাষণ জানাতে এসেছি। স্টুপিড! আমি ওর মুখোশের দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ গুটিয়ে নিলাম। যেন মুখোশটা খুলে দিলেই সমস্ত নাটকটার এখানে যবনিকা পড়ে যাবে। যেন দেখা যাবে দশ কি বারো বছরের সুন্দর মোমের মত বিশুদ্ধ একখানা মুখ, একজোড়া স্নিগ্ধ ভ্রূ। হয়ত কাজল পরিয়ে দিয়েছিল ওর মা, হয়ত বা দেখা যাবে স্কুলের শেষ ঘণ্টায় মাস্টারের চোখে ফাঁকি দিয়ে এক জোড়া কালির গোঁফ আঁকা, থুতনিতে নূর! কিংবা এমনও হতে পারে যে, বকুলকুঁড়ির মত একজোড়া দাঁত ঠোঁটের উপর যন্ত্রণায় কামড়ে বসে আছে। কত রকম হতে পারে। কত বীভৎস, কত

অস্বাভাবিক। আমি হাত সরিয়ে নিলাম। ওর বুকের কাছে এগিয়ে আনলাম। ওর বুকের স্পন্দন এখনো যেন ধরতে পারছি আমি।

উঠিয়ে আনুন, উঠিয়ে আনুন! এই সুরে, সরে। স্ট্রেট মেডিকেল কলেজে নিয়ে চলুন। এই মশাই, মজা দেখছেন নাকি! সরিয়ে আনুন। ভিড় সরিয়ে একটা ট্যাক্সির দরজা খুলে ধরল দুজন লোক। আমি ওর বুকের কাছ থেকে হাত সরিয়ে ওর কোমরের কাছে রাখবার চেষ্টা করলাম। যেন সমস্ত হাড়টাই ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ডিসলোকেটেড হয়ে যাওয়ায় একটা ভারী অথচ ভিস্তির ব্যাগের মত মেরুদণ্ডহীন মনে হল। ঐভাবেই ওকে আমি জড়িয়ে তুলে ধরলাম। তারপর এগোলাম! এই, এই, সরে দাঁড়ান। হাতটা পড়ে যাচ্ছে; হাতটা তুলে দিন না মশাই। হিপোপটেমাসটা তেমনি ঝুলে পড়া চোয়াল, দাঁত, ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ বড়দিনের প্রীতি-সম্ভাষণ জানাচ্ছে, হাঃ হাঃ হুররে—

সোজা মেডিকেল কলেজ চলুন। বাইরে থেকে কে যেন সজোরে দরজা বন্ধ করে দিল। ড্রাইভার হর্ন দিতে দিতে গাড়ি ছাড়ল। হিপোপটেমাস আমার কোলে। যে হাতটা ঝুলঝুল করে গড়াচ্ছিল সেটাকে আমি উপরে তুলে ওর বুকের কাছে সাঁটিয়ে রাখলাম। হাতের পাঞ্জা পাক খেয়ে উলটো দিকে ঘুরে আছে। কোথায় যেন দেহের মধ্যে ওর রক্ত আটকে ছিল, হঠাৎ ঝরঝর করে নেমে এসে আমার হাঁটু ভিজিয়ে দিতে লাগল। রক্তের উষ্ণতায় আবার আমার মধ্যে সেই বিচিত্র কম্পন শুরু হল। ড্রাইভারজী, আমি অস্ফুট গলায় ডাকলাম। ড্রাইভার পিছনে ফিরে তাকাল। সকল বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে ড্রাইভারজী। ড্রাইভার কাচের শার্সি নামিয়ে দিল। খানিকটা যেন বাইরের বাতাস এবাব ভিতরে আসছে। আমি হিপোপটেমাসের দিকে তাকালাম। বেচারার মুখে সেই একটাই অভিব্যক্তি। সেই অভিব্যক্তিতে মানুষের সঙ্গে পশুর অমিলটা যেন স্পষ্টভাবে ধরা যায়। বিশেষত হিপোর মত বুদ্ধিহীন প্রাণীর সঙ্গে মানুষের। আমি সামনের ঝুলন্ত আয়নায় ড্রাইভারের মুখ দেখতে পেলাম। নির্বিকার মুখ। ড্রাইভারজীও কি এইভাবে আমার মুখ দেখতে পাচ্ছে! আমি আমার মুখটাকে একটু সরিয়ে রাখবার চেষ্টা করলাম। আমার হাঁটুর উপর থেকে টুপটুপ করে রক্ত পড়ছে আমার চপ্পলের উপর। আবার অনেকক্ষণ বিরতির পর আর এক ফোঁটা পড়ল। মনে হল, এই ফোঁটাটায় অদ্ভুত ধরনের কিছু যেন ছিল, রক্তের একটা বিস্বাদময়

গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। আবার পিঠের শিরদাঁড়া আমার শিউরে উঠল। যেন ক্ষুদ্রাকৃতি বিষধর একটা সরীসৃপ আমার পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে যাচ্ছে। চোখ বন্ধ করলাম। নিশ্বাসে রক্তের গন্ধ পাচ্ছি। ঘামের গন্ধ, গেঁজে ওঠা ভ্যাপসান কোন মদের গন্ধ। আমি নিশ্বাস বন্ধ রেখে তীক্ষ্ণতায় নিজেকে সতর্ক রাখবার চেষ্টা করলাম। রক্তের ফোঁটা অত্যন্ত ধীরভাবে তখনও আমার চপ্পলের উপর টোকা মারছে। চপ্পল সরাবার চেষ্টা করে বুঝতে পারলাম, আঠার মত কামড়ে বসে আছে বস্তুটি।

অগত্যা রক্তের বিষয়টা আমি ভুলবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু মুখোশের ব্যাপারটা কিছুতেই স্বস্তি দিচ্ছে না। মুখোশ জিনিসটাকে কোন কালেই আমি বরদাস্ত করি না। করি না, তা সত্ত্বেও খোকনকে একবার নররাক্ষস গোছের একটা মুখোশ কিনে দিয়েছিলাম। খোকন যা দুরন্ত, ঐভাবে ওকে মুখোশ কিনে দেওয়া উচিত হয় নি আমার। ভগবান না করুন, খোকন যদি এইভাবে মুখোশ পরে পথে এসে ছুটোছুটি করত! যদি এইভাবে ওর হাতের পাঞ্জা উলটে, তলপেটে ওগরান রক্ত ঝরত টুপ টুপ করে—

আমার একমাত্র ছেলে খোকন। আমার মত ব্যর্থ মানুষের একমাত্র সন্তান খোকন। ওকে আমি দু হাতে জড়িয়ে ধরে রক্তের উষ্ণতা অনুভব করার চেষ্টা করি। ওর চোখের গভীরে তাকিয়ে দেখি সার্থক হয়ে ফুটে ওঠবার লক্ষণগুলি, ধরা পড়ছে কিনা। কে জানে এই হিপোপটেমাসও কারোও একটিই মাত্র সন্তান কিনা। সেও ওর এই কচি নরম হাত গালের উপর চেপে ধরত কিনা। ড্রাইভারজী, ছেলেটার বাপ-মায়ের কোন পাত্তা নিলাম না, থানা থেকেও যদি খোঁজখবর শুরু না করে, মুশকিল হয়ে যাবে।

ড্রাইভারজী লাল আলোর সামনে গাড়ি থামিয়ে ফিরে তাকাল। পাথরের মত স্থির চোখ লোকটার। থুতনি পেঁচিয়ে মাথার ঝুঁটি অবধি গোলাপী কাপড়ে ফেট্টি বাঁধা। হয়ত দাড়ি কোঁকড়ান করে নিজেকে আরো সুখী করবার প্রচেষ্টায় আপাতত এটুকু ক্লেশ সহ্য করছে। স্থিরভাবে তাকিয়ে আছে লোকটা। যেন বোঝাতে চাইছে, নসীবের বড় কিছুই নেই দুনিয়াতে।

আমি ঐ স্থির দৃষ্টির কাছে নিজেকে অসহায় বোধ করে হাসলাম। ড্রাইভারজীও হাসল। বলল, মনে হচ্ছে বাবু আপনিও মুখোশ পরে আছেন। আরশিতে দেখুন জী। ঝুলন্ত আয়নাটাকে পুরোপুরি আমার দিকে ঘুরিয়ে দিতে আমি নিজের মুখ দেখবার চেষ্টা করলাম। ঘর্মাক্ত খোসা ছাড়ান আলুর মত

ফ্যাকাশে মুখ। কিন্তু কতখানি অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে এ মুহূর্তে, সবচেয়ে ভাল বুঝতে পারত শেফালি। শেফালি হয়ত এখন দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে মল্লিক-গিন্নীর সঙ্গে সিনেমার টিকিট কাটা নিয়ে একটা শলাপরামর্শ জুড়েছে। শেফালি যদি বিন্দুমাত্র বুঝতে পারত এখন কি গুরু দায়িত্ব নিয়ে আমি হাসপাতালে যাচ্ছি। স্বচক্ষে দেখলেও বিশ্বাস করত না। বলত, তোমার মত বেড়াল-ভেজা লোকের কম্ম নয় ওকে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া। ড্রাইভারজী ওর উপর এতটুকু বিশ্বাস রেখো না। দেখ, টিপ করে এখনই অজ্ঞান হয়ে পড়ে তোমাকে এক বিপদে ফেলবে।

ড্রাইভার সবুজ বাতি পেয়ে আবার গাড়ি স্টার্ট দিল। আর কিছুটা এগোলেই সেণ্ট্রাল এভিন্যু, তারপর সেই প্রাসাদখিলান হাসপাতাল।

ছ সাত বছর আগে আর একবার আমি হাসপাতালে গিয়েছিলাম। পীযূষের জন্য গিয়েছিলাম। পীযূষ আমার মুখোমুখি টেবিলে বসে অনেক দিন একনাগাড়ে ডেসপ্যাচ ক্লার্ক হিসাবে কাজ করেছিল। কী এক দুরারোগ্য রোগে যেন ভুগত পীযূষ। হাসপাতালে ওর দেহটার ওপর কয়েকবার অস্ত্রোপচার হল, তারপর একদিন সকালে অকস্মাৎ শুনতে পেলাম, পীযূষ নেই। যেমনভাবে গাছে গাছে ফুল ফোটে, ডাঁটি ছিড়ে নেবার পর আর থাকে না, তেমনভাবে পীযূষও আর রইল না। কিন্তু তখনও পীযূষের স্মৃতিটা আমাদের মধ্যে জীইয়ে ছিল বলে আমরা কয়েকজন রজনীগন্ধার গুচ্ছ হাতে হাসপাতালে গিয়েছিলাম। রজনীগন্ধা হাতে তুলতে বড় অস্বস্তি হয় আমার। একই ফুল যেমনভাবে মৃতের দেহের উপর ছড়িয়ে দেওয়ার রীতি, সেই একই ফুল কিভাবে মানুষ সানাই বাজান উৎসব-বাড়িতে বয়ে আনে! ভীষণ ট্রেচারাস রজনীগন্ধা। আমি ফুলদানিতে ফুল রাখার ব্যাপারটাকে পুরোপুরি বাড়ি থেকে তুলে দিয়েছি। ফুলের শৌখিনতা মানুষের সাজে না শেফালি, বরং—

সেবার হাসপাতালে আমার ভয়াবহ একটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল। পীযূষের মৃতদেহ সরাতে গিয়ে বুঝতে পারলাম, শুভ্র চাদরের নিচে ওর ক্লিষ্ট দেহটা নিরাবরণ, নগ্ন। কেবিনের কেয়ারটেকার একরাশ বিড়ির ধোঁয়া আমাদের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে বলল, আপনারা সাধারণত মৃত্যু দেখেন না বলে এত সেনসেটিভ। আমরা দেখে দেখে পাথর। ফলে মৃতদেহের অঙ্গবাস যদি কেউ চুরি করে নিয়ে যায়, আমাদের কাছে তার এতটুকু মূল্য নেই।

তার মানে কি বলতে চান আপনি? পীযূষের এক আত্মীয় মারমুখী হয়ে

এগিয়ে এল। লোকটা নির্বিকারভাবেই বলল, কমপ্লেন-বুক আছে, দু কলম লিখে রেখে যান। আমি অবশ্য ধাঙড়দের এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করব। এ ছাড়া আর কিই বা করতে পারি বলুন।

পীযূষের জন্য সে মুহূর্তে আমার ভীষণ ক্ষোভ হয়েছিল। দুঃখ হয়েছিল। হায় পীযূষ! কিন্তু পরে যখন কয়েকবার ব্যাপারটা মনে পড়ত, ভেবে দেখেছি সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই ছিল আবেগ দিয়ে বাঁধা। দুঃখ বা ক্ষোভে আসলে আবেগেরই প্রকাশ। নইলে এমন ঘটনা যদি ওর জীবিতকালে ঘটত, যদি দেখা যেত পীযূষ নামধারী জনৈক যুবকের অঙ্গবাস চুরি হয়ে যাওয়ায় সে নগ্ন, নিরাবরণ, এর চেয়ে কৌতুকের কিছুই ছিল না আমাদের কাছে। আসলে পীযূষ স্মৃতি ছাড়া সে মুহূর্তে আমাদের আর কিছুই সম্বল ছিল না বলে আমরা কাতর হয়েছিলাম।

যেমনভাবে এই হিপোপটেমাস এই মুহূর্তে আমাকে কাতর করে তুলেছে। আমি অনুমানে বুঝবার চেষ্টা করলাম, এখনও কি সেই রক্তেব ফোঁটা আমাব হাওয়াই চপ্পলে টোকা মারছে। না, কোন অনুভূতিই যেন ছিল না আমার। রক্তের ব্যাপারটা এখন আমাব কাছে অনেকখানি স্বাভাবিক। যেমনভাবে আমাদের বেঁচে থাকার প্রক্রিয়ার মধ্যে কোন বৈচিত্র্য থাকে না তেমনি এখন রক্তের টোকায়ও আমার অনুভূতি বিবর্ণ। আমার মনে হল, হয়ত এ ছেলেটাকে নিয়েও হাসপাতালে সেই পীযূষেব মতই কতকগুলি ঘটনা ঘটবে। সেই ঘটনায় আবার আমি ক্ষুব্ধ হব, দুঃখ পাব। চীৎকার কবে কতগুলি নিরর্থক প্রতিবাদ করব। তারপর আবার সেই দিনযাপন। কিন্তু এমন হযত কিছুই হত না, যদি স্মৃতিহীন হতে পারতাম। মানুষের থাকা না-থাকাটা যদি স্মৃতি দিয়ে যাচাই না হত, কত বড় দুঃখের হাত থেকে আমরা বাঁচতে পারতাম। মানুষ কেন স্মৃতিহীন হয়ে জন্মাল না। আমি জানি শেফালি, তুমি এখন আমাকে রিঅ্যাকশনারী বলবে। বলবে, আমি এস্কেপ করতে চাইছি। এই যে এতক্ষণ আমি ছেলেটার মুখোশ সরিয়ে মুখ দেখার চেষ্টা করলাম না, এও আমার এস্কেপ করারই চেষ্টা।

ড্রাইভারজী হঠাৎ গাড়ির ব্রেক কষতে কষতে বলল, বাবুজী, এসে গেছি।

এসে গেছি! দেখলাম সেই পুরনো হাসপাতালের সিঁড়ি। সেই কমলালেবু আঙুরের গুচ্ছ হাতে লোক, সেই রাজহংসীর মত কয়েক জোড়া নার্স। বললাম, ইমার্জেন্সীতে একটু খবর দাও-না ড্রাইভারজী। একটা স্ট্রেচারে অন্তত—

স্ট্রেচার এল, স্ট্রেচারে ওরা বেওয়ারিশ মালের মত হিপোপটেমাসকে তুলে নিল। আমি এগোলাম। কাউণ্টারের সামনে দাঁড়ালাম। আমার কাপড়ে রক্তের চাপ। চিটচিট করছে। আলুর খোসার মত কিছু কিছু রক্ত ছাড়ালাম। আপনাদের বাথরুমটা কোন দিকে স্যার?

কেরানী ভদ্রলোক নির্বিকারভাবে একটা খাতা টেনে নিয়ে আমার চোখের সামনে তুলে ধরল, হাই কাটল। নাম কি বলুন আগে। রক্তটক্ত পরে ধোবেন।

কার নাম? আমি খাতার দুর্বোধ্য দাগগুলির দিকে তাকিয়ে রইলাম।

পেশেন্টের নাম?

নাম কি করে বলব মশাই, স্ট্রীট অ্যাকসিডেন্ট যে।

লোকটা বলার আগেই কি যেন লিখল। আপনার নাম বলুন। নাম আর ঠিকানা।

আমি কেন? আমি জাস্ট ছেলেটাকে কিছু একটা করা দরকার বলেই—

তবু নাম বলতে হবে। পেশেন্ট তো আর নিজে নিজেই আসেন নি।

আমি চারদিকে তাকালাম। হিপোপটেমাসকে স্ট্রেচারে দোলাতে দোলাতে কোথায় যেন চোখের বাইরে নিয়ে গেছে। ড্রাইভারজী পাশে ছিল, বলল, বোলিয়ে না! বলুন, বলুন। আমি শুকনো গলায় আমার নাম আর ঠিকানা আবৃত্তি করলাম। লিখুন, এগারো হরিপদ দত্ত লেন। লিখেছেন? আর কি করতে হবে বলুন। বাথরুমটা একটু আগে পেলে ভাল হত না দাদা।

এখানটায় সই করুন। আর এখানে লিখুন কোথায় অ্যাকসিডেন্ট হল, কখন হল, গাড়ির নম্বরটা জানেন তো তাও লিখে দিন, পুলিসকে আমাদের জানাতে হবে।

ভদ্রলোক বিকেলের জলখাবারের আয়োজন করেছিলেন কিছুক্ষণ আগে। এবার স্বাভাবিকভাবেই একটু ভিতর দিকে সরে বসলেন, তারপর বাটি খুলে—

বললাম, লিখেছি। এবার কি করতে হবে?

আর কিছু নয়। এবার যেতে পারেন। ওই ডান দিকে চলে যান, জল পাবেন। ভাল কথা আপনার ফোন থাকলে নম্বরটা লিখে যেতে পারেন।

আমি মাথা নাড়লাম, নেই। তারপর বিরক্তি দেখিয়ে বাথরুমের দিকে এগোলাম।

যেন এইটুকুই আপাতত কর্তব্য ছিল আমার। আমি হাত ঝেড়ে এখন মুক্ত। এবার আমি বাড়ি যেতে পারি। শেফালির কাছে, খোকনের কাছে।

শেফালিকে আজ এক ফাঁকে সাবধান করে দেব, খবরদার, খোকনকে যেন ভুলেও কোনদিন মুখোশ কিনে দিও না। কিংবা জুতোর দোকানে ঢুকলেই যে খোকনের জন্য একটা মুখোশ নিতে হবে এমনধারা চিন্তাও করো না! মুখোশ বড় খারাপ জিনিস শেফালি, মুখের আসল চেহারা লুকিয়ে চললে অমনই হয়। বিলিভ মি, মুখোশ বড় খারাপ জিনিস।

ড্রাইভারজী বলল, চলুন, আপনাকে এগিয়ে দেই। টালিগঞ্জের দিকেই যাব আমি। আজ গাড়িটাকে সটান গ্যারেজে তুলে দেব।

আমি তাকালাম।

পয়সা লাগবে না চলুন। আমার পাশেই বসুন। ও-পথের প্যাসেঞ্জার পেলে তুলে নেব।

আমি গাড়িতে উঠলাম। সেই রক্তবমনের গন্ধ। ঝাঁজাল। হাসপাতালের বিপুলাকৃতি খিলানগুলি পিছনে পড়ে রইল। বাইরের অশান্ত বাতাস চোখের পাতায় এসে আছড়ে পড়ছে। আমি ক্লান্তিতে চোখ বন্ধ করলাম। ঘাড়টা পিছন দিকে এলিয়ে দিলাম। সামনেই সবুজ বাতি পেয়ে ড্রাইভারজী আরো স্পীডে গাড়ি ছাড়ল।

এতক্ষণও কি ছেলেটার খোঁজ শুরু হয় নি পাড়ায়। কেউ কি এখনো ওর বাবাকে বলে দেয় নি, মুখোশ-পরা একটা দশ বারো বছরের ছেলে লাগাম-ছাড়া এক গাড়ির চাকায় পিষে গেছে। আরো তাড়াতাড়ি কেউ কি খবর দিতে পারে না। ছেলেটা যদি নাই বাঁচে আর। বাঁচলেও পঙ্গু অকর্মণ্য হয়েই বাঁচবে। আহা, এমনভাবে বাঁচা কেন! সামান্য একটু ভুলের জন্য সারাটা জীবন তার মূল্য দেওয়া কেন! বরং ধরা যাক, মৃত্যু এসে ছায়া ফেলল ওর চোখে। তারপর?

তারপর মর্গ। চওড়া টেবিলের ওপর শোয়ানো চাদর-ঢাকা দেহগুলি। কাটা-ছেঁড়া অংশগুলি শেলাই করে জুড়ে রাখা।

হ্যালো, ও মশাই, শুনছেন? ছেলেটাকে তো খুব হাসপাতালে দিয়ে এলেন। এখন নিয়ে আসবে কে? অথবা বললেই হয়, আমরা সৎকার করি। মর্গে আর কতক্ষণ ফেলে রাখা যায়।

ও, তাই বুঝি! ওর বুঝি কাউকেই পাওয়া যায় নি। চলুন তা হলে। আমি কালো রঙের আঁশটে গন্ধওলা পর্দা ঠেলে ভিতরে ঢুকলাম। যেন বহুকালের এই স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডা ঘরে হিপোপটেমাসের মুখোশ-পরা ছেলেটা একমাত্র আমার জন্যই অপেক্ষা করছে।

আমি রক্ষীকে শুধালাম কোথায় ? কোন্ টেবিলে ?

দেখে নিন, তিন-চারটে আছে ওই বয়সের। কোন্‌টা আপনার, দেখে নিন। লোকটা সামনের দাঁত দুটো জিভে তুলে আবার যথাস্থানে বসিয়ে নিল। আমি টেবিলে হাতড়ে হাতড়ে এগোলাম। মুখের কাপড় সরিয়ে সরিয়ে দুটো-একটা মুখ চিনবার চেষ্টা করলাম। কোথায় হে, সেই মুখোশ-পরা মুখটাকে কোথায় রেখেছ ?

লোকটা হাসল। এটা দেখুন তো, চিনতে পারেন কিনা ?

বললাম, না। এ যে নির্মল চোখ! মুখোশ কোথায় ? মুখোশ পরিয়ে দাও, তবে যদি চিনতে পারি।

লোকটা বলল, তা হলে আমি নাচার। অফিসে যান, সাহেবকে বলুন।

আমার কি দৃষ্টিবিভ্রম ঘটল! আশ্চর্য, সামান্য মুখোশের জন্য এই বিভ্রান্তি কি! আমি টেবিলের ধারে ধারে সাদা কাপড়ে ঢাকা দেহগুলির পাশে পাশে ঘুরলাম। কাকে সনাক্ত করব আমি। এখানে সবাই যে অমলিন দেহে শুয়ে আছে। মুখোশ কোথায় ? মুখোশ ছাড়া কিভাবে আমি সনাক্ত করি। সেই হিপোপটেমাসের মুখটি এখন কোথায়! সেই ঝুলে-পড়া চোয়াল, দাঁত, ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ। সব বাজি জেতার মত সেই নির্বিকার দম্ভ এখন কোথায় ?

হঠাৎ আমার চেতনা ফিরল। তাকিয়ে দেখি, টালিগঞ্জের উপব দিয়েই চলেছি।

ড্রাইভারজী, থামাও, থামাও। এইখানেই আমায় নামিয়ে দাও।

গাড়িব গতি থেমে এল। আমি দরজা ঠেলে বাইরে এলাম। তারপব ঝুঁকে বললাম, কাজটা কিন্তু ভাল হল না ড্রাইভারজী। ছেলেটার মুখোশ একবার খুলে দেখাই উচিত ছিল আমাদের। আসল মুখটা কোনদিনই হয়ত চিনতে পারব না।

আপনি বড় থকে গেছেন বাবুজী। ঘবে যান, বিশ্রাম করুন। পিছন থেকে আর একটা গাড়ি অনেকক্ষণ হর্ন বাজাচ্ছে দেখে ড্রাইভারজী বিদায় নিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল।

এমন সময় আমি বুঝতে পারছিলাম না, আমার চারপাশে যারা চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে তারা সকলেই মুখোশ পরে আছে কিনা। কেমনভাবে কাকে আমি সনাক্ত করি। যদি সত্যি সত্যি কোনদিন মর্গে গিয়ে কাউকে সনাক্তকরণের প্রয়োজন হয়, আমি কেবল টেবিলে সাজান মৃতদেহগুলির পাশে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া আর কিই বা করতে পারি।

সহবাস

কয়েকদিনের মধ্যেই সাপের আঘাতে দু'জনের মৃত্যু হল। এ অঞ্চলে সাপের বড় উপদ্রব। সাপ এমন এক নিয়তি যার প্রতি সাবধান হওয়া মনের এক সান্ত্বনা ছাড়া কিছুই নয়। আমি সাবধানতার জন্য আমার তাঁবুর চারপাশে কার্বলিক অ্যাসিড, ডি ডি টি প্রভৃতি যথেষ্ট ভাবেই ছড়িয়ে দিয়েছিলাম। ছয় ব্যাটারীর বড় একটা টর্চ ছিল আমার সঙ্গে। টর্চটা লাঠির মত সারাক্ষণ আমার হাতে থাকত। ঝোপ জঙ্গলে হাঁটবার সময় আমি গামবুট ব্যবহার করতাম। ভারী পায়ে হাঁটতে আমার কষ্ট হত। কিন্তু বড় রকমের একটা কষ্টকে এড়াবার জন্য এটুকু আমি সহ্য করে নিয়েছিলাম। এ ছাড়া সন্ধ্যার পর তাঁবুতে বসে কখনই আমি ট্রানজিস্টার খুলে গান শুনবার চেষ্টা করি না। আমার একটা সন্দিগ্ধ ধারণা ছিল, সাপ গান শুনতে ভালবাসে। বিশেষ করে বাঁশির সুরে সে মোহিত হয়। আমি সাপুড়ে দেখেছি, তারা লাউবাঁশি বাজিয়ে সাপকে বশে রাখে।

কিন্তু এ-ব্যাপারে কে যেন আমার ভুল ভেঙে দেবার চেষ্টা করেছিল। সে বলেছিল, ব্যাপারটার মধ্যে সাপুড়েদের চালাকি আছে। আসলে সাপের কোন শ্রবণ ইন্দ্রিয়ই নেই। আমার মনে পড়ছে, পরিবর্তে তাঁকে একটা কাহিনী শুনিয়েছিলাম আমি। আমারই ব্যক্তিগত জীবনের একটা ঘটনা। বছর দশেক আগে, আমি আর হিরণ্ময় একবার খালের ভিতর দিয়ে ডিঙি বেয়ে আসছিলাম। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। হিরু বাঁশি বাজাচ্ছিল, আমি অলসভাবে দাঁড় বাইছিলাম। আমরা দু'জনে দু' গলুইয়ে বসেছিলাম বলে পরস্পরের মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম। খালের জল যেন কালো আলকাতরার মত জমাট বেঁধে গিয়েছিল। সেই জলে ডিঙি গুরু ধীরে ধীরে এগোচ্ছিল। হঠাৎ আমার সমস্ত শিথিল ইন্দ্রিয় যেন চকিতে সতর্ক হয়ে জেগে উঠল। আমি আঁতকে উঠলাম। দেখলাম, হলুদ চক্র কাটা একটা চন্দ্রবোড়া পাটাতনের মাঝখানে বিড়ে পাকিয়ে বসে আছে। পদ্মফুলের ভাঁটির মত সতেজ একটা অংশ বিড়ের মাঝখান থেকে উঠে ফণা ধরে

আছে। অত্যন্ত তন্ময় সে। হয়ত বাঁশির সুরেই ওর অমন তন্ময়তা। আমি হিরুর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। মনে হল হিরুও খানিকটা বিচলিত হয়ে উঠেছে, কিন্তু মুহূর্তেই ও সামলে উঠল। ইঙ্গিতে আমাকে দাঁড় বেয়ে যেতে বলে সে আগের মতই বাঁশি বাজাতে লাগল। ইচ্ছে করলেই এ সময় আমি সাপটাকে বৈঠা দিয়ে আঘাত করতে পারতাম। কিন্তু হিরুই আমাকে বারণ করল। সাপ বড প্রতিশোধ-প্রিয় প্রাণী। একবার আঘাত পেলে পালটা আঘাত সে দেবেই।

ফলে বৈঠাটাকে জল থেকে আমি উপবে তুলি নি সেদিন। অত্যন্ত সন্তর্পণে ডাঙ্গার কাছে আসতেই আমরা দু'জনে ডিঙি থেকে লাফিয়ে বাঁচলাম। এমন ঘটনার পব সাপের শ্রবণ ইন্দ্রিয় না থাকার কথা কে বিশ্বাস করতে পারে। আমি এই ভয়েই সন্ধ্যার পর কখনো রেডিও খুলি না।

স্বভাবতই আমাব মত লোকের পক্ষে যত বকম ভাবে সাবধানতা গ্রহণ করা সম্ভব সব আমি কবেছিলাম। তবু কখনো কখনো আমার বেহুলা লখীন্দরের গল্পটি মনে পডে যেত। লোহার বাসরে থেকেও লখীন্দর নিয়তিকে এড়াতে পারে নি। সাপ এমন এক নিয়তি।

যাই হোক, দিন দশেক হল তাঁবুতে এসেছি আমি, চতুর্দিকে জঙ্গল, পশ্চিমদিকের জঙ্গল গ্রামের সঙ্গে মিশে গেছে। ফলে আপাতভাবে গ্রামটাকেও একটা জঙ্গল বলেই ভুল্ হয়। বাঁশঝাড়, বকুল, জিওল, তেলাকুচার ফাঁকে ফাঁকে দুটো একটা কুঁড়েঘর। লাউমাচা, ঝিঙেমাচা। মাচা দেখলেই কেমন একটা কৌতূহল যেন আমাকে পেয়ে বসে। হয়ত অতিরিক্ত সর্পভীতিই এর কারণ। কিন্তু লগ্‌গুলি যখন বাতাসে দোল খায় তখন মনে হয় যেন বা একটা তেজিয়ান সাপ চকিতেই আমার চোখের আড়ালে চলে যাবার জন্যে পাতাব সঙ্গে মিশে গেল। ফলে আমি কখনো ভুলেও লাউমাচার কাছাকাছি এগোই না।

আমি জানি, আমার এই আচরণের জন্য আমার সঙ্গীরা হয়ত গোপনে আমাকে নিয়ে আলোচনা করে। সঙ্গী বলতে একজন আমার পিওন—গুণধর। অন্যজন এক নেপালী দারোয়ান—বাহাদুর। বাহাদুর আমাদের দেহরক্ষী। বন্দুকটি ওর হেফাজতেই থাকত। আমি তেমন চৌকস গানার হলে ও যন্ত্রটা আমার কাছেই রাখতাম। সে সুযোগ না থাকলেও আমি লক্ষ্য করেছিলাম প্রভুভক্ত কুকুরের মত বাহাদুর আমাকে সারাক্ষণ নজরে নজরে রাখত। অনেক

রাত্রি অবধি জেগে থেকে আমাকে পাহারা দিত। কিন্তু এত সত্ত্বেও সাপে কাটা মৃত্যু দেখে আমার পুরুষত্ব কোথায় যেন উবে গিয়েছিল। আমি ভীষণ ক্লান্ত বোধ করছিলাম দিনগুলি।

অথচ আমাব কোন উপায ছিল না। এই রকম জল জঙ্গল ঝোঁপঝাড়ে ঘুরে বেডানই চাকরি আমাব। জঙ্গলে ঘুরে বেডাতে হয় বলে তাঁবু আমাদের সব সময়ই সঙ্গে সঙ্গে রাখতে হয। এ যাত্রায় আমরা কেবলমাত্র একজোডা তাঁবু পেতেছি। একটি আমার জন্য, অপরটি ওদের দু'জনের জন্য। গ্রামেব লোকেরা এ ব্যাপারে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য কবেছিল। ওবা আমাকে গ্রামেব পরিত্যক্ত কাছারী বাডিটা ব্যবহার করবাব জন্য উপদেশ দিয়েছিল প্রথমে। আমবা যথাসময়ে গৃহপ্রবেশও করেছিলাম। কিন্তু গুণধবই আবিষ্কাব করল সেই অভাবনীয দৃশ্যটি। আমি চমকে উঠে দেখলাম ঘরেব বাতায় আড়াআড়ি-ভাবে দডিব মত একটা সাপ ঝুলে আছে। আপাতভাবে ওটাকে একটা বাঁশ বলে ভুল হওযা অসম্ভব নয। আমি সেই ভুলই কবেছিলাম। কিন্তু স্থানীয় লোকেরা আমাদের অভয দিয়ে বলল, 'ওটা বাস্তু সাপ। এখানে প্রায বাডিতেই অমন থাকে। এ সাপ গৃহস্থেব কোন অমঙ্গল কবে না।'

আমি লক্ষ্য করলাম খডেব ছাউনিব নীচে কোণেব দিকে একটা পাখি চড়ুইযেব বাসাও আছে। হযত পাখির লোভেই বাস্তু সাপ ঘবের বাতায আস্তানা গেডেছে। তা যে জন্যেই হোক এ ঘরে বসবাস করা অসম্ভব। আমি বললাম, 'হয সাপটাকে বাইবে আনো, মেরে ফেল, নয় ফাঁকা মাঠের দিকে তাঁবু খাটাও।' গ্রামের কেউ কেউ আমাব আতঙ্কগ্রস্ত চেহারা দেখে মুখ টিপে হাসলেও আমি মান অপমানের কথা ভুলে গিযে বাহাদুরকে বন্দুক আনতে বললাম। ওটাকে গুলি করব।

কিন্তু ওরা আমাকে বাধা দিল। ঘবের মধ্যে গুলি ছুঁডলে খডেব চালে আগুন লেগে যেতে পারে বলে ওরা আমাকে ভয দেখাল।

'তা হলে কি এখানে থেকে প্রাণ দেব বলতে চাও?' আমি প্রায় বিকৃত গলায় ধমকে উঠলাম।

ওরা বলল, 'তা হলে হুজুর, বৈদ্যনাথ ওঝাকে ডাকা হোক। সাপের লেজ ধরে হিড হিড় করে টেনে নামাক।'

আমি অসম্মতি দেখাই নি বলে বৈদ্যনাথ এল। ঘরের দরজা ঝাঁপ বন্ধ করে ধূপধুনো জ্বালিয়ে কি কৌশল করল কে জানে হাঁপাতে হাঁপাতে একটা প্রকাণ্ড

সাপ সে বাইরে নিয়ে এল। তারপর আমার সামনে ছুটে এসে মাথাটাকে মুঠোয় ধরে লেজের উপর পায়ের চাড় দিয়ে টান টান করে টেনে ধরল। বলল, 'বুঝলেন বাবুসাব, এটা নির্জলা মাদী। মরদটা হয়ত ধারে কাছেই কোথাও গা লুকিয়ে রয়েছে। হদিশ পেলাম না।'

'তা হলে তো সোনায় সোহাগা হয়েছে।' আমার সারা গা সিরসির করছিল। নাভিকুণ্ডের কাছে আশ্চর্য এক অনুভূতি মোচড় দিয়ে উঠছিল। বললাম, 'চুলোয় যাক তোমাদের কাছারী বাড়ি। এ ঘরে আমার থাকা হবে না।' গুণধরকে ফাঁকা মাঠে তাঁবু খাটাতে আদেশ করলাম আমি।

আমি সেই থেকে তাঁবুতেই আছি। রাতে নিজের হাতে বিছানার চারিদিকে মশারী গুঁজে দেই ভাল করে। বালিশেব কাছে টর্চ রাখি। সকালে চারিদিক ফর্সা হলে বিছানা ছাড়ি। ভাল করে জামা গেঞ্জি ঝেরে নিয়ে গায়ে পরি।

এ ব্যাপারে আমাদের অফিসের এক ভদ্রলোকেব মুখে একটা ঘটনা শুনেছিলাম। তিনি তখন সুন্দরবনের দিকে পোস্টিং হয়েছিলেন। শীতকাল। এ সময়ে ক্বচিৎ কদাচিৎ সাপ চোখে পড়ে। তবু তিনি সারাক্ষণ সুন্দরবন আর সাপের কথাটা মনে রেখেছিলেন। একদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে ব্রাকেট থেকে জামা টেনে নিয়ে মাথার উপর দিয়ে গলিয়ে দিতেই আঁতকে শিউরে উঠলেন। কি যেন একটা জামার ভিতর থেকে বেবিয়ে এসে বুকের উপর দিয়ে গা রগড়াতে রগড়াতে বিদ্যুতের মত নিচে নেমে গেল। তাকিয়ে দেখলেন, সাপ। বলা বাহুল্য ভদ্রলোক যেন পুনর্জ·ন ফিবে পেলেন। সাপটা বোধ হয় শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচবার জন্যই জামার মধ্যে আশ্রয় নিয়ে বসেছিল।

এখন অবশ্য শীতকাল নয়। তবু আমি সতর্কতার জন্য জামা গেঞ্জি এমন কি তোয়ালে অবধি দু'একবাব না ঝেড়ে ব্যবহার করি না।

এতভাবে সাবধান থাকা সত্বেও প্রতি মুহূর্তেই আমার মনে হয়, হয়ত সতেজ পদ্মফুলের ডাঁটির মত কোন এক বিষধর সাপ আমার তাঁবুর কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে আছে। কেবল হয়ত তেমন একটি সুযোগের জন্য অপেক্ষা। আমি গুণধরকে দিয়ে লাইন বাক্স আরও চেনের বাক্স না বইয়ে দিন কয়েক ধরে আশেপাশের সমস্ত গর্তগুলি বুজিয়ে দেবার কাজে লাগিয়েছিলাম।

কিন্তু এর মধ্যে পর পর দু'জন লোককে সাপে কাটল এবং দুটো মৃত্যু সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্ক আমাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলল। আমার বদ্ধমূল ধারণা হচ্ছিল, অতঃপর সর্পাঘাতে তৃতীয় যে ব্যক্তিটি নিহত হবে সে হচ্ছি আমি। কিছুতেই আমি এই ধরনের একটা দুশ্চিন্তা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারছিলাম না।

সাপে কাটার প্রথম ঘটনাটি ঘটল বড় সড়কের উপর একেবারে দিনের আলোয়। একজন রেলওয়ে পয়েন্টসম্যান দিনকয়েকের ছুটিতে গ্রামে এসেছিল। সঙ্গে এনেছিল নববিবাহিত স্ত্রীর জন্য কিছু কিছু সুগন্ধী প্রসাধনী, আর কিছু রোমান্স। ঘটনার দিন সে ভিন গায়ে মুরগীর খোঁজে বেরিয়েছিল। পথে সড়কের উপর সাপের ছোবল। ইস্—ছুটতে ছুটতে সে বাড়ির দরজায় এসে স্ত্রীর নাম ধরে চেঁচাতে চেঁচাতে এলিয়ে পড়ল। ব্যস।

বৈদ্যনাপ ওঝাকে ঝাড়ফুঁক করতে দেখা গেল। বেহুলার নাম ধরে সংকীতন। আমি জানতাম ও সব স্রেফ ভুয়ো ব্যাপার। সময় মত ডোর বাঁধলে, মুরগী লাগালে হয়ত বা বেঁচে যেত বেচারা।

আমি সেই রাতেই গুণধর আর বাহাদুরকে ডেকে সাপে কাটার প্রাথমিক চিকিৎসার কথা ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম ডোর বাঁধতে হয়। ব্লেড দিয়ে চিরে দিয়ে টিপে টিপে রক্ত বাব কবতে হয়। ডাক্তার না এলে বাঁধন খুলতে নেই। সাপের বিষে নেশা হয়। মাতালের মত রুগী তখন টলতে থাকে। তাকে জাগিয়ে রাখতে হয়। দরকার হলে চড় লাথি কিল। রুগী একবার ঘুমিয়ে পডলেই বুঝতে হবে বিষ তার সারা দেহে ঘুরতে ঘুরতে মাথায় এসে জমে গেছে। কক্ষনো তা হতে দেওয়া উচিত নয়।

আশ্চর্য আমি বলছিলাম; যেন আমাকেই দু'একদিন পর সাপে কাটলে এই ধরনের প্রতিষেধক নিতে হবে। যেন কোন এক বিচক্ষণ ব্যক্তি মরবাব আগেই তাঁর মৃত্যুস্তম্ভ তৈরি করার নির্দেশ দিচ্ছেন। কথাটা মনে আসতেই আরো কেমন বিপন্ন মনে হল নিজেকে।

যাই হোক, সাপে কাটার দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটেছে গতকাল। এক অশীতিপর বৃদ্ধাকে সাপে ছুঁয়েছে। লাঠি ঠুকে ঠুকে সে বনের কাঠকুটো যোগাড়ে গিয়েছিল। সেখানেই সে ঢলে পড়ে থাকে। হয়ত সে বৃদ্ধা সংসারের জঞ্জাল বলেই বৈদ্যনাথ ওঝাকে লাগাবার দরকার মনে করে নি তার ছেলেরা। মরা কাঁধে বয়ে পাঁচ ক্রোশ দূরের নদীতে লাস ভাসিয়ে দিয়ে ওরা

চলে আসে। ফিরে এসে বুড়ির বড় ছেলে দেখে গোয়াল ঘরে গাই বাঁধা নেই। শুধু, তাই নয়, গরুটা ধারে কাছে কোথাও নেই। চড়াৎ করে মাথায় যেন রক্ত চড়ল। শালা—গাইয়ের নাম ধরে চিৎকার করে ডাকতে ডাকতে লোকটা জোড়া বাঁশঝাড়ের পাশে এসে দেখে গরুটা পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে। আর ওর পা জাড়িয়ে লতার মত একটা সাপ বাটে মুখ লাগিয়ে দুধ চুষছে।

লোকটা একটা লাঠি কুড়িয়ে নিয়ে তৈরি হল। 'শালা' তুই না সকালে মাকে খেয়েছিস? অবশ্য ও জানত বাট থেকে দুধ চুষে খায় যে সাপ সে সাপের বিষ থাকে না। তবু দুধ চুরি করার দৃশ্য দেখে পাগলের মত ও ক্ষেপে উঠল। 'শালা' সকাল বেলা মাকে খেয়ে আশ মেটে নি তোর? আবার দুধ চুরি করে খেতে এসেছিস। হয় আজ এসপার হবে নয় ওসপার। ক্রোধে মানুষের দিশেজ্ঞান হারিয়ে যায়। লোকটা যখন মরা থেতলানো সাপ মাথার উপর দিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে বাড়ি এল তখন সে মাতালের মত টলছে। তার কব্জির উপর জোড়া দাঁতের চিহ্ন দেখে বুঝবার উপায় ছিল না তখন ঐটুকু ক্ষত থেকেই পচন শুরু হতে পারে দেহে। পরমায়ু থাকলে হয়ত বা এ বেচারা বেঁচে যাবে। ভিন গা থেকে ডাক্তার ধরে আনবার উপদেশ আমিই ওদের দিয়ে এসেছিলাম। জানি না আমার কথা কতখানি ওরা গ্রাহ্য করবে।

এইভাবে গতকাল সারাটা রাত আমার প্রচণ্ড এক উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে কেটে গেছে। সারাটা রাত এত বেশি স্পর্শকাতর ছিলাম আমি যে পাতার শব্দেও চমকে চমকে উঠেছি। বাতাসে কপালের উপর চুল উড়ে এলেও মনে হয়েছে সাপ। গভীর রাতে জঙ্গলের পাখি যখন কর্কশভাবে চিৎকার করে উঠেছে তখন আমি দুঃস্বপ্ন দেখার মত আর্তভাবে ডুকরে উঠেছি।

আজ আবার আর একটা রাত্রি এল। সমস্ত আতঙ্ক যেন রাত্রির জন্য জমা হয়েছিল। আমি সতর্ক হয়ে উঠলাম। খাওয়া দাওয়ার পাঠ চুকিয়ে মশারীর মধ্যে ঢুকে চারপাশ ভাল করে গুঁজে দিতে দিতে গুণধরকে ডাকলাম।

গুণধর কাছে এল। তাঁবুতে ঢুকল।

'খাওয়া হয়েছে তোদের?' আমি স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে প্রশ্ন করলাম। 'বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে যা। লণ্ঠন ছাড়া বাইরে বেরিয়েছিস কেন?'

গুণধর নিঃশব্দে বাতি নিবিয়ে দিয়ে একটা ছায়ামূর্তির মত তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল।

একটু একটু বাতাস বইছিল। পর্দার কাপড়টা একটু একটু দুলছিল। বাইরে একটা শুকনো গাছের গুঁড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগুন তেমন জোরালো না হলেও খানিকটা লাল আভা ছলকে ছলকে তাঁবুর মধ্যে আছড়ে আসছে। বাঁ পাশে গুণধরদের তাঁবু, বিছানায় শুয়ে ঠিক নজরে আসছে না। অনেকক্ষণ ধরে শুয়ে শুয়ে পর্দা নড়া দেখছিলাম আমি।

বাইরে একটানা ঝিল্লিরব। দূরে সড়ক ধরে বোধ হয় কোন ভারি লরি চলে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরে উৎকর্ণ হয়ে আমি শব্দ শুনলাম। অফিস ডাইরীটার কথা মনে পড়ল। কালো ডাইরী খাতাটা টেবিলের উপর পড়ে আছে। ওটাকে সাবধানে রাখা উচিত ছিল। উপরআলা হঠাৎ একদিন চলে এলে দেখবে ডাইরীর পাতা একদম ফাঁকা। কৈফিয়ত চাইবে। চুলোয় যাক। আমি ঘুমোবার চেষ্টা করলাম।

কিন্তু ঘুমোতে চাইলেই ঘুমোন যায় না। প্রতিদিনই এমন হচ্ছে। কখনো কখনো পর্দা নড়ার শব্দে অহেতুক আমি চমকে উঠি। কিন্তু আজ আমার চমকে উঠার পিছনে নির্দিষ্ট একটা কারণ ছিল। কটকট করে তাঁবুর ভিতরেই কি যেন একটা ডাকছে। কি ডাকছে? ব্যাঙ। আমি সঙ্গে সঙ্গে আঁৎকে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'গুণধর।'

গুণধর আবার লণ্ঠন হাতে তাঁবুতে ঢুকল।

'দেখ তো গুণধর ঐ কোণের দিকে ব্যাঙ ঢুকেছে কিনা? মনে হল ব্যাঙ ডাকছে।'

গুণধর হ্যাট হ্যাট করে মাটিতে চাপড়া মারল কয়েকবার! 'না বাবু কিছু নয়, কিছু নেই।'

'তবে কে ডাকল শুনি?' আমি বিরক্ত হলাম ওর ওপর। তবু সহজ গলায় বললাম, 'একটু ভাল করে দেখ না বাবা, বিদেশ বিভুঁইয়ে কি শেষটায় প্রাণ দেব।'

গুণধর ক্যাম্প খাটের নিচে টেবিলের তলায়, সুটকেসের পিছনে, চারদিকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে আবার বিদায় নিল। আবার সেই বাইরের আগুনের আভা। একটা যেন আগুনের ফুল উড়তে উড়তে ভিতরে এল। না, জোনাকি ওটা। মশারীর গায় নীলাভ শীতল আগুন ছুঁইয়ে দিয়ে জোনাকিটা বসে পড়ল।

আমার সমস্ত দৃষ্টি এখন জোনাকির দিকে। আগুনের ফুল জ্বলছে, নিবছে। আশ্চর্য, শেষ পর্যন্ত একটা জোনাকিই কখন যেন আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল।

গম্ভীর রাতে সমস্ত চরাচর যখন নিস্তব্ধ তখন আমাকে নিশিতে পেল। আমি না ঘুমে না জাগরণে। আমি ঘুম থেকে জাগরণে, জাগরণ থেকে ঘুমে অনেকক্ষণ ধরে দুলতে দুলতে এক সময় সতর্কভাবে কি একটা কুৎসিত স্পর্শ অনুভব করলাম। আঁতকে উঠলাম। কিছু একটা শীতল সরীসৃপের মত মস্ত, আমার উরু বেয়ে উপরদিকে উঠে আসছে। ক্ষণিকেই আমি বস্তুটাকে চিনতে পারলাম। সাপ। একটা সাপ আমার দেহলগ্ন হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু আকারে তেমন দীর্ঘ বলে মনে হল না ওকে। আমি জানি, সাপের ব্যাপারে বড় অথবা ছোট কিছুই যায় আসে না। ফলে মুহূর্তেই আমার সর্বাঙ্গে এক অবর্ণনীয় অনুভূতি খেলে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে আমি স্থিতধী করবার চেষ্টা কবে কাঠের মত অনড় হয়ে পড়ে রইলাম। এ ছাড়া আমার আর দ্বিতীয় কোন গতি নেই। কারণ এক ঝটকায় আমি লাফিয়ে উঠলেও মশারির মধ্যে জড়িয়ে যাব। যদি অতর্কিতে সাপটাকে চেপে ধরি তা হলেও ওটা আমার কঠোর মুঠোর ভিতব থেকে পিছলে বেরিয়ে আসবে। সঙ্গে সঙ্গে পিচ্ছিলতাব একটা সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবেই আমার মনে পড়ছিল। ফলে মরার মত ভান করে পড়ে থাকা ছাড়া আর আমি কিছুই ভাবতে পারছিলাম না এখন। আমার বিবেক বুদ্ধি সব যেন মুহূর্তেই লোপ পেয়ে গেছে। আমি কেবল চোখ বুজে অনুভবেই সাপেব গতিবিধির দিকে নজর রাখতে লাগলাম।

মনে হচ্ছে ওটা এখন উরুর উপর দিয়ে ধীবে ধীরে এগিয়ে আমার পেটের দিকে আসছে। আমি স্পষ্ট অনুভব কবতে পারছিলাম প্রথমে ও সমস্ত দৈর্ঘ্যটাকে কুঁচকে ছোট করে সামনের দিকটা প্রসারিত কবে এগিয়ে আসছে। অনেকটা ঠিক কেঁচোর বুকে হাঁটার পদ্ধতির মত। ইচ্ছে থাকলেও আমার চোখের পাতা খোলার মত সাহস হল না। মনে হল চোখ খোলার শব্দও যেন সাপটা শুনতে পাবে। আর সঙ্গে সঙ্গে ফণা তুলে আমার নাভিমূলে দংশন করবে। আমি এমন সাপের সঙ্গে এক জাতীয় সখ্যতা গড়বার চেষ্টা করলাম। আমার দেহের উপর দিয়ে ইচ্ছেমত ওকে বিচরণ করবার অধিকার দিলাম। এ অধিকারে ও আমাকে দংশন করবে না এইটুকুই শুধু প্রার্থনা করছিলাম। ঠিক যেমনভাবে দুর্বল সবলের সঙ্গে সখ্যতা করে, যেমনভাবে মৃত জীবন্তের সঙ্গে সখ্যতা করে তেমনিভাবেই আমি সখ্যতা গড়তে চাইছিলাম।

লক্ষ করলাম, ও তার মাথার দিকটা এপাশে ওপাশে ঘুরিয়ে ঠিক ঠিক করে নিচ্ছে। আমার সমস্ত রোমকূপের ভিতর দিয়ে শীতল একটা স্পর্শ চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঢুকে পড়ছিল। সাপের দেহের রক্তে কি শীতলতা! আমি ছেলেবেলায় কোথায় যেন পড়েছিলাম সাপের দেহে হিমশীতল রক্ত থাকে। এই শীতলতা আমাকে অবশ করে আনছিল।

আমার গায়ে কোন জামা ছিল না। ডোরা কাটা পায়জামা হাঁটুর উপরে এসে গুটিয়ে কুঁচকে আছে। আমার একটা পা বাঁকাভাবে বালিশের উপর অন্য পা সটানভাবে মশারির কোণা ছুঁয়ে আছে। আমার বাঁ হাত বুকের উপর, যেখানে ফুসফুস থাকে; ডান হাতখানা কোথায় রেখেছি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না আমি। এজন্য আমার দুঃখও হল না। মনে হচ্ছিল আমার দেহ থেকে কয়েকটা অঙ্গ কমে গেলে সেই অঙ্গগুলি সাপেরও আওতার বাইরে চলে যেত। আমার বাঁচবার এখন একটাই মাত্র পথ, মনে হচ্ছিল সমস্ত অঙ্গগুলি হারিয়ে যাওয়া। কিন্তু ফুসফুসটার স্পন্দন আমি অনুভব করতে পারছিলাম। মনে হল তলপেটের দিক থেকে সাপটা এখন ক্রমশঃ উপর দিকে উঠে আমার ফুসফুসটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। হ্যাঁ ফুসফুসের দিকেই গতি ওর। বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে জোরে ফুসফুসটাকে টেনে ধরতে ইচ্ছে হল আমার। না না, এখানে নয়, এখানে দংশন করলে আর কোন আশাই থাকবে না আমার। কিন্তু অনেকক্ষণ চেষ্টার পরও আমি আমার বাঁ হাতের আঙুল একটুও নড়াতে পারলাম না। যেন এতটুকু শক্তি নেই আমার। সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি এখন আর আমার ইচ্ছের উপর নির্ভরশীল নয়। এমন অসহায় আমি। মনে হচ্ছিল একটা মেদ মাংসের দেহ ছাড়া আমি আর কিচ্ছু নই। আমি কি তা হলে অনেক আগেই মরে গেছি।

অথচ আমার অনুভব শক্তি প্রচণ্ড মাত্রায় তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছিল। আমি অনুভবে বুঝতে পারছিলাম ও তার সরু চেরা জিবটাকে বার করে ঘামের মধ্যে ভিজিয়ে নিচ্ছে। সরু পলতের মত জিব। যেন জিব দিয়ে ও আমার ঘামের স্বাদ লেহন করছে। মনে হল অনেকক্ষণ ধরে একই জায়গায় জিব বুলাচ্ছে ও। আর একটু এগিয়ে এলেই আমার আঙুলের নিচে ফুসফুসটাকে খুঁজে পাবে। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। শুধু অপেক্ষা ছাড়া আর আমার কিছুই করার ছিল না এ সময়।

আমার ফুসফুসের স্পন্দন এমন ভারি আর দ্রুততর হচ্ছিল যে আমি

স্বাভাবিক হওয়ার কথা কল্পনায়ও ভাবতে পারছিলাম না। অথচ আমার অত্যন্ত স্বাভাবিক হওয়া প্রয়োজন এখন। আমি খুব সন্তর্পণে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস টানতে লাগলাম।

ও আমার দু' আঙুলের ফাঁকে মুখ আনল। মুখ এনে ফুসফুসের উপর জিব বুলিয়ে ঘাম চুষে নিতে লাগল। সাপের ছোঁয়ায় আমার হাতের আঙুল কি কেঁপে উঠেছে। আমি কি এখন মুঠো করে সাপটাকে চেপে ধরব। না না, এখানে নয়, এখানে নয়।

বোধ হয় আমার আকুতি ও শুনতে পেল। আঙুলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসছে ও। আমার কব্জি, আমার বাহু, আমার বাহুর কাছ দিয়ে বুকে হেঁটে বগলের কাছে এসে জড় হতে লাগল। বগলের ঘামে জিব বুলাতে লাগল। অত্যন্ত নিশ্চিন্ত ওর চলাফেরা। তবে কি সত্যি সত্যি আমাকে মৃত বলেই কল্পনা করেছে ও। আমি আরো মৃত, আরো নির্জীব হবার চেষ্টা --রলাম। যেন সেই পঞ্চতন্ত্রের দুই বন্ধু আর ভাল্লুকের গল্পের মত। আমি গাছতলায় শুয়ে। ভাল্লুক আমার সর্বদেহে ঘ্রাণ নিয়ে বুঝবার চেষ্টা করছে আমি জীবিত কি মৃত।

আমার বগলের কাছ থেকে চামড়া ঘষে ঘষে উপর দিকে উঠে এল ও। আমার গলাব কাছে ওব জিবের স্পর্শ পেলাম। আমার শ্বাসনালী খাদ্যনালীর উপর ওর দেহের ভার বিছিয়ে পড়ল। আমার চিবুকের নিচে কয়েকবার মাথাটাকে এ-পাশ ও-পাশ ঘোরাল ও। ঘাড়ের কাছে মুখ ছুঁইয়ে আবার উঠিয়ে নিল। আমার চিবুক বেয়ে দর দব করে ঘা' নামছে এখন। অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘামের স্রোত আমার সারা দেহে। যেন অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাপের সঙ্গে সহবাস করছি আমি। অথচ এইভাবে, একমাত্র বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর আমার কিচ্ছু নেই।

বুঝতে পারছিলাম ও এবার চিবুকের উপর উঠে আসবার চেষ্টা করছে। অনেকখানি উঠে এসে হঠাৎ ও গড়িয়ে পড়ল। ঝ নন করে সর্বদেহে আমার রক্তের একটা ঢেউ খেলে গেল। যেন সেই স্রোতের গমকে আমার সর্বাঙ্গে থরথর করে কাঁপুনি শুরু হল। আতঙ্কে আমি অনুমান করবার চেষ্টা করলাম, এ সময় সাপটা নিশ্চয়ই টের ৫..য় গেছে আমি মৃত নই, জীবিত। ফলে মনে হল বিষধর কালো কুচকুচে সেই সাপ নিশ্চয়ই এতক্ষণে গলার কাছে বিড়ে পাকিয়ে বসে পদ্মর ডাঁটির মত ফণা তুলে ধরেছে। ফণায় হলুদ কয়েকটা

ছিট। চিকন নাতিদীর্ঘ সরীসৃপ ক্রোধে যেন আরো বেশি দৃঢ় লম্বাটে হয়ে উঠেছে। ফণার ভারে মাথাটা একটু একটু দুলছে ওর। যেন সে যে-কোন মুহূর্তেই ঢলে ছোবল মারতে পারে এখন। আমি নিষ্পলক ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে রইলাম। অপেক্ষা। শুধু অপেক্ষা।

এ সময় ফণাটা ওর নেমে এলে নির্ঘাৎ আমার চোখের নিচ স্পর্শ করবে। চোখের নিচে অত্যন্ত নরম চামড়ার উপর বিষ বিছিয়ে দিলে পলকেই আমার সর্বদেহে সেই বিষ ছড়িয়ে যাবে।

আমার আর্তনাদ করে উঠতে ইচ্ছা হল। সবলের কাছে দুর্বলের অসহায় আকুতির মত আর্তনাদ। প্রখর উত্তেজনায় এ সময় আমি আমার চেতনা ছাড়া আর কিছুই উপলব্ধি করতে পারছিলাম না। যেন 'আমি' বলতে শুধু এক চেতনা; দেহহীন চেতনা। রক্ত মাংস মেদ মজ্জা কিচ্ছু নেই আমার। আমার অধীনে, আমার আজ্ঞাবহনকারী কেউ নেই। না হাত, না পা, না আমার দেহের কোন অংশ। এমন অসহায় জীব আমি। তা হলে, কিভাবে এখন সাপটাকে আমি গলার কাছ থেকে নামিয়ে নেব। কি করে এখন ওর সঙ্গে জুঝে উঠে আরো বহুকাল বেঁচে থাকবার চেষ্টা করব। অথচ আমায় বাঁচতেই হবে। কি যেন একটা বড় রকমের প্রয়োজনে আমার বেঁচে থাকার কথা ছিল। কি প্রয়োজন? আমি স্মরণে আনতে পারছিলাম না।

অনেকক্ষণ কেটে গেল। আমি চোখ বুজে অন্তিম সময়ের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। মনে হচ্ছে, আমার সমস্ত দেহের উপর দিয়ে কিলবিল করে সাপের মত ঘাম নামছে এখন। যেন অসংখ্য সাপ আমার দেহের উপর ছড়িয়ে গেছে। গলার কাছে ফণা ধরে থাকা আসল সাপটাকে এখন আর আলাদা ভাবে চিনতে পারছিলাম না আমি।

আরো কিছুক্ষণ কেটে গেলে সহসা আমি মরিয়া হয়ে চোখ খুললাম। কিন্তু কিছুই আমি দেখতে পেলাম না। আমার দৃষ্টিকে অনেকখানি ছড়িয়ে দিলাম, প্রখর করলাম। না, কিছুই আমি দেখছি না। অনেকক্ষণ আমি দেখি নি কিছুই। তারপর ধীরে ধীরে ডুবুরির আলো দেখার মত একটু একটু করে আমার লোমশ বুক, একটা হাত, একটা পা নজরে এল। বিষধর ফণা তুলে ধরা সাপটাকে খুঁজে পেলাম না। না, কোথাও নেই সে। তবে কি ও বিছানার ভাঁজে আশ্রয় নিয়েছে?

আমার গলার নলীটা হঠাৎ দপদপ করে ঝাঁকি খেয়ে দুলে উঠল। আমার

দাঁতের পাটি সিরসির করে কেঁপে উঠল। আমি নিঃশব্দে ঘাড় ঘোরালাম, তুললাম। না, এতটুকু চিহ্ন নেই সাপের। আমার ফুসফুসটা যেন ক্রমশই বড় হচ্ছে। আমি দম চেপেও ওকে স্বাভাবিক করতে পারছিলাম না এখন। আমার ঠোঁট খুলে গেল। মশারির ভিতর বাতাস কি কমে গেছে! আমি হাঁ করে বাতাস টানতে লাগলাম। একটু প্রকৃতিস্থ হতে আমার মনে হল, যেন একটা চাদরের উপর শুয়ে আছি আমি। এ সময় আমি নিজেই আমার ঘামের ঝাঁজালো গন্ধ পাচ্ছিলাম। কিন্তু এখনো সেই ঘুম আর জাগরণের সন্ধিক্ষণের অবশতা আমার সমস্ত দেহের উপর যেন বিরাজ করছিল। আমি পুরোপুরি সক্রিয় হবার চেষ্টা করলাম। আবার সাপটাকে দেখতে পাওয়ার আগেই আমি আমাকে তৈরি রাখবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু সকল চেষ্টাই কেমন যেন বৃথা হয়ে যাচ্ছিল।

অবশেষে ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে গুণধর এল। সে-ই আমাকে পুরোপুরি জাগিয়ে তুলল। আমি বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে হতবিহ্বলভাবে বিছানাব দিকে তাকিয়ে রইলাম।

বিছানা চাদর মশারি তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল এর পর। আমার শীতল টর্চটা ছিটকে মেঝের উপর পড়ে গেল। চাদরে একটা বিকৃত মানুষের ঘামের ছাপ। আমি সেই ছাপটার দিকে হতাশভাবে তাকিয়ে রইলাম। আমি বিশ্বাস কবতে পারছিলাম না ওরকম বিকৃত একটা চেহারা কখনো কোন মানুষের হতে পারে। আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না সারারাত একটা বিষধব সাপের সঙ্গে সহবাস করেও আমি বেঁচে আছি।

জব চার্নকের কলকাতা

গরমে এবং ঘামে সমস্ত শহব গেঁজে উঠেছিল।_ কলকাতা এখন গোটাটাই পিচ-মোড়া। সেই পিচও গলে গলে কেবল ফুটতেই যেটুকু বাকি ছিল। এমন নিদারুণ দগ্ধ দুপুরে কার্জন পার্কের বিপরীত দিকে পিচের বাস্তায একটি ভাসমান নরমুণ্ড পড়ে থাকতে দেখা গেল। দূব থেকে অর্থাৎ মযদানের দিক থেকে মুণ্ডটিকে অর্ধেক কামানো একটি নারকেলের মত মনে হচ্ছিল। অথচ পথচারীদের এর জন্য বিশেষ কোন কৌতুক বা আগ্রহও দেখা যাচ্ছিল না। কলকাতাবাসী মাত্রই এসব ব্যাপারে অতিমাত্রায় নির্বিকাব। কাবণ প্রত্যেকেই জানে, ইদানীং অত্যন্ত শালীনভাবে দুর্গানাম জপতে জপতে ঘর থেকে পথে নামা সহজ, কিন্তু যথাসময়ে আবাব পথ থেকে ঘবে ফিরে আসার মধ্যে সন্দেহ থাকে প্রচুর। ফলে ,অদৃষ্টের হাতে ছেড়ে দিয়ে ঘাড গুঁজে যে যার গন্তব্য-দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

কিন্তু যানবাহনগুলির কথা স্বতন্ত্র। এবা যতদূর সম্ভব মুণ্ডটিকে এড়িয়ে চলবারই চেষ্টা করছিল। ইদানীং এরা প্রত্যেকেই ঘন ঘন ট্র্যাফিক জ্যামের জন্য সন্ত্রস্ত। গত কয়েক বছরের নজির ঘাঁটলেই দেখা যায়, পথ দুর্ঘটনা এবং ট্র্যাফিক জ্যামের হার শতকবা পঞ্চাশ ভাগ বেড়ে গেছে। এখন অত্যন্ত ছোটখাট কাবণেই যে কোন বাস্তায় গাড়ি ঘোড়া চলাচল পুবোপুবি বন্ধ হয়ে যেতে পাবে। এ ব্যাপারে ভুরি ভুরি উদাহরণও দেওয়া যায়। যেমন ধরুন, আপনাদের এই রাধাগোবিন্দ ষ্ট্রীট দিয়ে মডা কাঁধে বেয়ে একদল কীর্তনীয়া মুঠো মুঠো খই আর পয়সা ছডাতে ছডাতে চলেছে। নিমেষের মধ্যে এদেব পিছনে একদল খোসা ছাড়ানো মানুষের ছানা জমে গেল। এদের কোন ভ্রূক্ষেপই নেই, এই রাস্তায় মড়া বয়ে নিযে যাওয়ার মিছিল ছাডাও গাডি ঘোডা চলাচল করে। ফলে ট্র্যাফিক জ্যাম। ঠেলা, প্রাইভেট, রিকশা, লরি, ট্যাক্সি—দেখতে দেখতে উদোর ঘাডে বুধো চেপে বসবে। ব্যস পাক্কা কয়েক ঘণ্টার দিকদারি। কিন্তু এর চেয়েও কত ছোট ছোট কারণে রাস্তাঘাট

কেমন অচল হয় ভাবুন—পথে হাঁটতে হাঁটতে হয়ত কোন্ সজ্জন ব্যক্তির খেয়াল হল, এই যে ফুটপাতের উপর ডাবের খোলাটি পড়ে আছে, এটিকে একটা কিক্ মারলে কেমন হয়। কেমন আবার হবে। সঙ্গে সঙ্গে ডাবটি গড়াতে শুরু করবে। গড়াতে গড়াতে অতর্কিতেই হয়ত কোন এক টাবগাড়ি-অলার পায়ে লাগবে। সঙ্গে সঙ্গে ঠেলাওলা পায়েব উপর ঝুঁকে হাত চাপতে গিয়ে বুঝতে পারবে ময়লা ফেলার টাবগাড়ি থেকে যত রাজ্যের বাবিশ, পাতা, ঘাস, মাছের কাঁটা, ডাল, ছেঁড়া কাঁথা, কাগজ, ঝাঁটা, ফুলের ডাঁটা সব সমেত রাস্তায় ফেলেছে। ব্যস, ট্রাফিক জ্যাম। ট্যাক্সি, ট্রাম, প্রাইভেট, লরি, রিকশা—এক কথায় বুধোর ঘাড়ে উদো।

এই রকম ছোটঘাট হাজারো কারণে ইদানীং এই শহরের সমস্ত পথঘাট সব সময়েই সন্ত্রস্ত বলে সমস্ত গাড়ি ঘোড়াই মুণ্ডুটিকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করছিল। এবং পথচারীবাও বেশীব ভাগই শান্তিপ্রিয় লোক বলে মুণ্ডুটিব জন্য কোন বকম আগ্রহ বা কৌতুক প্রকাশ করছিল না।

এই কাহিনীব যে কেন্দ্রমণি, সেই শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রশান্ত কয়ালও একজন সজ্জন শান্তিপ্রিয় লোক। কিন্তু ভবিতব্য, তার মুণ্ডুটাই আজ এমনভাবে রাস্তার উপবে পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে।

ঘটনাটা একটু খোলসা কবেই বলা যাক। এবং একটু গোড়া থেকেই।

শ্রীযুক্ত ডালহৌসি পাড়ায় কোন এক সওদাগরী অফিসেব হেড পিওন। বয়স অনুমান করে বলা যায় চল্লিশ কিংবা প্রায় চল্লিশ। সেইদিন প্রচণ্ড দুপুবে ক্যান্টিনের বেঞ্চিতে বসে চা খাচ্ছিল প্রশান্ত। শবীরটা বিশেষ সুবিধা'ব নয়, তদুপরি চতুর্দিকে কলেবা। প্রশান্ত লেবু চায়ে জোগাড কবে নিয়েছিল। লেবুর রসের জন্য চায়ের বঙ পুবনো মাংসেব মত মনে হচ্ছিল। অকস্মাৎ ও আঁতকে উঠে লক্ষ করল গেলাসেব কানায আরশোলার পায়ের মত দাঁড়াকাটা কি যেন একটু ঝুলে আছে। প্রথমে ও তেমনভাবে গ্রাহ্য কবল না। এ সমস্ত ছোটখাট দিকে গ্রাহ্য কবলে বা উত্তেজিত হলে বিশেষ কোন ফল হয় না জেনে ও প্রতি ঢোকে এক একবাব করে চোখ বুজে নিতে লাগল।

গ্রাহ্যের মধ্যে না আনাই প্রশান্তের চরিত্রের একটি বিশেষ দিক। ফলে সকলে ওকে শান্তিপ্রিয় লোক বলেই জানে। আট ঘণ্টার চাকুরির প্রায় সবটাই ওর ছাপোষা কেরাণীবাবুদের সাথে কারবার। বাকিটুকু কখন

সখন খোদ সাহেবের কামরায়ও সেলাম ঠুকতে যেতে হয়ে। বড় সাহেব ওকে স্নেহ করেন। জীবনে সততার মূল্যাদি সম্পর্কে উপদেশ দেন। বলেন, জীবন বড়ই বিচিত্র হে প্রশান্ত। লোভ, লালসা, কামনা, বাসনা ইত্যাদির অনলে প্রতিটি লোক তিলে তিলে দগ্ধ হয়। এক্ষেত্রে বাঁচার একমাত্র পথই হচ্ছে সততাকে আঁকড়ে ধরা।

সাহেবের উপদেশ প্রশান্তকে কান পেতে শুনতে হয় বটে কিন্তু ওর ধারণা সততা বা শঠতা আসলে এ দুটো শব্দের কোনই পার্থক্য নেই।

যাই হোক এহেন প্রশান্ত চায়ের গেলাসে আর একবার চোখ পেতে বুঝতে পারল, আরশোলার পায়ের মত যে বস্তুটিকে ও গেলাসের কানায় দেখতে পাচ্ছে আসলে সেটা ভাঙ্গা চিরুনির দাঁড়া। নখ দিয়ে বস্তুটিকে তুলে ধরতেই প্রশান্ত একটা স্মৃতির মধ্যে ডুবে গেল। এবং ওর মনে হোল দূরাগত কোন হাওয়াই জাহাজের শব্দের মত ওর সমস্ত মস্তিষ্ক জুড়ে একটা ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট কম্পন শুরু হয়েছে, এখনি ওর সমস্ত স্নায়ু গ্রন্থির মধ্যে বিশেষ এক প্রাচীন ধরনের যন্ত্রণা শুরু হবে। এ অবস্থায় ওর নিস্তার পাওয়ার একমাত্র পথই হচ্ছে এই অফিস পাড়ার কোলাহল থেকে দূবে কোন লোকালয় বর্জিত নির্জন স্থানে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া।

চায়ের দাম চুকিয়ে দিয়ে সটান কাটা-দরজা ভেদ করে প্রশান্ত বড় সাহেবের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল এবং কিছুক্ষণ আকুতি মিনতি করার পর ওর ছুটিও মঞ্জুর হল। সঙ্গে সঙ্গেই লিফট বেয়ে তড়িতের মত নিচে নামল প্রশান্ত।

এই দগ্ধ দুপুরেও ফুটপাথে কাতারে কাতারে লোকের মিছিল চলেছে। তারই মধ্যে নিশ্চিন্ত মনে ফল-ওলা কাটা ফলেব সওদা হাঁকছে। জি-পি-ওব সামনে ভিড়। টেলিফোন ভবনে কয়েকগুচ্ছ হাঁসের মত মেয়ে ঢুকছে। ওদিকে ট্রাফিক সামলাচ্ছে পুলিস। ও-পারে কাঁচের শো-কেসে পাতাবাহারের টব। ক্যামেরা ঝুলিয়ে লাল চামড়ার টুরিস্ট ঘুরছে। পিছনে ম্যাজিশিয়ানদের মত কিছু কিছু খঞ্জ ভিখারী লেগে রয়েছে। হেড পিওন প্রশান্ত এই সব দেখতে দেখতে এক সময় রাজ্যপাল ভবনের সামনে এসে এক পলক দাঁড়াল। গেটের সামনে এগিয়ে গেলে মড়া কামান দেখতে পেত। ইচ্ছে করেই দেখল না। পুলিশী সংকেত লক্ষ না রেখেই রাস্তাটা ডিঙোতে গেল। কিন্তু ডিঙোতে গিয়ে ট্রাম বাঁচিয়ে পিচের উপর মধ্য রাস্তায় এসে পড়ল এবং এরপর ও দাঁড়িয়েই রইল। একপাও সামনে বা পিছনে বা পাশে নাড়তে পারল না। গাড়িগুলো

হুস হুস করে ছুটে আসছে। গাড়ির শব্দে সমস্ত অনুভূতি কেমন তালগোল পাকাতে লাগল। হাওয়াই জাহাজের শব্দটা যেন ভীষণভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে ওকে। চায়ের গেলাসের বাকি চাটুকু না খেলেও যেন ভাল করত প্রশান্ত। কলকাতা এখন কলেরা শাসিত, চায়ের গ্লাসে আরশোলার পা এবং সঙ্গে কলেরা। প্রশান্ত এই মুহূর্তে ভুলে গেল চিরুনির দাঁড়ার জন্য বহুকালের লালিত যে স্মৃতি তার জন্যই ও পথে নেমেছে। ওর মনে হল গুপ্ত-ঘাতকের মত কলেরার বীজ ওর পিছু নিয়েছে। এ অবস্থায় কোনক্রমেই নড়া সম্ভব নয়। প্রশান্ত নড়তে পারল না। ফলে, ক্রমে ক্রমে পায়ের নীচে গলা পিচ সেঁটে গেল। সামনে এখন কার্জন পার্ক। পার্কের বড় বড় গাছগুলো যেমন মাটির মধ্যে পা ডুবিয়ে স্থির, প্রশান্ত যেন তেমনিভাবে পিচের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। সন্দেহের চোখে পিচের দিকে তাকাল প্রশান্ত, দেখল, সত্যি সত্যি গোড়ালি অবধি ডুবে গেছে ওর। ফলে বড় আক্ষেপ হতে লাগল, আর একটু এগিয়ে গিয়ে বা পিছিয়ে এসে এমন একটা অবস্থায় পড়লে গাড়ি ঘোড়া আটকে ফেলতে পারত ও। ফলে ট্রাফিক জ্যাম—ট্রাম, ঠেলা, প্রাইভেট, ট্যাক্সি পরপর সব দাঁড়িয়ে যেত। ট্রাফিক জ্যাম হওয়ার মধ্যে কেমন একটা কৌতুক আছে। মনে মনে প্রশান্ত বেশ উত্তেজনা বোধ করল। কিন্তু হায়, এখন কোন উপায়ই নেই।

ওদিকে ময়দানের দিকে মনুমেণ্ট। মনুমেণ্টের নীচে ছোট্ট মত ভিড় একটা। কি কারণে ভিড় অনুমান করবার চেষ্টা করল প্রশান্ত। মনে হল, লোকগুলি উপরে উঠবে। উঠে কলকাতা শহরের দৃশ্যাদি দেখতে দেখতে বিমোহিত হয়ে উপর থেকে শূন্যে ঝাঁপ দেবে। মনুমেণ্টের পায়ের কাছে যে বা যারা ফুচকা বিক্রি করে, তারা তখন এই রকম দৃশ্য দেখে হাসবে। যে লোকটা ঝাঁপ দেবে সে চেষ্টা করবে পাখির মত হাওয়ায় ভেসে বেড়াতে। খানিকটা সে ভাসবে। কিন্তু যেহেতু সে পাখি নয়—ফলে ঠিক চৌমাথার মোড়ে কোন একটা দোতলা বাসের চাকার সামনে আছড়ে পড়তে হবে তাকে। ফলে রোড জ্যাম। ঠেলা, রিক্শা, প্রাইভেট, ট্যাক্সি ইত্যাদি উদোর ঘাড়ে বুধো।

পিচের মধ্যে পায়ের অংশই ডুবে গেল প্রশান্তর। নিচু হয়ে আবার দেখল, নাহ্, গোড়ালি দুটোর চিহ্নই নেই। এর ফলে ওর এখন উঠে আসবারও উপায় নেই। অথচ এজন্য এতটুকুও ক্ষোভ নেই প্রশান্তর। কারণ ও দেখছে,

যে বেগে গাড়িগুলো ওর দুপাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, তাতে ওর এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকাই শ্রেয়। এইভাবে অনড় হয়ে কার্জন পার্কের গাছের মত কিংবা ঐ মনুমেন্টের মত।

গাড়িগুলো সাঁ সাঁ করে পেরিয়ে যেতে যেতে চোখে মুখে গরম বাতাসের ঝাপটা দিচ্ছে। প্রশান্ত চোখ বুজল। ফলে, এখন ও ঘন ঘন মোটরের হর্ন শুনতে পাচ্ছে এবং আশ্চর্য, হর্নের শব্দের সঙ্গে গাড়িগুলোর চেহারারও কেমন একটা মিল যেন খুজে পাচ্ছে ও। হর্ন শুনেই গাড়িগুলোর আকৃতি এবং গায়ের রঙও যেন বলা যায়। সবুজ, হলুদ, বাদামী, মেরুন নানান রঙের গাড়িগুলো ছুটে যাচ্ছে, ছুটে আসছে। ডালহাউসি টু ময়দান, ময়দান টু ডালহাউসি।

প্রশান্ত চোখ খুলল। দেখল, প্রায় হাঁটু অবদি পিচের মধ্যে ডুবে গেছে ও। সামনেই পুলিসের সাদা ছাতিটা বাতাসে একপাশে একটু কাত হয়ে আছে। পুলিস মহাশয় এবার বাঁশি ফুকছেন। এদিকে সবুজ বাতি হলুদ ডিঙিয়ে লাল হল। আবার এপাশের গাড়িগুলো পরপর সব থেমে পড়ছে। এখন গাড়িগুলো থেমে থাকবে। পায়ে হাঁটা লোকগুলি নিশ্চিন্ত মনে রাস্তা ডিঙিয়ে কার্জন পার্কে ঢুকে পড়বে। প্রশান্ত লক্ষ করল, ওর পাশ দিয়ে একদল লোক হনহন করে পেরিয়ে যাচ্ছে। পা তুলবার চেষ্টা করল ও, অসম্ভব। লোকগুলোর মধ্যে কেউ কেউ আবার ওর দিকে কটাক্ষ হানল। কেউ কেউ কৌতুকে ঠোঁট দুমড়ে হাসবার চেষ্টা করল।

প্রশান্তর মনে হল, লোকগুলো বড স্বার্থপর। নইলে কখনো এমন হয়! অথচ যে কোন মুহূর্তে যে কোন লোকই এমন একটা অবস্থায় পড়তে পাবে। তখন এই কৌতুক বা হাসি, তখন এই দাঁত বের করা ব্যাপারটার বদলা নেওয়া যেতে পারে।

হুস হুস করে গাড়িগুলো এখন ওপাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। দেখে প্রশান্ত নিশ্চিন্তে এপাশের গাড়িগুলোর দিকে তাকাল। গাড়ির ভিতরে থাকি শার্ট পরা একজন ড্রাইভার ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে।

প্রশান্তও অভিবাদন করার ভঙ্গিতে হাসল।

প্রশান্ত হাসছে দেখে ড্রাইভার চোখ ফিরিয়ে গম্ভীর হল। প্রশান্তকে অবজ্ঞা করা হল, প্রশান্ত বুঝল। কিন্তু ও দুঃখ পেল না। কারণ ওর বুঝতে বাকি রইল না, এ ধরনের অবজ্ঞা লোকটা ওকে বেশিক্ষণ করতে পারবে না।

ঐ মনুমেন্টের উপর থেকে কেউ একজন লাফ দিয়ে পাখির মত উড়তে শুরু করলেই রোড জ্যাম। ট্যাক্সি, প্রাইভেট, লরি, দোতলা বাস—, তখন হয়ত বা দমকলে ফোন করতে হবে। দমকলের গাড়ি ছুটবে। হোস পাইপ দিয়ে জল ছেটাতে শুরু করলে ড্রাইভারের খাকি রঙের জামাটাও ভিজে যাবে। তখন খাকি রঙটা জলে ভিজে ভিজে কালচে দেখাবে। এ অবস্থায় প্রশান্ত ওর দিকে তাকিয়ে মনের সুখে হাসতে পারবে।

আর তখন ড্রাইভার মহাশয় কি করবে ভেবে না পেয়ে প্রশান্ত আবার নিচে পিচের দিকে তাকাল। দেখল, ওর কোমর অবদি ডুবে গেছে। ও এখন কোমর বর্জিত একটা শো-কেসের পুতুলের মত রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে আছে যেন।

এই সময় ওর হাসি পেল। কারণ এই সময় ওদের বড় সাহেব ওকে দেখতে পেলে ওর একদিনের মাইনে কাটত। বড সাহেবের ধারণা হত, এমন একটা রসিকতা করার জন্যই প্রশান্ত আজ ছুটি চেয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছে। বড সাহেবের স্বভাব প্রশান্তর অজানা নেই। যে রোষের দৃষ্টি দিয়ে উনি প্রশান্তকে শাস্তি দেন সেই দৃষ্টিকেই আবাব নরম করে উনি ওকে আবার উপদেশ দেন। বলেন, বাঙালী জাতটাই আজ গাড্ডায় নেমেছে। তোমার কি মনে হয় প্রশান্ত, ঠিক নয় ?

আজ্ঞে হ্যাঁ—

আজ্ঞে হ্যাঁ কি! যে জাতটার রন্ধ্রে রন্ধ্রে শঠতা এসে দানা বেঁধেছে তার আর রইল কি বল দেখি। যে কটা বড বড সার্ভিসের কথা বল, বাঙালীরা কি কমপিট করতে কসুব কবে কিন্তু শেষটায় রাণী কিংবা মাস্টার হতে পারলেই ববতে যায়।

বাঙ্গালী জাতটাই শঠ হয়ে গেছে কিনা ভেবে দেখতে সময় লাগে প্রশান্তর। তাব আগেই ও মনে করতে পারছে, ওরই পরিচিত এক আত্মীয় ম্যাট্রিক ফেল করে শেষটায় যখন বয়স বাড়ল তখন চাকরীব চেষ্টায় নামল। কাগজ দেখে চিঠি ছাড়ে, প্রথমে একটা দুটো। পরে গাদায় গাদায়। প্রথমে ফিটার মিস্ত্রি বয়, পরে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারিং যে-কোন চাকরী খালি দেখলেই হল। সে ছেলেটি চাকরী না পেয়ে সিনেমার টিকিট, খেলার টিকিট ব্ল্যাক করে এখন।

ছেলেটার নাম মনে করবার চেষ্টা করল প্রশান্ত। নামটা ঠিক মনে আসছে না দেখে কার্জন পার্কের স্ট্যাচুটার দিকে তাকাল ও। স্ট্যাচুর মাথায় কাক বসে আছে। পায়ের কাছে বাঁধান বেদিতে দুজন মেয়ে মানুষ। প্রশান্ত ভাবল,

খারাপ টারাপ হবে হয়তো। ওরা কখনো বালিশ মাথায় ঘুমুতে পারে না। বালিশ রাখে পায়ের দিকে, তাতে সব রক্ত মুখে এসে জমা হয়ে মুখটাকে ফুলিয়ে রক্তাক্ত করে রাখে। এত দূরে থেকে ওদের মুখের রঙটা টসে টসে কিনা ধরতে পারল না প্রশান্ত। ফলে ও বিরক্তিতে আবার নিজের দিকেই তাকাল। দেখল, ততক্ষণে ও গলা অবধি ডুবে গেছে।

ভারী আশ্চর্য সব ঘটনা এখন ঘটে যাচ্ছে যেন, কেবলমাত্র একটাই মুণ্ডু এখন রাস্তার উপরে অর্ধেক কামানো নারকেলের মত পড়ে আছে। দেহহীন কুমোড় বাড়ীর সার সার মুণ্ডু থেকে একটাকে এনে এই রাজ্যপাল ভবনের সামনে যেন বসিয়ে রাখা হয়েছে। কিংবা ম্যাজিশিয়ানের কালো চাদর বিছানো টেবিলের উপরকার কাটা মুণ্ডুটাও হতে পারে। ভীষণ কৌতুকে প্রশান্ত নিজের পরিণতির কথা ভাবতে লাগল।

এমন সময় ও ফুটপাথে ঘোড়ার নাম ধরে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে যাচ্ছে হকারটা। টেলিগ্রাম বেরলেও ওরা একই রকম শব্দ করে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে যায়! এখন কোন খবর নেই দেখে কাগজওয়ালাদের নিশ্চয়ই মন খুব খারাপ। কলেরা নিয়ে তেমন কোন টেলিগ্রাম বাব করারও সুযোগ নেই। প্রশান্ত ভাবল, এতদিনে ওর কলেরার টিকা নিয়ে নেওয়া উচিত ছিল।

বড় সাহেব বলেন, শুধু শুধু কলেরার কেন, টি-এ-বি-সিটাই নিয়ে নেওয়া উচিত প্রশান্ত, কিন্তু কি ব্যাপার জানিস, ওদের ওই পিচকিরির কথা ভাবলেই আর নিতে ইচ্ছে হয় না। আর কর্পোরেশন-অলাদেব তো কথাই নেই। যাকে পাচ্ছে গ্যাদ গ্যাদ করে ফুড়িয়েই চলেছে। আরে বাবা, সিরিঞ্জটা একটু ধুয়ে পুঁছে নে।

কথাটা হয়ত ঠিক কিন্তু প্রশান্তর ধারণা ভূতটা রয়েছে অন্য জায়গায়। নইলে ঘন ঘন এত জাল ওষুধের কারখানাই বা আবিষ্কার হয় কি করে! এইসব ছোটখাট ব্যাপারে কোনদিনই প্রশান্ত মাথা গলাতে চায় নি, মাথা গলিয়ে লাভ নেই। তার চেয়ে বরং গড়াতে গড়াতেই যতদূর যাওয়া যায়!

পুলিশ আবার হাত দুটোকে জল কাটার মতো ভঙ্গি করে দুপাশে ছুঁড়ে দিয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে, লক্ষ করল প্রশান্ত অর্থাৎ এবার আবার ওদিকটা বন্ধ হয়ে এদিক দিয়ে গাড়ি ছুটবে। অর্থাৎ ময়দান টু ডালহাউসি, ডালহাউসি টু ময়দান।

গাড়িতে গাড়িতে স্টার্ট পড়ছে। গাড়ি ছুটছে। প্রশান্ত গাড়িগুলোর নিচের দিকটা দেখতে পারছে এখন। কারণ ওর ভাসমান মাথার উচ্চতা আট দশ ইঞ্চির বেশী নয়। ওর ওপর দিয়ে অনায়াসেই গাড়িগুলো উৎরে যাচ্ছে। যাচ্ছে যাক, কিন্তু একচুল এদিক ওদিক হলেই মাথায় এসে ঠোক্কর লাগবে ওর।

এই এই···যাহ্ শালা, কারো কোনও ভ্রূক্ষেপই নেই যেন। হুস হুস করে বেরিয়ে যাচ্ছে গাড়িগুলো। গাড়ির নিচে তেল কালিতে মানুষের পেটের মত নাড়িভুঁড়ি। কলকল করে পেট ডাকার শব্দ হচ্ছে। ছলকে ছলকে গাড়িগুলো পেরিয়ে যাচ্ছে দেখে ভয়ে ভয়ে কখনও বা প্রশান্ত চোখ বন্ধ করতে লাগল।

এবং হঠাৎ—

হ্যাঁ, হঠাৎই ছোট একটা টু-সিটার প্রাইভেটের চাকা ওর মাথায় এসে হোঁচট খেয়ে লাফিয়ে উঠল। হেসে উঠল প্রশান্ত। পায়ে হোঁচট লাগলে যেমনভাবে লাফাতে লাফাতে কেউ কয়েক ধাপ এগিয়ে যায় ঠিক তেমনি ভাবেই গাড়িটা কয়েক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার পর ঘড় ঘড়ে গলায় হর্ন বাজিয়ে আবার ছুটতে শুরু করল।

ব্যাপারটা ওর আশ্চর্যরকম ভাল লাগল। আর কয়েকটা গাড়ি এইরকম ভাবে ওর মাথায় এসে হোঁচট খেলে ও হাসি চাপতে পারবে না। আয় আয়, প্রশান্ত সামনের ওই মাল বোঝাই লরিটাকে যেন ডাকতে লাগল। গাড়িটা সটান ওর মাথা বরাবর আসতে আসতে হঠাৎই আবার গা বাঁচিয়ে সরে গেল। সেয়ানা আছে ড্রাইভারটা। আর একটু অন্যমনস্ক হলেই হয়েছিল আর কি।

ছোট একটা মোটর বাইক ওর মাথার ওপর দিয়ে ডিঙিয়েই যেন পেরিয়ে গেল। গাড়ির চালক অবাক হয়ে পিছন দিকে তাকাচ্ছে। প্রশান্তও সুযোগটা হাত ছাড়া করল না, চোখ নাচিয়ে ইশারা করল। বাই বাই—

এমন সময় ওর নজরে পড়ল, ওপাশে স্ট্যাচুর পাশে একজন তেল মালিশ-ওলা দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেটার বয়স কম। প্রশান্তর মাথায় চুল খুব ঘন বলে ও লোভ সামলাতে পারছে না বোধ হয়। প্রশান্ত ওকে ধমকাবার জন্য চোখ ঘোরাল কিন্তু হঠাৎ একটা ট্যাক্সি এসে হোঁচট খেয়ে সামনেই লাফাতে শুরু করল।

কিছুক্ষণের মধ্যে একটা পুলিশে গাড়িও হোঁচট খেল। সার্জেন্ট বোধ হয় ওয়েরলেসে খবরটা এখন লালবাজারে পাঠিয়ে দিতে দিতে চাকুরী বজায় রাখছে। ওপাশে একসার ঘোড়সওয়ার যাচ্ছে। খেলার মাঠে আজ কোন চ্যারিটি আছে

কিন্না মনে করতে পারল না প্রশান্ত। বি সি রায় কাণ্ড কিংবা কোন বন্যা-টন্যা যদি হয়ে থাকে—গতবার আসামের বন্যায় ইন্টারভিউ নিতে গিয়েছিলেন শ্রীনেহরু। নেহরুই কি ঠিক মনে করতে পারছে না ও। তা, যে কেউই গিয়ে থাকুন, কাগজ-অলারা বন্যার যা ছবি ছেপেছিল তা ওদের দশবছর আগেকার কোন ছবি বোধ হয়। বন্যা হলে, কিংবা রেল পড়েঁ গেলে ঐ এক সুবিধে ওদের। পুরনো ছবিই ছাপা চলে। এক ছবিই, কেবল নিচের লেখাগুলো একটু পালটে।

একটা হুড খোলা গাড়িও শেষটায় হোঁচট খেল। ড্রাইভার সাহেব বেজায় চটে উঠেছে বুঝল প্রশান্ত। নইলে পুলিসটাকে ও এমনভাবে খিস্তি করে। পুলিসও ছাতি সামলাতে সামলাতে হাত না নামিয়েই তর্ক জুড়েছে।

ড্রাইভার বলছে, নিপাত যা হারামজাদা। পুলিস বলছে, বিপোর্ট কিজিয়ে।

প্রশান্ত হাসি চাপতে না পেরে খুক খুক করে হেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে একটা লজঝড় লরি কোঁক করে হোঁচট খেয়ে সামনেব লাইট পোষ্টের গায়ে ধাক্কা মেরে থেমে পড়ল। ব্যস ট্রাফিক জ্যাম। লরিটার পিছন পিছন সার দিয়ে দাঁড়িয়ে পডছে অন্যান্য সব গাডিগুলো, ময়দান টু ডালহাউসির গাড়ি।

পুলিসটা ততক্ষণে হাত নামিয়ে এগিয়ে এসেছে লরির কাছে। কোমর থেকে যত্ন করে নোটবই খুলল। পেন্সিলের ডগায় থুতু মাখিয়ে নম্বর টুকল। লাইসেন্স দেখল।

ড্রাইভার একটা বিড়ি ধরিয়ে ফুটপাথে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে। রোড জ্যাম। প্রাইভেট, ট্যাক্সি, লরি, ট্রাম। প্রশান্ত হাসছে। এই না হলে মজা হয়। এই না হলে জমে কিছু!

কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে পড়ল। এখন অফিস টাইম নয়, তাতেই এই। অফিস টাইম হলে হুলুস্থুলু লেগে যেত। অফিস টাইম নয় তবু কিছু কিছু লোক খিস্তি করছে পাবলিককে, শালার এই জাতটার যদি হয় কিছু। যে জাতের মেরুদণ্ড নেই সে জাতের কিছুই নেই।

ওদিকে তখন লাইট পোষ্টে ধাক্কা খাওয়া লরির ড্রাইভারের সঙ্গে পুলিসের খুব বচসা শুরু হয়েছে। প্রশান্ত ভালভাবে দেখতে পাচ্ছে না বলে কান পেতে শুনবার চেষ্টা করল।

ড্রাইভার বলছে, রাস্তার উপর ইট, পাথর যা ইচ্ছে তাই যদি পড়ে থাকে, গাড়ি লাফাবে না।

পুলিস বলছে, তা আমি কি করব। আমার কাজ হাত দেখান ব্যাস।

তা হলে বাপু নম্বর টুকছ যে?

আলবাত টুকব। রিপোর্ট করুন।

তখন কিছু কিছু করে ভিড় হয়ে গিয়েছিল, কয়েকজন বলল, মার শালা ড্রাইভারকে। ড্রিঙ্ক করে গাড়ি চালায়।

মার শালা কথা উঠলে আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা কবার দরকার হয় না। প্রশান্ত দেখল, ছোটখাট একটা দাঙ্গা বেঁধে উঠতেও আর দেরী নেই। দাঙ্গা বাধা মানেহ সোডালেমনেডের দোকান লুঠ হওয়া। প্রশান্ত এপাশ ওপাশ তাকিয়ে দেখল কোথাও কোনও দোকান দেখা যাচ্ছে না। কেবল দু-একজন জ্যোতিষী হাতের ছাপ্পা নিয়ে আর চক দিয়ে ফুটপাথে আঁকিবুকি এঁকে বসে আছে।

প্রশান্ত একবার হাত দেখিয়েছিল। জ্যোতিষী বলেছিল, সময় তোমার খারাপ চলছে।

প্রশান্তর বিশ্বাস হয়েছিল কথাটা। জ্যোতিষীর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েছিল ও।

জ্যোতিষী বলেছিল, পথ চলতে সব সময়ই সাবধান থাকবে। রাস্তাঘাটে যে কোন সময়—

কিন্তু একথাটা একদম সত্যি হবে না প্রশান্ত বুঝতে পারে। কারণ, ওর মত এত সাবধানী আর একজনও দেখাও দেখি? ও কখনোও চলতি বাসে লাফিয়ে ওঠে না। ঝড়েব সময় জলে ভেজার ভয়ে কখনোও কোন গাছতলায় দাঁড়ায় না, কারণ ওতে বাজ পড়ে মবার ভয় আছে। কিংবা ওদেব বস্তির কাছে যে ছোট মত পুকুরটা, তাতে নেমে ও কখনোও সাঁতার কাটবারও চেষ্টা করে না, পাছে মাজার পেশিতে হেঁচকা লেগে ও ডুবে যায়। এককথায় জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎ গণনা যে মিথ্যে হবে একথা ও মনে প্রাণে বিশ্বাস করে।

যাইহোক ততক্ষণে ও আব একবার ভাল করে চারপাশে তাকিয়ে দেখল, সোডালেমনেডেব একটাও দোকান নেই। ফলের দোকান লুঠেরও ভয় নেই। কিছু উঠতি বয়সী ছোকরা এদিক ওদিক থেকে বাঁই বাঁই করে ছুটে আসছে, ট্রাফিক জ্যাম। যত দূর চোখ যাচ্ছে কেবল চাকা আর চাকা। আর ভিড়। ভিড় ঠেলে যারা ভিতরে ঢুকতে পারছে না তাদের মুখে নানারকম কথা শোনা যাচ্ছে। কেউ বলছে মস্ত বড় এ্যাক্সিডেন্ট, দুজন লোক খতম হয়ে গেছে।

কেউ বলছে, লাইটপোষ্টটাই লরির গায়ে ভেঙ্গে পড়ে রাস্তা জ্যাম করেছে। কেউ বলছে, চোরাই মাল পাচার করছিল ড্রাইভার। ধরা পড়ার ভয়ে অমনি ভাবে গাড়ি হাঁকায়, ফলে—

এমন সময় অবাক হয়ে তাকাল প্রশান্ত—একটা পুলিসের গাড়ি। বাঙালী এক সার্জেণ্ট ছোকরা গাড়ি থেকে নেমে সমস্ত দৃশ্যটা একবার দেখে নিল। তারপর হঠাৎ একটা বাঁশি বাজিয়ে সমস্ত ভিড়টাকে শান্ত হতে নির্দেশ করল।

প্রশান্ত ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে রইল।

সার্জেণ্ট তখন জাল দেওয়া ঢাকা গাড়ির পিছনে এসে ভিতর থেকে দুজন লোককে নেমে পড়তে আদেশ করল।

প্রশান্ত ভাবল, লাঠিধারী একজোড়া ভেতো পুলিস হয়তো নেমে আসবে। কিন্তু যারা নামল তাদের দেখে আরও বিস্ময় বাড়ল ওর। প্রশান্ত দেখল, পুলিসের পোশাক। কিন্তু একজনের হাতে একটা বেলচা, অন্যজনের হাতে একটা ময়লা ফেলার ঝুড়ি। যাহ্ শালা—

সার্জেণ্ট বলল, ফরোয়ার্ড মার্চ।

ঝুড়ি আর বেলচাঅলা পুলিশ দুজন মার্চ শুরু করল সামনের দিকে। ঠিক যেন ওকে লক্ষ্য করেই এগিয়ে আসছে ওর দিকে। বুটের শব্দ হচ্ছে ঠকঠক করে। বুটের শব্দে কেমন যেন গুরগুর করে কেঁপে উঠল বুকটা।

প্রায় প্রশান্তর কাছাকাছি এগিয়ে আসতেই শোনা গেল সার্জেণ্ট চিৎকার করে হেঁকে উঠছে, হল্ট।

ঝুড়ি আর বেলচাঅলা পুলিস দুজন থামল।

সার্জেণ্ট বলল, মারো বেলচা।

প্রশান্ত দেখল, বেলচাঅলা কপাৎ করে বেলচা চালিয়ে ওর মুণ্ডুটাকে পিচের রাস্তা থেকে শূন্যে তুলে নিয়েছে। ফলে, মাথাবিহীন দেহটা এখন পিচের মধ্যে গেঁথে রইল।

ভর ঝুড়িতে।

প্রশান্ত দেখল, ওর মাথাটাকে ঝুড়ির মধ্যে ফেলে দিল বেলচাঅলা। ঠিক ধাঙররা যেভাবে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ময়লা ফেলে অনেকটা ঠিক সেইভাবে।

হ্যাঁ মশাই, কোন দিকে এখন নিয়ে যাওয়া হবে মাথাটাকে? মিন মিন করে প্রশ্ন করল প্রশান্ত।

কিন্তু ততক্ষণ সার্জেণ্টের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে পড়েছে পুলিস দুজন।

সার্জেণ্ট বলল, ফরোয়ার্ড মার্চ।

পুলিস দুজন আবার মার্চ শুরু করল গাড়ির দিকে।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে লোকজন যেন ভেলকি দেখছে। যেন সত্যি সত্যিই একটা ডুগডুগি বাজান ভেলকি ঘটে যাচ্ছে এখানে।

আর ঠিক এই সময়ই প্রশান্তর মনে পড়ল আজ সকালে অফিসে বেরুবার আগে খোকার মা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দুর্গা নাম জপেছিল তিনবার। সন্ধ্যার সময়ও হয়ত বা শ্রীমতি রোজকার মত সদরের কাছে ঘুরঘুর করবে।

হ্যাঁ মশাই, কাজটা কি ভাল হল? সার্জেণ্টকে শুধাল প্রশান্ত। দেহটা যে পিচের মধ্যে পড়ে রইল, ও বস্তুটি তুলবে কে? ও মশাই শুনছেন কিছু?

কিন্তু সার্জেণ্ট বেশ নির্বিকার। কোন কথাই আমল না দিয়ে গাড়ি ছোটাতে বলল সামনের দিকে।

অস্থির হয়ে হামলে পড়ল প্রশান্ত, কি হল? এ কি ধরণের অত্যাচার শুরু করলেন আপনারা? ও মশাই কানে যাচ্ছে কিছু?

সার্জেণ্ট ছোকরা একবার হাই কাটল, আহ্, থামুন দেখি। মাথাটাই তো ঝামেলা বাঁধিয়ে ছিল এতক্ষণ। ওটা পেলেই আমাদের চলে যাবে।

প্রশান্ত এবার অভিমানে আর রাগে গরগর করে বকতে লাগল, আচ্ছা, দেখে নেব সার্জেণ্ট দাদা, কলকাতাটা কি চিরকালই এমন থাকবে। দেখে নেব একদিন।

বাঘনখ

সকালে এক পিস পাউরুটি খেয়েছিল পেগো। তারপর দুপুর গড়াল, বিকেল গড়াল, সন্ধ্যেও হয় হয়, আর কিছুই জুটল না, ফক্কা। পেটে গুড়গুড়ি কাটছে এখন। ভরপেট এক থালা ভাত পাওয়া যেত আবার চাঙ্গা হতে সময় লাগত না। কিন্তু ভাত তো দূরের কথা, এক মুঠো মুড়ি বাতাসা জোটারও কোন আশা নেই। দিনটায় আজ শনি লেগেছে। যার সঙ্গেই দেখা হয়, সেই ওকে এড়িয়ে যায়, সেই ওকে কুকুর-তাড়ান তাড়িয়ে আসে।

অথচ খাওয়া না জুটলে চলে কি করে! না হয় ওর কেউ নেই, না ফাদার-মাদার; না অন্য কেউ। কিন্তু পেট মানবে কেন! এতদিন যা হোক গীতামাসিই ছিল ওর ভরসা, বালতি বালতি জল তুলে এনে ও চৌবাচ্চা ভরে দিত, দুপুরের খাওয়াটা ছিল বাঁধা। কিন্তু সেই গীতামাসিও ড্যাং ড্যাং করে হাসপাতালে চলে গেল কাল, খোকা হবে। কবে আবার খোকা কোলে মাসি যে বাসায় ফিরে আসবে কে জানে, ততদিন ও বাঁচে কি করে। পেটে গুড়গুড়ি কাটছে এখন। গীতামাসিদের বাড়ি তালা চাবি পড়ে গেছে, তাই বলে পেগো তো আর পেটে তালা চাবি লাগিয়ে বসে থাকতে পারে না, একটা কিছু ফন্দি না পেলে চালায় কি করে ও।

ফন্দি খুঁজতে খুঁজতে সকালবেলা এক পিস পাউরুটি পেয়ে গেল। সকালে ঠাকুরের দোকানের সামনে ঘুরঘুর করতে করতে ও দেখে, চোগা চাপকান পরা তরফদারবাবু মৌরী চিবোতে চিবোতে বেরিয়ে আসছে। ভাবল, সামনে গিয়ে হাত পেতে দাঁড়ালে কি আর দশটা পয়সা বেরিয়ে আসবে না! যা ভাবা, একটু একটু করে ও এগোতে শুরু করল। এমন সময় বাস আসছে দেখে তরফদারবাবু পজিশন নিয়ে দাঁড়াতে গিয়ে কপাৎ করে এক লাদি গোবরে পায়ের জুতো ডুবিয়ে জগদম্বা হয়ে গেল।

হিঁ হিঁ! হাসি পেয়ে গিয়েছিল ওর। কিন্তু হাসিটুকু গিলে ফেলতে এক মুহূর্তও সময় লাগল না। তরফদারবাবুর সামনে এসে হাত পেতে ও প্রসন্ন মুখে দাঁড়াল, জুতো খুলে দিন, ধুয়ে আনি।

তরফদারের যা মনের অবস্থা। পলকে একবার আপাদমস্তক দেখে নিল ওর, নিয়ে পালাবি না তো?

হি হিঁ! হাসি আর চাপতে পারে না পেগো। এটা কি খাবার জিনিস, যে নিয়ে পালাব! দিন না, ধুয়ে আনি।

অসহায় তরফদারের তখন জুতো খুলে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। এ্যাহ্, গোবর তো নয়, ইয়ে। বিরক্তিতে জুতোর ফিতেটা তুলে ধরে পেগোর হাতে ছেড়ে দেয়। আর সঙ্গে সঙ্গে পেগো সাঁ করে রাস্তার কল থেকে ওটাকে ঘষে ঘষে ধুয়ে এনে আবার ফেরত দিয়ে সগর্বে তাকায়, একদম সাফাচাট করে দিয়েছি, দেখুন।

জুতোটা আবার সাবধানে পায়ে গলিয়ে নেয় তরফদার, দশটা পয়সা ওর হাতে তুলে দেয়।

হিঁ হিঁ। দশ পয়সাতেই ও খুশি। দশ পয়সায় এক পিস পাউরুটি কিনে তারিয়ে তারিয়ে খেয়ে নিয়ে খানিকটা যেন ও স্বস্তি পায়।

কিন্তু এ ঘটনা সেই সকালের। তারপর দুপুর গেল, বিকেল গেল, সন্ধ্যেও হয় হয়, ফক্কা। আর কিছুই জোটার তেমন লক্ষণ আর দেখা যাচ্ছে না। পেগো এপাশে ঘোরে, ওপাশে ঘোরে। স্রেফ ফালতু। মাঝে মাঝে গোবর দেখলেই থমকে দাঁড়ায় এ্যাহ্, কি চমৎকার সাইজের একটা লাদি পড়ে আছে। অথচ তরফদারবাবুর মতো আর কাউকেই ও গোবরে পা ডোবাতে দেখে না। সকালের পর গোবরের ব্যাপারে সবাই যেন খুব সতর্ক হয়ে গেছে।

যাকগে, চুলোয় যাক। ও এলোমেলো হাঁটা হাঁটতে ললিতকুঞ্জের সামনে এসে থমকে দাঁড়ায়। দাঁড়াত না, কিন্তু ওর নজরে পড়ে ছাদে লাটাই হাতে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে একটা ছেলে। ঘুড়িটার কোন ল্যাজ নেই, দিব্যি ডাইনে বাঁয়ে দোল খেতে খেতে উড়ছে। একবার যদি ওটা গোত্তা খেয়ে রাস্তায় পড়ত, ও ছুটে গিয়ে ঘুড়িটা উড়িয়ে দিতে সাহায্য করতে পারত। তার মানেই ছেলেটার সঙ্গে ভাব জমাতে পারত ও। তার মানেই ছেলেটাকে ও ভুজুং ভাজুং দিয়ে দোকানের দিকে টেনে আনতে পারত, তার মানেই একটা না একটা কিছু ও সাঁটিয়ে নিতে পারত।

পারত কি! কেমন যেন সন্দেহ হয় ওর। যা কেপ্পন ওরা। তেল খরচ হওয়ার ভয়ে ওরা নাকি মাছ পুড়িয়ে খায়। অথচ ওদের টাকার অভাব নেই।

বস্তায় ভয়ে ভয়ে ঘুঁটের মতো ওরা টাকা লুকিয়ে রাখে। শোনা কথা হলেও সবখানি যেন অবিশ্বাস করতে পারে না পেগো।

রঙিন ঘুড়িটার দিক থেকে চোখ সরিয়ে এনে ও ছেলেটার দিকে তাকায়, আর ঐ সময় ওর নজরে পড়ে ললিতকুঞ্জের ললিতের দিকে। এই যে লোকটা বুলডগের মতো দাঁত মেলে ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

পেগো অবস্থা খারাপ বুঝে করুণ চোখে একটু হাসল। যেন প্রমাণ করতে চাইল, ও শত্রু নয় ফ্রেণ্ড, ভাই ভাই।

কিন্তু হিতে বিপরীত হল। লাঠি উঁচিয়ে ধরেছে লোকটা। অর্থাৎ বাড়ির সামনে থেকে এক মিনিটের মধ্যে পেগো যদি সরে না পড়ে তাহলে কেলেঙ্কারী ঘটবে। অগত্যা ভাবগতিক ভাল না বুঝে ও সরে এল।

ললিতকুঞ্জের বাঁ পাশ দিয়ে রাস্তাটা খাটালের দিকে গেছে। খাটালের দিকটায় একটা পচা আধ-শুকনো পুকুর পড়ে। পুকুরের পাশে জঙ্গল। পেগো খাটালের দিকে তাকায়, ছায়া ছায়া অন্ধকার জমে আছে ওখানে। আর খানিকক্ষণ বাদে খাটালের টিনের চালার নিচে একটা হ্যারিকেন জ্বলে উঠবে। ঐ হ্যারিকেনের আলোয় ভূতের মতো পঞ্চুদা তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে মাল খেতে বসবে। একটা নরক গুলজার চলবে ওখানটায়।

পেগো খাটালের দিকে এগনো বৃথা মনে করে ওদিকে আর এগলো না। বরং গলির উলটো দিকের রাস্তায় হাঁটতে শুরু করল। এদিকে এই বস্তির আশেপাশে আর আশা নেই, বরং বড় রাস্তায় ঠাকুরেব দোকানের কাছাকাছি আবার ঘুরঘুর করলে খারাপ হয় না। যা ভাবা, ও এগোতে শুরু কবে বড় রাস্তার দিকে।

কিন্তু আবার একটু থমকে দাঁড়াতে হল ওকে। কেমন যেন টাটকা ঘিয়ের গন্ধ পাচ্ছে পেগো। দু'বার একবার লম্বা করে নাক টেনে গন্ধ নিল ও। গন্ধটা ওর পেটের মধ্যে ঢুকে ঘুরপাক খেয়ে আবার ফিরে এল। লুচি ভাজা হচ্ছে কোথাও! খালি পেটে ফুলকো লুচির গন্ধ, সারা গা কেমন ঝিমঝিম করে উঠল ওর। স্নায়ুর ভিতরে জড়িয়ে জড়িয়ে আশ্চর্য এক অবসাদ। আহ্‌ সুঘ্রাণে সুঘ্রাণে পাগল করে দেবার মতো অবস্থা।

কিন্তু গন্ধটা আসছে কোত্থেকে! সামনের এই বস্তি বাড়িতে কার এমন লুচি খাওয়ার বাসনা জাগল কে জানে। ইচ্ছে হল, বাড়ির মধ্যেই ঢুকে যায়। কিন্তু ঢুকব বললেই কি ঢোকা যায় নাকি। দরজা জানালা যতই খোলা থাক

না বাপু, ঢুকতে গেলেই রাবণ বধ। ফলে দাঁড়িয়েই থাকে পেগো। আর এ সময় ওর মনে হয় মানুষ হয়ে না জন্মিয়ে যদি বেড়াল হয়ে জন্মাত ও, সুড়ুৎ করে রান্নাঘরেই ঢুকে পড়া যেত। চাই কি অবস্থা বুঝে গণ্ডা কয়েক লুচি মুখে পুরে তিন লাফে পালিয়ে আসা যেত।

এই, কে র‍্যা ওখেনে ?

হঠাৎ চমকে ওঠে পেগো। তাকিয়ে দেখল একটা বুড়ি। ড্যাব ড্যাব করে ওকে দেখছে।

পেগো মিষ্টি মিষ্টি করে হাসে, আমি বুড়ি মা, আমি পেগো।

পেগো! কোন গগন থেকে নেমে এলি বাবা! তা, ওখেনে দাঁড়িয়ে কি দেখছিস ?

কিছু নয়তো বুড়ি মা। এমনি যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েছি।

বটে! বুড়ি বাঁকা পিঠটাকে বেশ খানিকটা সোজা করে কোমরে হাত রেখে তাকায়, কেন দাঁড়ালি ? এ বাড়িতে তো কোন কচি বয়সের মেয়ে নেই, এ্যাঁ ?

পেগো কেমন ঘাবড়ে গিয়ে আমতা আমতা করে, না, মানে ইয়ে আর কি! ঘি দিয়ে লুচি ভাজা হচ্ছে কিনা তাই!

বটে রে বোনপো! গরম লোহা দেখেছিস। গরম লোহা এনে ছেঁকা দেব জিভে, তখন বুঝবি। যাহ্, যা বলছি।

পেগো বুড়ির মতো বেশ খানিকটা বাঁকা হয়ে মনের ঝাল মেটাবার জন্য নকল করে, গরম লোহা এনে যখন ছেঁকা দেব জি[illegible], তখন বুঝবি। যাহ্, যা বলছি। তারপর আর দাঁড়ায় না, সরে আসে।

কিন্তু পেট মানসে তো! রাগে ক্ষোভে দু'বার একবার ও হাত পা ছোঁড়ে তারপর সামলে ওঠে। তবু এতক্ষণ লুচির গন্ধে বেশ একটু চনমনে সুখ পাচ্ছিল ও, তাও যদি কারো সহ্য হয়। আসলে গীতামাসি যতক্ষণ না খোকা কোলে হাসপাতাল থেকে ফিরে আসে ততক্ষণ ওর রক্ষে নেই। একেবারে আমসি হয়ে শুকিয়ে মরবে পেগো।

ফলে ফন্দি খুঁজতে খুঁজতে আবার ও হাঁটতে শুরু করে। কারো ভাতের হাঁড়িতে ভুলেও কি একটা টিকটিকি পড়ে যেতে পারে না। টিকটিকি পড়া ভাত চট করে মুখে দেবে না কেউ। ও রকম ভাত একমাত্র পেগোই গপাগপ করে সাবড়ে দিয়ে আসতে পারে। কিংবা এমনও তো হতে পারে, কারো

বাড়িতে হয়তো মাছ মাংস ভাত ডাল ভাজা রান্না হয়ে আছে, হঠাৎ সে বাড়ির কোন রুগী চট করে মরে গেল। তখন কান্নাকাটি ভুলে কেউ তো আর ওগুলো খেতে বসবে না, ডাকো তখন পেগোকে। পেগো হাড চুষে চুষে ঝাঁজরা করে খেয়ে উঠতে পাবে।

আসলে ভব পেট এক থালা ভাত না হলে কেমন যেন সব কিছু গুবলেট হয়ে যাবে ওব। এই যে ও হাঁটছে, ওর মনে হচ্ছে ও ঢাঁই করে যে-কোন এক সময় পড়ে যেতে পারে। ধুর! একদিন না খেলে কেউ পডে মবে নাকি! মনে মনে সাহস সঞ্চয় করে নেয় পেগো, ও পড়বে না। যেভাবেই হোক রাতের মতো কিছু না কিছু ঠিক জুটিয়ে নেবে ও। ভাবতে চেষ্টা করল, ওর কিছুই হয়নি। ওর পেটে যে এত গুডগুড়ি কাটছে সেটা নেহাতই ওর মনগডা, আসলে কিছুই হচ্ছে না ওর। দিব্যি ও বামা শ্যামা যদু মধুর মতো হেঁটে চলে বেড়াতে পারছে। আর দশ জন মানুষের মতোই ও বেঁচে থাকার জন্য পৃথিবীতে জন্মেছে। না থাক ওর ফাদার-মাদাব, নাই বা রইল ওর উঠে দাঁডাবাব খুঁটি, কি এসে যায়! আপাতত এক থালা কেবল ভাত। ভাত না জোটে অন্তত গোটা কযেক রুটি, রুটি না হলেও চলবে, কিন্তু এক ঠোঙা মুডি—

এক ঠোঙা মুডিও কি আজ জুটবে না। হাঁটতে হাঁটতে বাস বাস্তা অবদি এগিয়ে এল ও। বাস্তার ওপাবে চায়েব দোকান। দোকানে পঞ্চুদাব চামচা মন্টিকে ও দেখতে পেল। মাসখানেক ধবে মোটা করে গোঁফ বাখতে শুরু করেছে মন্টি। দেখলে মনে হয় পুলিস। পেগো ওর দিকে জুলজুলে চোখে তাকিয়ে থাকল। তাবপর বিডবিড় কবে উঠল মনে মনে, কি বে পুলিস এক প্লেট ঘুগনি খাওয়া না, খাওয়াবি?

হঠাৎ কেমন চমকে উঠল, মন্টি ওব দিকেই তাকিযে আছে। শুধু তাকিযে থাকা নয়, ইশাবা করে ওকে কাছে আসতে বলছে। সত্যি সত্যি কি ওকেই ডাকছে নাকি! পেগো আশেপাশে একবার তাকিযে নিল, নাহ্, আর কেউ নেই ওখানে। ওকেই ডাকছে নির্ঘাৎ।

পেগো এগিয়ে এল, মন্টিদা আমায় ডাকছ।

মন্টির সেই গোঁফ সাঁটান মুখ, কেমন যেন গম্ভীর। যেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।

পেগো ওর খুব কাছাকাছি এগিয়ে এসে দাঁড়াল, আমায় ডাকছ মন্টিদা?

মন্টি এবার অদ্ভুত একটা ভঙ্গি করে ওর প্যান্টের দিকে আঙুল তুলে ধরল,

প্যাণ্টের বোতাম খোলা কেন রে তোর? য়্যাঁ? টিকটিকি বার করে রেখেছিস যে বড়!

পেগো কেমন ঘাবড়ে গেল। ঝুঁকে ঢলঢলে নিজের প্যাণ্টের দিকে তাকাল কই, না তো। ধেট্!

ধেট্ কি রে! খুলে যেতে পারত না বুঝি। হেসে পোকায় খাওয়া দাঁতগুলো মেলে ধরল। তারপর খিঁচিয়ে উঠল, ভাগ। এখানে এসেছিস কেন?

আবার কেমন মিইয়ে গেল পেগো।

ভাগ বলছি। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে চোর পুলিস খেলা শুরু করার মতো ভঙ্গি করতেই পেগো সটাক করে তিন লাফে রাস্তা পার হয়ে এপারে চলে এল। আবার খানিকটা ঝুঁকে ও প্যাণ্টের দিকে তাকাল, জীর্ণ, দু তিন জায়গায় সেলাই করা, অনেক দিন ধরে সোডা দিয়ে কাচা হয়নি। গীতামাসি থাকলে চুটকি এক টুকরো সাবান এগিয়ে দিয়ে বলত যা কেচে শুকতে দে। অত নোংরা পরতে গা গুলায় না তোর। আসলে তুই একটা ভূত। ভূতের কোন ঘেন্না পিত্তি থাকে না। পেগোর গায়ে ঢলঢলে এই গেঞ্জিটারও অবস্থা ভাল নয়, একটু আঙুলের ঘষা লাগলেই পুরপুর করে ছিঁড়ে যায়। সুতো জড়িয়ে জড়িয়ে দু'তিন জায়গায় গিঁঠ লাগিয়েছে ও।

অথচ জামা প্যাণ্টেব জন্য অত কিছু মাথাব্যথাও নেই ওর। আগে জামা প্যাণ্ট, না আগে ডাল-ভাত। সারাটি দিন আজ ভাতই জুটল না, তা জামা প্যাণ্ট! চুলোয় যাক! কারো যদি টিকটিকি বেরিয়ে থাকে তো ওর কি! এক ডিস ঘুগনি খাইয়ে যদি অমনি রসিকতা করত, কিছু আসত যেত না। আসলে পঞ্চুদার চামচাগুলোর মধ্যে মন্টিটাই হচ্ছে এক নম্বর তিলে খচ্চর। তবে অমন ভালো মুখ করে ইশারা করল বলেই না ও কাছে গেল।

পেগো আবার পাড়ার দিকে এগোতে শুরু করল। কিন্তু দু' পা মাত্র এগিয়েছে, আবার মন্টির আওয়াজ পেয়ে ও ঘুরে দাঁড়াল।

হ্যাঁ, মন্টিই ওকে ডাকছে। কিছু একটা বলার জন্য নিজেই এবার দোকান থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে।

এই পেগো একটা কাজ করে দিবি?

পেগো কুতকুতে চোখে তাকিয়ে থাকে, কি কাজ?

একবার একটু থাটালে যা না, যাবি? ভীষণ জরুরি একটা কথা মনে পড়ে গেছে। যাবি কিনা বল না?

কি করব গিয়ে ?

কিছুই করতে হবে না, পঞ্চুদার হাতে একটা জিনিস্ কেবল পৌঁছে দিয়ে চলে আসবি। আর বলে দিস, আমার যেতে একটু দেরি হবে।

পেগোর বুকের ভেতরে শিরশির ক'রে ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল একবার। খাটালের টিনের চালায় এখন যে নরকগুলজার চলছে তাতে সন্দেহ নেই। ওখানে যাওয়াটা কি উচিত হবে ওর! পঞ্চুদাকে দেখলেই কেমন যেন চিমসে মেরে যায় পেগো, পঞ্চুদা ইচ্ছে করলে ওর ঠ্যাং দুটো উপরে তুলে চরকির মতো এক পাক ঘুরিয়ে ছেড়ে দিতে পারে। ইচ্ছে করলে ওকে এক ফুঁয়ে তুলে নিয়ে গিয়ে কবর খুঁড়ে পুঁতে রাখতে পারে। পেগো এসব ভেবেচিন্তে ওর কথায় আর উত্তর দিতে পারল না।

আয় তাহলে, জিনিসটা নিয়ে যা। মন্টি ওকে আদেশ করল।

পেগো কেমন যেন ভেড়া, কথাব ওপর কথা তুলে বলতে পারল না, ও যাবে না। বরং সুড়সুড় করে মন্টিদাব পেছন পেছন ও হাঁটতে শুরু করল।

মন্টি ওকে চায়ের দোকানের পেছন দিকে নিয়ে এল, একটু দাঁড়া। পেগোকে দাঁড করিয়ে রেখে পলকের জন্য একটা ঝুপসি ঘরে ঢুকে গিয়ে বেরিয়ে এল।

পেগো দেখল মন্টির হাতে ছোট মতো একটা প্যাকেট। কাগজে মোড়া কি যেন একটা বস্তু রয়েছে ওতে।

নে, সোজা খাটালে চলে যাবি।

পেগো ভয়ে ভয়ে প্যাকেটটা হাতে তুলে নিল। একটু টিপে টুপে দেখার চেষ্টা করল। নির্ঘাৎ বোতল টোতল আছে।

যা, দাঁড়িয়ে থাকিস না, চলে যা। বলবি, আমার আসতে একটু দেরি হবে।

পেগো ফ্যাকাসে চোখে একবার তাকাল, তারপর প্যাকেটটাকে একটু আবডাল করে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল।

এমন সময় ওর চোখে পড়ল সকাল বেলার সেই তরফদারবাবুকে। অফিস করে ফিরছে বোধ হয়। পায়ের জুতোর দিকে তাকাল, বুঝবার উপায় নেই ঐ জুতো দিয়েই ও গোবর মাড়িয়ে দিয়েছিল। ওর ইচ্ছে হল, কাছে এগিয়ে গিয়ে আবার দশটা পয়সা চায় কিন্তু হাতের এই প্যাকেটটার কথা যদি জিজ্ঞেস করে!

নাহ্, ও এড়িয়ে গেল। বরং পঙ্কুদার হাতে প্যাকেটটা তুলে দিয়ে ওদেরই কাছে দু'চার পয়সা চাইতে পারে। বড্ড ক্ষিধে লেগেছে পঙ্কুদা, মাইরি বলছি, মা কালীর দিব্যি, সকাল থেকে কিচ্ছু খাইনি।

বলা যায় না, ওরা ওকে খুশি হয়ে সামান্য কিছু খাওয়াতেও পারে। যারা মাল খায় তারা সঙ্গে কিছু তেলেভাজা পাঁপর টাপর নিয়ে বসে। পঙ্কুদা খুশি মেজাজে পেগোর হাতে দুটো একটা তেলেভাজাও গুঁজে দিতে পারে। নে, খা, খেয়ে কেটে পড়।

পেগো হাঁটতে হাঁটতে আবার ললিতকুঞ্জের পাশে চলে এসেছিল। এখন বাড়ির ভেতরে ঝকঝকে আলো জ্বলছে। ছাদের দিকে তাকাল ও, ছাদের দিকটা অন্ধকার। এখন কারোরই থাকার কথা নয়, ছাদের আরো উপরে আকাশ। ও একপলক আকাশের দিকে তাকাল। আকাশে সেই আদ্যিকালের নক্ষত্রগুলো ছাড়া আর কিছুই নেই। চোখ নামিয়ে নিয়ে ও খাটালের দিকে এগোতে শুরু করল।

ললিতকুঞ্জের পেছন দিকে দু'চারটে বাঁশ বাখারির ঘর। একটিতে বনমালি ভারি তার ছেলেমেয়ে বউ নিয়ে ঘর সংসার করে। ওখানে এখনো ইলেকট্রিক নেকেনি। ফলে লম্ফ জ্বলে। বনমালি সকাল না হতেই বাঁক কাঁধে বাড়ি বাড়ি জল দিয়ে বেড়ায়। ভাগ্যিস গীতামাসিদের বাড়িতে এখনো ও ঢুকতে পারেনি। ওখানে জল তোলার কাজটা ভাগ্যিস পেগোর ওপরই রয়ে গেছে নইলে ওর যে কি হত কে জানে। পেগো কেবল জল তুলে চৌবাচ্চা ভরেই খ্যান্ত হয় না, গীতা-মাসির অসংখ্য ফাই ফরমাস খাটে। এই তো দিন কয়েক আগে ও ঝামা দিয়ে ঘষে ঘষে বাথরুম সাফা করেছে। এরকম যা আরো দু' একটা বাড়ি হাতে রাখতে পারত তাহলে কি আর ভাবনা থাকত।

পেগো দেখল বনমালির ঘর অন্ধকার। বারান্দায় ওর হাবাগোবা মেয়েটা একা একা বসে আছে। মেয়েটার নাম বুলবুলি। মেয়েটা ওখানেই বসে বসে দিন রাত কাটায়। প্রকাণ্ড বড় একটা মাথা, পা দুটো সরু সরু। গায়ে একটা ঢলঢলে ফ্রক। কেমন যেন হাবার মতো তাকিয়ে আছে রাস্তার দিকে। কেমন যেন জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলে, মেয়েটা। ওর দিকে চোখ পড়তেই বেশ কিছুটা মজা পায় পেগো। একবার একটু মুচকি মুচকি হাসল, এই তোর বাবা কোথায় রে?

বুলবুলি হাবা হাবা ভঙ্গি করে হাত তুলে দেখাল, মারব!

বটে ! অন্য সময় হলে পেগো একটা পাথর ছুঁড়ে পালিয়ে আসত। এখন আর ঝামেলা বাধাতে ইচ্ছে হল না। সরে এল।

আর একটু এগোলেই হাজামজা পুকুরটার পাশ দিয়ে ঢাল বেয়ে পায়ে হাঁটা রাস্তা। তারপরেই সেই খাটাল। পেগো দেখতে পেল, খাটালের টিনের চালার নিচে একটা হ্যারিকেন জ্বলছে। হ্যারিকেনের আলোয় দু' তিনটে ছায়া মূর্তি। এতদূর থেকে স্পষ্ট ও মূর্তিগুলোকে ঠিক চিনতে পারল না।

ঢালের দিকে নেমে হাঁটতে লাগল।

ম ত্র দু'চার পা হেঁটেছে, হঠাৎ চমকে উঠল, কে যেন চেঁচিয়ে উঠেছে ওকে দেখে, কোন্ শালা রে ?

পেগো বলল, আমি পেগো পঞ্চুদা।

পেগো ! এখানে কি বে ? কি চাই ?

পেগো প্যাকেটটা সামনে তুলে ধরে এগোতে লাগল, মন্টিদা আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে।

মন্টি ! পঞ্চুদা বলল, আয়।

পেগো হন হন করে এগিয়ে এল। দেখল টিনের চালার সামনে নিমগাছের তলায় খাটালের লক্ষ্মীপ্রসাদ খাটিয়ায় শুয়ে আপন মনে পা নাড়ছে। যেন কোন ভ্রূক্ষেপই নেই ওর।

কি হয়েছে রে মন্টির ?

পেগো প্যাকেটটা ওদের হাতে তুলে দিল। মন্টিদা একটু পরে আসবে বলেছে।

টিনের চালার খুব কাছাকছি চলে এসেছিল পেগো। কেমন যেন পেট গুলোন একটা গন্ধ, গন্ধ আর ধোঁয়া। কেমন যেন জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলছে পঞ্চুদা। চোখ দুটো যেন কাচের গুলি, টকটক করছে লাল। তাকিয়ে থাকলে গুড়গুড়ি বেড়ে যায় পেটের মধ্যে।

পেগো বাকি দুজনকে চিনতে পারল না। ওরা চৌকিতে বসে তাস আর গেলাস নিয়ে তাকিয়ে আছে। একজনের হাতে মোটা একটা চুরুট জ্বলছে। কিন্তু ওদের ধারে কাছে কোথাও তেলেভাজাটাজা কিছুই দেখতে পেল না ও। তবে কি ভাজাভুজি না নিয়েই মাল খেতে বসেছে ওরা, কে জানে।

পঞ্চুদা কাগজের মোড়কটা খুলতেই একটা বোতল বেরিয়ে পড়ল। তারপর

অদ্ভুত একটা শব্দ তুলে বোতলটাকে লোফ্‌ফা করে চালার দিকে ছুঁড়ে দিল। ক্যাচ লুফে নিল চুরুট ধরানো লোকটা।

তো মন্টি কখন আসবে বলেছে?

পেগো আমতা আমতা করে বলল, একটু প::।

একটু পরে কেন? ধরে আনতে পারলি না?

পেগো হিঁ হিঁ করে মেকি একটু হাসল। মাথা খারাপ নাকি মন্টিকে ও ধরে আনবে।

ঠিক আছে, তুই যা। পঞ্চুদা খুশি মেজাজে চালার ভিতরে ঢুকে গেল।

পেগো চোখে কেমন ঘোলাটে দেখল। মালের গন্ধে কেমন যেন পেটের মধ্যে এক পাক গুলিয়ে উঠল ওর। মাজার দিকটা এমনিতেই কেমন কমজোরী হয়ে আ:ছে :াজ সকা: থেকে। তার ওপর যাওবা একটু কাজ করে দিল ও, কিন্তু স্রেফ ফক্কা। অথচ সকাল বেলায় তরফদারবাবুর জুতো পরিষ্কার করে দেওয়ায় এক পিস রুটি পেয়েছিল ও। এমন মাগনা মাগনা ওরা ওকে খাটিয়ে নেবে ভাবতে কেমন খারাপ লাগল।

আব নড়তে পারল না পেগো। দাঁড়িয়ে থাকল। পেট মুচড়ে গন্ধটা কেমন যেন পাক খাচ্ছে।

কি রে! দাঁড়িয়ে আছিস যে? পঞ্চুদা চালার ভেতরে ততক্ষণে নতুন বোতলটা খুলে ধরেছে। বিস্ময়ে কেমন যেন তাকিয়ে আ: পঞ্চুদা।

পেগো মিনমিন করে বলল, ভীষণ ক্ষিধে পেয়েছে। সারাদিন কিছু—

ক্ষিধে পেয়েছে! যেন এব চেয়ে আশ্চর্য কথা আর কিছু কোন দিন শোনেনি পঞ্চুদা, ক্ষিধে পেয়েছে কি রে! বাড়িতে গিয়ে খা গে যা। এখানে কি!

পেগো বলল, তেলেভাজা—

তেলেভাজা! তেলেভাজা কি হবে!

তারপর বেশ কিছুক্ষণ পেগোর দিকে তাকিয়ে থেকে পঞ্চু ওকে কাছে ডাকল ঠিক আছে, এদিকে আয়।

পেগো এগিয়ে এল।

এখানে বোস।

চৌকিতে বসতে বলছে ওকে। ধুত্‌! ওখানে ও বসবে কি করে! নাকি

মন্টিদার মতো আবার একটা মজা করে বসবে পঞ্চুদা, এই তোর টিকটিকি দেখা যাচ্ছে। পেগো চালার নিচে ঢুকে দাঁড়িয়ে রইল।

বোস বলছি। হঠাৎ ধমকে উঠল পঞ্চুদা। আর সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে ও চৌকির এক কোণায় বসে পড়ল।

পঞ্চু তার মদের গেলাসটা ওর মুখের কাছে এগিয়ে আনল, নে খা।

ইস, বিদঘুটে গন্ধ! পেটটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠল। মুখ সরিয়ে নিয়ে পেগো করুণ চোখে তাকাল।

খা বলছি। নইলে ফুটিয়ে দেব, খা।

গেলাসটা ওর মুখের সঙ্গে গুঁজে ধরল পঞ্চু।

অসহায়ভাবে পেগো গলার নলি দিয়ে খানিকটা নামিয়ে দিল। পেটের মধ্যে যেন গরম লোহার শিক ঢুকিয়ে দিয়েছে কেউ। ঝাঁ ঝাঁ করে ওর সারা গায়ে তাপ ছড়িয়ে পড়ল। এ্যাহ্, গলাটা যেন ওর জলে যাচ্ছে।

খা বলছি। আবার ধমকে উঠল পঞ্চু।

পেগো আবার এক ঢোক গিলতে গিলতে তাকাল। চলকে বিষম খেয়ে কিছুটা ওর নাকের ফুটোয় ঢুকে গেল।

পঞ্চু ততক্ষণে ওব চুলের মুঠি চেপে ধরেছে। আর একটু আছে খেয়ে নে। খেয়ে নে বলছি।

পেগো অসহায়ভাবে গিলতে গিলতে বাকি গেলাসটা ফাঁকা করে দিল।

সাব্বাস! যা এবার। আরো খেতে চাইবি তো হুড়কো দেব। পালা।

পেগো একপলক হিজিবিজি দেখল। যেন পুরোপুরি চোখ খুলেও তাকাতে পারছে না এমন অবস্থা। উঠে পালাবার চেষ্টা করল। কিন্তু দাঁড়াতে পারছে না কেন! অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে ও যখন দাঁড়াল, তখন মাথাটা ওর বেমালুম বাতাস ঢুকে ঢ্যাপঢ্যাপে হয়ে গেছে। ও পঞ্চুদার দিকে তাকিয়ে হিঁ হিঁ করে একটু হাসল।

পঞ্চুদা বলল, খুব হয়েছে, এবার কেটে পড় দেখি। নইলে—

পেগো পা দুটো একটু উঁচু উঁচু করে হেঁটে চালার বাইরে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এসে দেখল মস্ত বড় একটা গর্ত। গর্তে যাতে না পড়ে যায় ও এই ভেবে জোড়া পায়ে একটা লাফ লাগাল। আর ওর লাফের ভঙ্গি দেখে তিনমূর্তি খিকখিক করে হেসে মাত করে দিল খাটালটা।

ভয় পেয়ে ছুটতে লাগল পেগো।

পুকুরের পাড় বেয়ে ছুটে বেরিয়ে আসতেই হাঁফ লেগে গেল ওর। যেন যমের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে ও। বাপস্! দাঁড়িয়ে পড়ে নিশ্চিন্তে দু' বার হাঁফ টেনে ও শান্ত হবার চেষ্টা করল।

আর ঠিক এই সময়ই ও তাকিয়ে ঘোলাটে চোখে দেখল বনমালির বারান্দায় বুলবুলিটা এখনো বসে আছে। বনমালির ঘর এখনো অন্ধকার। ওরা মেয়েটাকে একা ফেলে রেখে কোথাও হয়তো গিয়ে থাকবে। কে জানে শালা, কোথায় গেছে। কিন্তু বুলবুলি, পেগো চমকে উঠল, বুলবুলিটা কি যেন একটা খাচ্ছে।

ঝম ঝম করে খুশিতে ওর বুকেব মধ্যে নেচে উঠল। আঁই শালা, গোটা একটা পাউরুটি নিয়ে বসেছে বুলবুলিটা। ছোঁ মেরে ওর হাত থেকে কেড়ে নিলে কেমন হয়। যদি চেঁচায়!

দু' এক মুহূর্ত নড়তে পারল না পেগো। ফন্দি খুঁজতে লাগল। ভয় দেখালে কেমন হয়। ভয় পেলে রুটিটা ও ফেলে দিয়েই ঘরে পালাবে, তখন মনের আনন্দে ওটাকে নিয়ে সরে পড়া যাবে।

যা ভাবা, পেগো ভয় দেখাবার ভঙ্গি খুঁজতে লাগল, কিন্তু পেটটা কেমন যেন মুচড়ে মুচড়ে উঠছে। মাথাটা ঠিক তেমনি ধরণের ঢ্যাপঢ্যাপে। হাত দুটো উপরে তুলে বকের মতো ভঙ্গি করতেও বেশ কিছুক্ষণ সময় লেগে গেল ওর। জিভটা মা কালীর মতো বার করে আনতেই মনে হল জিভটা যেন ওরই নয়, শুকনো একটা নকল কিছু ওর মুখের মধ্যে গুঁজে রাখা হয়েছে। মুখটাকে বিকৃত করে নিয়ে থপথপ করে পা উঁচিয়ে উঁচিয়ে ও বুলবুলির দিকে এগোতে শুরু করল।

বুলবুলির সেই প্রকাণ্ড একটা মাথা, ড্যাবডেবে একজোড়া চোখ, বুলবুলির সরু সরু পা। বুলবুলি তাকিয়ে আছে পেগোর দিকে। হাতের পাউরুটিটা এখন কোলে। যাক্ বাবা, বেশি খেতে পারেনি এখনো।

পেগো মুখ দিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করতে লাগল।

কিন্তু বুলবুলি কেমন নির্বিকার। মেয়েটা কি ভয়ও পায় না নাকি! ঠিক আগের মতোই তাকিয়ে আছে।

বকের মতো হাত দুটো কানের পাশে তুলে এনে নাড়তে শুরু করল পেগো। জিভটা গোড়া সুদ্ধ বাইরে বেরিয়ে এসে যেন ঝুলছে। জিভে বাতাস লেগে ও যেন ইলেকট্রিক শক খাচ্ছে। সুড়ুৎ করে জিভটাকে মুখের

মধ্যে একবার ঢুকিয়ে নিয়ে একটু ভিজিয়ে নিল। তারপর আবার ও মা কালী হল।

বুলবুলির চোখে বিস্ময়, যেন ম্যাজিক দেখছে।

পেগো আরো একটু জোরে জোরে শব্দ তুলে কাছাকাছি এগিয়ে এল। পা দুটো উঁচু উঁচু করে বার কয়েক লাফিয়ে নিল। লাফাল বটে, তবে প্রতিবারই ওর মনে হল মাটিটা যেন বেশ একটু করে নিচু হয়ে যাচ্ছে। যাহ্, শালা, গর্তের মধ্যে পড়ে যাবে নাতো ও। খুব সামলে আবার একটা লাফ দিতে গিয়ে ও হড়কে পড়ল। ওর জিভ ঢুকে গেল মুখের মধ্যে। হাত দুটো কানের পাশ থেকে নেমে এসে বিদ্যুৎ বেগে মাটি খামচে ধরল। আর সঙ্গে সঙ্গে যা ঘটল তাতে কেমন যেন বোকার মতো মিইয়ে গেল পেগো।

বুলবুলিটা ওর পড়ে যাওয়া দেখে গাধার মতো চিঁহা চিঁহা শব্দ করে হেসেই লুটোপুটি।

রাগে মাথার মধ্যে আগুন ছুটে এল কিন্তু ছুটে গিয়ে রুটিটা ওর কেড়ে নেবার আগেই বুলবুলিটা গড়াতে গড়াতে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

পেগো থ' হয়ে গেল। এই ছিল ওর কপালে, ধুস।

উঠে বেশ কিছুক্ষণ ও চুপটি করে দাঁড়িয়েই থাকল ওখানে। তারপর দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই ওর মনে হল, মাটিটা একটু কাঁপছে। যার ওপর দাঁড়িয়ে আছে পেগো, সেটাই যদি কাঁপে, চলে কি করে। ভয়ে ও কুঁজো হয়ে বসে পডতে গিয়ে এক পাশে গড়িয়ে একটু কাত হয়ে গেল।

হিঁ হিঁ, হাসি পাচ্ছিল ওর। হাসিটা একটু বাঁকা করে নিয়ে বুলবুলির মতো গোত্তা খেয়ে ওঠার চেষ্টা করল ও। তারপব কি খেয়াল হওয়ায় গডাতে গড়াতে আরো খানিকটা নিচেব দিকে নেমে এল। একটু গা হাত পা এবার খোলা বাতাসে জুড়িয়ে না নিলে আর রক্ষা নেই। পাশেই একটা ঝোপের ধারে গা গড়িয়ে ও শুয়ে পড়ল।

একবার একটু চোখ বুজল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার চোখ খুলে তাকিয়ে থাকল ও। কি যেন একটা জংলী পোকা কুরকুর করে ডাকতে শুরু করেছে ওর মাথার মধ্যে। তেমন গ্রাহ্য করল না পেগো। যেন যা হবার তা হবে, ভেবে লাভ নেই।

ছোপ ছোপ কেবল অন্ধকার। বাতাসে যেন দুলছে। অন্ধকারটা যেন ওরই মতো নানান রকম অঙ্গভঙ্গি করে ওকে ভয় দেখাতে শুরু করেছে।

চোখের পলক ফেলতেও ভুলে গেল পেগো। অন্ধকারটা যেন শিং উঁচিয়ে জিভ মেলে ধরে তিড়িং বিড়িং করে লাফাচ্ছে ওর চোখের সামনে।

যা বাবা! তাও কি কখনো হয়। অন্ধকার কি মানুষ। কেমন লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে নাচছে আবার। কুচকুচে করাতের মতো দাঁত। বকের মতো হাত তুলে ধরে বক দেখাচ্ছে ওকে।

পেগো কেমন ড্যাবডেবে চোখে তাকিয়ে থাকল। হাত পা কেমন ঝিঁঝিঁর বাসা, মাথার মধ্যে কুরকুর করে পোকার খেলা শুরু হয়েছে আবার। চোখের পাতা জড়িয়ে জড়িয়ে ঢুলে আসছে। অথচ পুরোপুরি চোখ বুজে যে পড়ে থাকবে পেগো, তেমনও ওর সাধ্য নেই। চোখের পাতা গোটা গোটা করে ও খুলে রেখে তাকিয়ে থাকল। আর ঠিক এ সময়ই অন্ধকারটা হুমড়ি খেয়ে কেতরে পড়ল ভুঁয়ে। বুলবুলি হলে চিঁহা চিঁহা করে হেসে গড়িয়ে পড়ত গাধার মতো। হাসতে পারল না পেগো। ঠায় যেমনিভাবে তাকিয়েছিল, তাকিয়েই থাকল।

আর বুঝতে পারল অন্ধকারটাই হাত পা নেড়ে জিতে যাচ্ছে! কি খুশি! দাঁত বসাবার আগে ধীরে ধীরে জিভ বুলিয়ে চাটতে শুরু করেছে ওকে।

পেগো খাদ্য খুঁজতে এসে বুঝল, ও নিজেই কখন খাদ্য হয়ে গেছে।

কালবেলা

একটি লোক একজোড়া হাঁস, একটা কুকুর ও একটা মেয়েমানুষ পুষত। হাঁস দুটো সারাদিন জলার ধারে কাদা খুঁচত, কোঁত কোঁত করে কেঁচো খেত, কখনো-কখনো ডাঙায় উঠে তালশাঁসের মত ঠোঁট দিয়ে কুরকুর করে নিজের গায়ে বিলি কাটত। সন্ধ্যা হলে লোকটা যখন লাঠি হাতে এদিক-ওদিক লক্ষ্য করে ডাকত, আঃ আঃ আঃ—তখন ওরা খুট খুট করে হেঁটে এসে একটা কাঠের বাক্সের মধ্যে ঢুকে পড়ে নিশ্চিন্ত হত। আর, কুকুরটা সারাদিন গা গড়িমসি করে আনাচে-কানাচে ঘুরঘুর করত। কখনো আবার দাওয়ার পাশে বহুকালের পুরনো যে বস্তাটা পাতা আছে তার ওপর বসে বসে হাই কাটত, ঝিমোত, ঘুমোত। রাত্রি হলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে জানান দিত, ও আছে। লোকটা কুকুরটাকে বলত, শালা শুয়রের বাচ্চা, থাকিস কোথায়, এ্যাঁ? কুকুরটা তখন খড়ঘড় করে সোহাগ-সোহাগ ভাব দেখাত। তবে মেয়েমানুষটার কথা একটু আলাদা। মেয়েমানুষটা ভাত রাঁধত, চুল বাঁধত, গা ধুত, আবার কদাচিৎ আদুরে আদুরে ভাব করে লোকটার সঙ্গে কথা কইত। লোকটা ওকে আদুরি নামে ডাকত। বলত, আদুরি, তামাক সাজ।

তা, সেই হাঁস দুটো, কুকুরটা আর মেয়েমানুষটা, এদের নিয়েই এ গল্প, তবে লোকটার কথা দিয়েই শুরু করি। লোকটা একটা উঁচু মত মাচা বানিয়ে নিয়েছিল। তিন মানুষ উঁচু। এত উঁচু যে পুরো একটা মাঠ ছুটোছুটি না করেই ও মাঠের আনাচ-কানাচ নজরে-নজরে রাখতে পারত। প্রত্যেক দিন রাত্রে মাচায় বসে ও হঠাৎ-হঠাৎ টিন পেটাত। জানান দিত, ও আছে। ও আছে, অর্থাৎ ওর ঐ ঘোলা-ঘোলা মরা মাছের মত চোখ-জোড়া, ওর গায়ের ঐ খুশকি-খুশকি চামড়ার খোলশটা, চিবুকের কাছে কাঁচা সুপুরির রঙের মত কাটা দাগটা, আর ওর সারা গায়ের ঘাম-ঘাম চাষাড়ে-চাষাড়ে গন্ধটা।

লোকটা একটা ঝুড়ো-বুড়ো একচালায় বাস করত। চালার কোণে হামেশাই চড়ুই এসে ঘর বেঁধে ডিম পাড়ত। লোকটা এমন নিষ্ঠুর ছিল যে,

ডিম ফুটে কচি-কচি কুশি-কুশি ছানা হলেই তুলে নিয়ে ও কুকুরটাকে দিয়ে খাওয়াত। মেয়েমানুষটা অর্থাৎ ঐ আতুরি একবার ভীষণ দাপাদাপি করেছিল তাই নিয়ে। লোকটা তখন রামদা নিয়ে তেড়ে গিয়েছিল ওর দিকে, শালী, ফের যদি বকবক করবি, তো তোকেও কুকুর দিয়ে খাওয়াব। লোকটা এভাবে নিষ্ঠুর হতে পেরে মনে মনে খুব খুশি হত। কিন্তু কুকুরটা যদি হাঁস দুটোকে তেড়ে যেত তাহলেও ও সইতে পারত না। একবার, সে মাস ছয়েক আগের কথা, কুকুরটা ওর অগোচরে একটা হাঁসের বাচ্চা চুরি করে খেয়ে ফেলেছিল, তাইতে ও দু'হাতে ওটাকে তুলে ধরে এমনভাবে আছড়িয়েছিল যে সেই থেকে কুকুরটা একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে। একবার, সে মাসখানেক আগের কথা, হাট থেকে একটা মুরগী এনে জবাই করবার সময় ও পেট চিরে আতুরিকে দেখিয়েছিল। দেখিয়েছিল, ঠিক কোন জায়গায় কেমন ভাবে ডিম থাকে। সেই রাত্রে আতুরি ওকে বলেছিল, তোমার প্রাণটা যেন পাথরের। লোকটা বলেছিল, আমার ইচ্ছে হয় জ্যান্ত মেয়েমানুষের পেট চিরে দেখতে কেমনভাবে ওখানে রক্তে চর্বিতে বাচ্চাটা লুকিয়ে থাকে।

লোকটার একচালা ঘরটার চাল বেয়ে বর্ষায় বর্ষায় জল গড়াত। তাইতে, খানকয়েক ক্যানেস্তাবা টিন গুঁজে তাপ্পি দিয়ে রেখেছিল ও। জলপড়া বন্ধ হলে, চালাব পেছন দিকে যে ছাইগাদা সেই ছাইগাদায় ও বাঁশ পুতে ঘরটাকে ঠেকা দিয়ে রাখত। একটা দু'টো তিনটে, তিনটে পাঁচটা সাল্টা, ঠেকা খেয়ে খেয়ে ঘরটা কেমন জর্জর হয়ে থাকত। যেন সারা গায়ে বিষ-ব্যথা নিয়ে কোনক্রমে দাঁড়িয়ে আছে। আতুরি বলত, যেমন তুমি শ্যামসুন্দর তেমন তোমার ললিতে। লোকটা বলত, দালান ধুয়ে জল খাব নাকি? আমার মত লোকদের এই বেশ।

সর্বোপরি লোকটার একটি মনিব ছিল। মনিববাবু থাকত আড়াই ক্রোশ দূরে একটা বামুন-কায়েতের গ্রামে। গ্রামের বড় সড়কের পাশে মস্ত একটা পাকা বাহারে ধরনের বাড়িতে। মনিববাবু ওকে বলত, হারামজাদা ছোট জাতের কম্ম তো, কত আর হবে। বেটা জা: চাড়াল।

অথচ লোকটা তাতে দুঃখ পেত না, কারণ ও জানত ওর বাপ চাড়াল, মা চাড়াল, ও নিজেও তাই। কিন্তু আতুরি একদিন যেই না ওকে চাড়ালের গুষ্টি বলে গালি পাড়ল অমনি ও লাফিয়ে উঠে এমনভাবে মুখ চেপে ধরেছিল যে, মেয়েমানুষটার চোয়াল যেন হাতের মুঠোয় চিপসে গিয়েছিল। তখন

রাত্রি ছিল, তাই ও বুঝতে পারে নি ওর হাতটা যে চটচট করে ভিজে যাচ্ছিল তা লালায়, না রক্তে। ভেজা হাতটা মাটিতে মুছে নিতে নিতে গজগজ করে ও শুনিয়ে দিয়েছিল, আমি চাড়াল, তাই তুই বর্তে গেলি। আমি চাড়াল বলেই তোর মত ঢ্যামনা মাগী পালতে পারি। বুঝলি?

যাই হোক লোকটার সেই মনিববাবু, একদিন ওকে ডেকে পাঠাল। লোকটা এল।

মনিববাবু বলল, শুনলাম, তোর নাকি কয়েক জোড়া হাঁস আছে?

লোকটা বলল, একজোড়া। একটা এবার ডিম পাড়বে।

ডিম পাড়বে! বেশ বেশ, সেলামীটা ভুলিস না যেন, বুঝলি?

আচ্ছা। লোকটা তখন মাথা নিচু করে ফিরে এল। কি বুঝল ভগবান জানে, সেই রাত্রে মেয়েমানুষটাকে আদর করতে করতে ও এক সময় সোনার ডিম পাড়া একটা রাজহাঁসের গল্প শোনাতে লাগল। একটা রাজহাঁস সোনার ডিম পাড়ত। বুঝলি আদুরি, একটা রাজহাঁস সোনার ডিম পাড়ত। তাই দেখে লোভে পড়ে হাঁসটার পেট চিরে ডিম বার করতে গিয়েছিল এক আহাম্মক, বুঝলি আদুরি, ডিম বার করতে গিয়েছিল এক আহাম্মক।

কুকুরটা তখন উঠানে পড়ে পরিত্রাণে চেঁচাচ্ছিল, আর হাঁস দুটো তখন গায়ে গায়ে এক হয়ে কাঠের বাক্সটার মধ্যে বসেছিল। খানিক বাদে লোকটা টিন পিটিয়ে নিজেকে জানান দেবার জন্য ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল।

যাই হোক লোকটার সেই মনিববাবু, আর একদিন ওকে ডেকে পাঠাল।

লোকটা এল।

মনিববাবু বলল, শুনলাম, তোর নাকি একটা কুকুর আছে?

লোকটা বলল, একটা।

একটা। বেশ বেশ! মাংস-টাংস খেতে দিস, তেজিয়ান হবে। বুঝলি?

আচ্ছা। লোকটা তখন মাথা নিচু করে ফিরে এল। কি বুঝল ভগবান জানে, দাওয়ার ওপর কুকুরটাকে ঝিমতে দেখে আপাদ অঙ্গ জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে। এই শুয়রের বাচ্চা, তোকে না বলেছি ঘরদোর

পাহারা দিবি? ঝিমচ্ছিস যে বড়? তোকে না বলেছি সজাগ থাকবি, ঘুমুচ্ছিস যে বড়?

তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছিল, লোকটা তাই হাঁস দুটোর খোঁজ করতে বেরিয়ে পড়ল।

যাই হোক লোকটার সেই মনিববাবু, আবার আর একদিন ওকে ডেকে পাঠাল।

লোকটা এল।

মনিববাবু বলল, শুনলাম, তোর না'কি একটা মেয়েমানুষ আছে? বলিস নি তো কখনো?

লোকটা বলল, আছে। ভাত রেঁধে দেয়, তামাক সেজে দেয়।

দেয় বুঝি? বেশ বেশ। তবে মেয়েমানুষের কথায় বেশি ওঠবস করিস না, বুঝলি?

আচ্ছা। লোকটা তখন মাথা নিচু করে ফিরে এল। কি বুঝল ভগবান জানে, লোকটা ডাকল, আদুরি, আদুরি? আদুরি এসে সামনে দাঁড়াতেই, তামাক সাজ। তামাক সাজতেই, জল দে। জলের ঘটি এগিয়ে ধরতেই, এখানে বস। বসতেই, উঠে দাঁড়া। দাঁড়াতেই, ফ্যালফ্যাল করে আদুরির দিকে তাকিয়ে ও যাচাই করে নিল সত্যি সত্যি ও মেয়েমানুষের কথায় ওঠবস করে, না ঠিক উলটোটা।

তখন খা খা রোদ চড়েছিল। লোকটা বেরিয়ে পড়ল মাঠময় একবার টহল দেবার জন্য। মাঠের গোটাটাই এক বুক উচু পুষ্ট-পুষ্ট ধান চারা। ডগা ধার কচি-কচি ধানপাতা গায়ে-পায়ে-বুকে-হাতে পরশ কাটছিল। ভেজা ভেজা সবুজ পাতার গন্ধ আসছিল। নরম নরম আলের মাটি পায়ের নিচে পিছলে পড়ছিল। লোকটা এমন ধানক্ষেতের মধ্যি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নিজেকে কেমন বোকা ভাবতে লাগল। কারণ, পুবে তখন ধানক্ষেত, পশ্চিমেও ধানক্ষেত, উত্তরেও, দক্ষিণেও অথচ লোকটা ধানগাছের কথা না ভেবে ওর হাঁসজোড়া, কুকুরটা আর মেয়েমানুষটার কথাই ভাবছিল।

এই যেমন, লোকটার কিছুদিন আগেও কয়েক জোড়া হাঁস ছিল। সব হাঁস খুঁইয়ে দিয়ে এখন কেবল দুটোয় এসে দাঁড়িয়েছে। এই হাঁস দুটো আগের দুটোর ডিম থেকে ফুটিয়ে অনেক সাধা-সাধনা করে পেতে হয়েছে ওকে। আগের একটা শেয়ালে খেয়েছে, আর একটা রোগে ভুগে মারা গেছে।

এ-দুটো যে এখনো আছে তা ওর নেহাতই কপাল ফেরে। মাদীটা এবার থেকে ডিম পাড়বে। হপ্তায় যদি দু-জোড়া করে ডিম দিতে থাকে, তবে, তার থেকে একজোড়া মনিববাবুকে দিয়ে আসতে হবে। আর বাকি একজোড়ার একটা বিক্রি করে পয়সা আনতে হবে। বাকি থাকে একটা। এই একটাকে যদি খাওয়া যায়? খেলে তো ফুরিয়েই গেল। যদি তা দিতে দেওয়া হয়, তাহলে না হয় একটা বাচ্চাই হল। তারপর? তারপর খেই হারিয়ে লোকটা কুক্‌রটার কথা ভাবতে লাগল।

কুকুটা বড় লোভী। কুকুরটাকে ও রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে নিজের দাওয়ায় ঠাঁই দিয়েছিল। ভেবেছিল, বাড়িতে একটা কুকুর থাকলে চোর বদমাস তফাৎ থাকবে। কুকুরটা ওর পাহারাদারের মত, যেমন ও নিজেই মনিববাবুর ধানক্ষেতের পাহারাদার। তা, হারামজাদার নজর যেন সবসময় ঐ হাঁস দুটোরই দিকে। বেটা হাড়ে হাড়ে শয়তান হয়ে উঠেছে। পথে কুড়নো কুকুর, বেশি তেড়িবেড়ি করলে পথেই আবার তাড়িয়ে দিতে হবে। কুকুরটার একটা সুরাহা হতে ও মেয়েমানুষটার কথা ভাবতে লাগল।

মেয়েমানুষটাকে ও পঞ্চাশ টাকা নগদ ঢেলে কিনে এনেছিল এক বাপ মায়ের কাছ থেকে। যেমন পয়সা দিয়ে বাঁশি কেনে, কি বেহালা কেনে, কি কলের গান কেনে তেমনি ও পয়সা দিয়ে, পয়সা দেবার আগে বাপ মায়ের সঙ্গে অনেক দর কষাকষি করে, মেয়েমানুষটাকে কিনে এনেছে। লোকে যেমন বাঁশি বাজিয়ে, কি বেহালা বাজিয়ে কি কলের গান বাজিয়ে সুখ পায়, ও তেমনি সুখ চেয়েছিল। সুখ সাধ আহ্লাদ পুরোপুরি মেটাবার জন্য মেয়েমানুষটার নাম রেখেছিল ও আদুরি। আদুরিকে কাছে পেয়ে ও বুঝল, যতদিন কাছে না পেয়েছিল ততদিনই সুখ ছিল। মেয়েমানুষটা ঘরে এসে লোকটার সব সুখ নিজের করে নিয়েছে, ফলে ও অসুখী হয়ে গেছে।

কিন্তু এমন হল কেন! লোকটা আবার ভাবতে লাগল। পুবে তখন ধানক্ষেত, পশ্চিমেও ধানক্ষেত, উত্তরেও, দক্ষিণেও অথচ লোকটা ধানগাছের কথা না ভেবে নিজের জীবনের গণ্ডগোলগুলির কথা ভাবতে লাগল।

যদি ও হাঁস দুটো না পালত! না পাললে ডিম বিক্রি করার কথা ওকে ভাবতেই হত না। ফলে ওর দু-চার পয়সা আয়ের পথও বন্ধ হত। হাঁস দুটো ওর না থাকলে পাহারাদার কুকুরটারও দরকার হত না। কুকুরটা ওর না থাকলে কুকুরটাকে আদর আত্তি কিংবা খেতে দেওয়ার কথাও ভাবতে হত না।

তখন ওর কেবল ঐ মনিবের দিয়ায় বাঁচতে হত। কেবল ঐ মনিবের দয়ায় বাঁচতে হলে তখন ও কাউকে আর দয়া দেখাতে পারত না। ফলে ও আতুরকেও নিজের ঘরে ঠাঁই দিতে পারত না। আতুরিকে না পুষতে হলে ও নিজের মত, নিজের হয়ে থাকতে পারত।

অর্থাৎ, ও লক্ষ্য করল, কান টানলে যেমন মাথা আসে, ঠিক তেমনি ভাবে, হাঁস দুটো, কুকুরটা, মেয়েমানুষটা, ও নিজে, ওর মনিববাবু সব কেমন একটার সঙ্গে একটা জড়ানো। একটাকে টানলে আর একটা আসে। ভারী মজার ব্যাপাব। খানিকটা গোলকধাঁধার মত। গোলকধাঁধা বলেই ও অনেকক্ষণ ধরে ভাবল। ভাবল, আর বোকার মত চারপাশে তাকাল। কারণ, পুবে তখন ধানক্ষেত, পশ্চিমেও ধানক্ষেত, উত্তরেও, দক্ষিণেও। অথচ লোকটা ধান-গাছের কথা না ভেবে গোলকধাঁধার জটে আটকা পড়ে গিয়ে একসময় থাপ্পা হয়ে গেল।

লোকটা তখন বিষ-ব্যথায় জর্জর ঘরটার কাছে ফিরে আসে। এসে প্রথমেই ওর নজর পড়ে হাঁস দুটোর দিকে। একটা আর একটার গা ঠোকরাচ্ছে। অন্যসময় হলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত লোকটা। এখন সব কেমন যেন গুলিয়ে আছে, ডাকল, আতুরি? আতুরি?

আতুরি তখন আঙুলের নখে রঙ মাখছিল, ছুটতে ছুটতে এল, কি?

বামদা দে।

কেন? রামদা কেন? রামদা কি হবে?

হাঁস দুটোকে জবাই করব। বাঞ্চোৎরা কেবল ফষ্টিনষ্টিই জানে, ডিম পাড়ছে না কেন? এঁ্যা?

সত্যি সত্যিই হাঁস দুটোকে জবাই করে ফেলত লোকটা, নেহাৎ আতুরি কেমন কৌশল করে জলার ধারে ও দুটোকে তাড়িয়ে দিল।

ফলে, লোকটা আবার ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে ঝিমিয়ে পড়ল।

ভাল কথা, হাঁস দুটো, কুকুরটা, মেয়েমানুষটা আর মনিববাবু ছাড়া লোকটার জনাকয়েক বন্ধু ছিল। বন্ধুরা সব যেমন হয়, নেহাৎ-নেহাৎ বন্ধু। অর্থাৎ লোকটা যখন মেজাজে থাকে তখন ওদের বলতে শোনা যায় মেজাজ-মেজাজ কথা। লোকটা যখন বেজারে থাকে তখন ওদের বলতে শোনা যায় বেজার-বেজার কথা।

একজন ছিল, সে বলত, ভাই হে, এই যে সব ধানগাছ দেখছ, এই যে দিকবিদিক ধানবন, বলত এসব কার ?

কার আবার, মনিবের, অর্থাৎ জমি যার তার।

উঁহু, ভেবে বল, ভেবে বল।

লোকটা তখন অনেকক্ষণ চিবুকের ওপর আঙুলের টোকা দিয়ে ভাবল। কার হবে ? কার হতে পারে ? ওঃহো, মনে পড়ল, বলল, যে চাষ করেছে তার, অর্থাৎ চাষীর।

উঁহু, চাষীরও না, ভেবে বল, ভেবে বল।

লোকটা আবার অনেকক্ষণ হিসেব কষে ভাবল। কার হবে ? কার হতে পারে ? ওঃহো, মনে পড়ল, বলল, যে খাবে তার, অর্থাৎ খরিদ্দারের, অর্থাৎ যার ঘরে চাল থাকবে তাব।

উঁহু, তারও না, ভেবে বল, ভেবে বল।

লোকটা বলল, তুমিই বল।

বলব ? বলল, সবই হচ্ছে তার, অর্থাৎ আমাদের খোদার, তোমাদের ভগবানের।

আর একজন ছিল, সে বলত, ভাই হে এই যে সব ধানগাছ দেখছ, এই যে দিগবিদিক ধানবর্ন, বলত এসব কার ?

লোকটা অমনি টপ করে বলে ফেলল, ভগবানের অর্থাৎ খোদার।

উঁহু, অমনি সে বাধা দিয়ে থামিয়ে দিল। এসব হল শেখানো কথা। আসলে কাগজপত্রে এ হচ্ছে তোমার মনিবের, কিন্তু বে-আইনীভাবে তোমার।

আমার ? লোকটা কেমন হকচকিয়ে গেল।

হ্যাঁ তোমার, যা পার হাতিয়ে নাও বুঝলে হে ! হাতিয়ে নাও।

আর্ একজন ছিল, সে বলত, ভাই হে, এই যে সব ধানগাছ দেখছ, এই যে দিকবিদিক ধানবন, বলত এসব কার ?

লোকটা অমনি টপ করে বলে ফেলল, কাগজপত্রে মনিবের, বে-আইনী-ভাবে আমার।

উঁহু, অমনি সে বাধা দিয়ে থামিয়ে দিল। এসব হল শেখানো কথা। আসলে এ হচ্ছে ভাগ্যের। তোমার ভাগ্যে নেই, তাই তুমি পাচ্ছ না। মনিবের ভাগ্যে আছে তাই সে পাচ্ছে।

এমনি ধরন লোকটার অনেকজন বন্ধু ছিল। বন্ধুদের সঙ্গে কখনো-সখনো দেখা হত। কখনো হাটে, কখনো গাঁয়ে, কখনো পথে। হাট কিংবা গাঁ কিংবা তেমন-তেমন পথ সবই ওর বিষ জর্জর ঘর থেকে অনেক দূরে দূরে ছিল। কারণ, ওর মনিবের ইচ্ছে ছিল হাট থেকে, গাঁ থেকে কিংবা তেমন-তেমন পথ থেকে ও দূরে থাকে। তাই ও লোকালয় থেকে দূরে যেখানে চারদিকে ধানক্ষেত আর মাঝখানে এই টিলার মত উঁচু জায়গা, এই জায়গাতে ঘর বেঁধে নিয়েছিল। আর মনিববাবু ওকে সাবধান করে দিয়েছিল, শালিক কি চড়ুইও যেন ঠোটে করে ধান নিয়ে না পালায়।

শালিক কি চড়ুই কি মাছি কি পিঁপড়ে কিছুই ওর নজর এড়াত না। কারণ, রাত্রে ও মাচায় উঠে টিন পেটাত, দিনে ও লাঠি হাতে সারা মাঠ ঘুরে বেড়াত।

একবার ও লক্ষ্য করল ঝাঁকে ঝাঁকে বানর আসছে। ও ঠিক করল একে একে সব বানর মেরে ফেলবে। প্রথমে একটাকে হাতের কাছে পেয়ে যাওয়ায় লাঠি পিটিয়ে মেরে ফেলল। হঠাৎ একটা বানর মারায় ওর কেমন মজা লাগল। মরা বানর পিঠে চাপিয়ে মনিববাড়ি দেখাতে গেল।

মনিব তখন গড়গড়া টানছিল। লোকটাকে দেখতে পেয়ে বিকটভাবে হেসে উঠল। বলল, হারামজাদা জাত চাড়ালের কম্ম দেখ, ভাগ ভাগ। রেঁধে খা গে যা।

লোকটা তাতে বুদ্ধ হয়ে পালিয়ে এল। এসে সড়ক ধরে হাঁটতে লাগল। তখন মরা বান'বর আঙুলগুলি পিঠের ওপর আঁচড়াচ্ছিল। লোকটা খানিক-দূর এড়িয়ে এসে লক্ষ্য করল, ওর কুকুরটা কি ভাবে যেন টের পেয়ে পিছু নিয়েছে। কুকুরটা তখন ঘেউ ঘেউ ক'রে ডাকছিল।

আরো খানিক এগিয়ে এসে লোকটা লক্ষ্য করল ওর মুখোমুখি একজন বন্ধু আসছে। বন্ধু বলল, সে কী হে, চলেছ কোথায় বাহন নিয়ে? বানরটা কি মারলে নাকি?

লোকটা বলল, মারলাম।

মারলে! জানো না জীব হত্যায় পাপ হয়।

জানি, তবু মারলাম। লোকটা না দাঁড়িয়ে হনহন করে এগিয়ে গেল। কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে পিছনেই আসছিল। পথটা যেখানে হারিয়ে গেল সেখানে হাট। হাট তখন গমগম করছিল। মেলাই লোক, মেলাই জন। তার মধ্যে ও আর একজন বন্ধুকে দেখল। বন্ধুটি এগিয়ে এসে শুধোল, সে কী হে, চলেছ কোথায় বাহন নিয়ে? বানরটা কি মারলে নাকি?

লোকটা বলল, মারলাম।

মারলে! বেশ বেশ। মানুষের ক্ষতি করে যারা তাদের মারলে পুণ্যি হয়।

লোকটা আবার না দাঁড়িয়ে হনহন করে এগিয়ে গেল। কুকুরটা তেমনি ঘেউ ঘেউ করে পিছনেই আসছিল। হাটটা ফুরুলে আবার একটা পথ, সেই পথে আরো খানিক এগিয়ে এসে একটা গ্রাম। সারা গ্রাম আম জাম জারুলে ঢাকা ছায়া-ছায়া ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা। লোকটা খানিক জিরোবে বলে একটু বসল। মরা বানরের আঙুলগুলি পিঠের ওপর আঁচড় কাটায় পিঠটা কেমন জ্বালা-জ্বালা করছিল। এমন সময় আবার আর এক বন্ধু। সে কী হে, চলেছ কোথায় বাহন নিয়ে? বানরটা কি মারলে নাকি?

লোকটা বলল, মারলাম।

মারলে! ছি ছি, না মারলেই পারতে। মারতে হয়তো হাতী মারবে, এসব মারা শোভা পায় না তোমার। তার চে এক কাজ কর না।

কি?

ফাঁদ পেতে যত খুশি ধরে ধরে চালান দাও।

দেব। লোকটা আবার উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেল। কুকুরটা আবার পেছন পেছন আসতে লাগল। আম জাম জারুলে ঢাকা ছায়া-ছায়া ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা গ্রামটা পেরুলে মাঠ। ধানবনের মাঠ। সরু-সরু পেছল-পেছল আল। আল ধরে সাপের মত এঁকেবেঁকে লোকটা একসময় অনেকক্ষণ ধরে হেঁটে-হেঁটে নিজের ডেরায় এসে পৌছল। তারপর, কি এক খেয়াল হল, লম্বা একটা বাঁশের মাথায় বানরটাকে বেঁধে বাঁশের গোড়া ধানবনের মধ্যে পুঁতে রাখল।

আহুরি বলল, কি করছ? গন্ধ হবে না? পচা গন্ধে টিঁকতে পারবে?

লোকটা বলল, তামাক সাজ। ভাবখানা যেন সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর। যা ইচ্ছে তাই করতে পারার ক্ষমতা আছে।

কুকুরটা তখনও বাঁদর ঝোলানো বাঁশটার কাছে বসে। হাঁস দুটো কোথায় ? তামাকে দুটো লম্বা-লম্বা টান দিয়ে লোকটা হাঁসের বাক্সের কাছে এসে থমকে পড়ল। একজোড়া ধবধবে ডিম দেখা যাচ্ছে। আদুরি, আদুরি, লোকটা চেঁচিয়ে জানান দিল, একজোড়া ধবধবে ডিম দেখা যাচ্ছে।

লোকটা তখন খুশিতে আটখানা। এত খুশি যে কি করবে ভেবে না পেয়ে ডিম দুটো গামছায় বেঁধে ছুটতে ছুটতে মনিববাড়ি দিয়ে এল।

এমনিভাবে দিন আসে দিন যায়। রাত আসে রাত যায়। আঁধার যায়, আলো যায়। তা, মেজাজ যদি ভাল থাকে, সবাই ভাল। মেজাজ যদি খারাপ থাকে, সবাই খারাপ। তাই আজ যে বন্ধু কাল সে শত্রু, কাল যে শত্রু পরশু সে বন্ধু। বন্ধুরা সব এমন হয়। কিন্তু হাঁস দুটো কুকুরটা মেয়েমানুষটা রোজই বন্ধু রোজই শত্রু। আর মনিববাবু বন্ধুও না শত্রুও না। মনিব ওর জীবন। জল যেমন জীবন, বায়ু যেমন জীবন, মনিব তেমনি জীবন। এ সব কথা সত্যি সত্যি ছড়িয়ে ছিটিয়ে লোকটা অনেকক্ষণ ধরে ভাবত।

কিন্তু একদিন যায় দুদিন যায় তিনদিন যায়, লোকটার একদিন ব্যামো হল। ভীষণ ব্যামো। এমন ব্যামো যে লোকটা যেন আজ যায় কাল যায়। যায়-যায়। তাই, একদিন যায় দু'দিন যায় তিনদিন যায় কুকুরটা দাওয়া ছেড়ে নড়তে চায় না। কেঁউ কেঁউ করে সারাক্ষণ কাঁদে। জানায় ওর বড় ভাবনা হয়েছে। লোকটা যদি মরে যায় তখন ও কি করবে!

মেয়েমানুষটা সারাক্ষণ বিছানার পাশে বসে থাকে। একদৃষ্টে বোবার মত তাকিয়ে থাকে, জানায় যে ওরও বড় ভাবনা হয়েছে। লোকটা যদি মরে যায় ওর তখন কি হবে!

হাঁস দুটো গা ছেড়ে ছেড়ে এদিক-ওদিক করে। কাঠের বাক্সটার কাছে এগিয়ে এসেও ঢুকতে চায় না। কোথায় যেন একটা বেচাল হয়েছে।

একদিন যায় দুদিন যায় তিনদিন যায়, মনিব একদিন পাইক পাঠাল। হ্যাঁ হে, পাইক বলল, আর যে বড় ডিম পেটাও না রাত্রে ?

লোকটা তখন প্রলাপ বকছিল, বলল, বাঁদরের চোখ দুটো এখনো ঐ বাঁশের ডগায় ঝুলছে। আদুরি, ও দুটোকে নিয়ে এসে কুকুরটাকে খেতে দে। বাঁদরের চোখ দুটো এখনো…

আছুরি বলল, শোন কথা! বাঁদরটাকে কবেই তো বাপু চিল শকুনে খেয়ে গেছে।

পাইক বলল, শোন কথা! আমি যে বলছি টিন পেটাও না কেন, তা, কথা বুঝি আর কানে যায় না! বলতে বলতে ঘর ছেড়ে দাপাতে দাপাতে বাইরে আসে।

কুকুরটা তখনও কেঁউ কেঁউ করে কাঁদছিল, হঠাৎ কেমন চেঁচিয়ে উঠল। দাপাতে-দাপাতে পাইক যখন চলে যাচ্ছিল তখন ওর নজরে পড়ল হাঁসের বাক্সটা' বাক্সটা ও খোঁচা দিয়ে উলটে দিয়ে গেল। আর অমনি তখন হাঁস দুটো পড়িমরি ধানক্ষেতের দিকে পালিয়ে গেল।

একদিন যায় দুদিন যায় তিনদিন যায়, একদিন স্বয়ং মনিব এসেই হাজিব! হ্যাঁ হে, মনিব বলল, আর যে বড় টিন পেটাস না রাত্রে।

লোকটা তখনও প্রলাপ বকছিল। বলল, একজোড়া হাঁস সোনার ডিম পাড়ত। চেয়ে দেখ, চেয়ে দেখ, লোকটা এমন আহাম্মক যে চাকু দিয়ে হাঁসটার পেট চিরে ফেলেছে। চেয়ে দেখ, চেয়ে দেখ ··

আছুরি বলল, শোন কথা, সোনাব হাঁস বুঝি ডিম পাড়ে! মাথাটাই খাবাপ হয়ে গেছে।

মনিব বলল, শোন কথা। হারামজাদা জাত চাডালটাই ডুবিয়ে মারল।

লোকটার দিকে মুখ করে থুতু ছেটাতে ছেটাতে বাইরেব দিকে চলে এল।

কুকুরটা তেমনি' কেঁউ কেঁউ কবে দাওয়ায় বসে কাঁদছিল। হঠাৎ কেমন চেঁচিয়ে উঠল। হাঁস দুটো যেন সাড়া পেয়েছে আগেই, ধানবনের দিকে গা লুকাল।

একদিন যায় দুদিন যায় তিনদিন যায়, লোকটা একদিন সুস্থ হল। উঠে বসল, হাঁটাচলা করল। ঘর ছেড়ে বাইরে এসে লোকটা দেখল, আর-সব ঠিকই আছে, কেবল ধানের শীষে পাক ধরেছে। সবুজ সবুজ দুধে-ধান হলুদ রঙে রাঙা হয়েছে। নাকটার ভারী হালকা হালকা লাগতে লাগল। ধানের শীষে যেমন ভাবে উদাস-উদাস বাতাস বইছিল তেমনি ভাবে উদাস উদাস, বুকটা যেন হালকা-হালকা লাগছিল।

আর সব ঠিকই আছে, হাঁসের বাক্স, হাঁস দুটো, দাওয়ার ওপর বস্তাটা,

কুকুরটা। আর সব ঠিকই আছে, এমন কি ওর মেয়েমানুষটাও। লোকটা তখন মেয়েমানুষটাকে শুধোল, আদুরি হাঁস দুটো কি ডিম দেয় না ?

দেয়। যা দেয় মনিববাড়ি দিয়ে আসি।

আবার খানিকক্ষণ বাদে লোকটা শুধোল, আদুরি, কুকুরটা আর পাহারা দেয় না ?

দেয়। যা দেয় তোমাকেই, তাই তো দেখি।

আবার খানিকক্ষণ বাদে লোকটার মনে একটা সন্দেহ এল। ইচ্ছে হল শুধোয়, আদুরি, মনিববাবু তোকে লোভ দেখায় না! বলে না যে—, ভাবতে গিয়ে লোকটার কেমন খারাপ খারাপ লাগতে লাগল।

সেই রাত্রে মেয়েমানুষটাই একসময় ফিসফিস করে বলল, জানো গা কেমন বিষ বিষ লাগে, গুলোয়। আর বেশি দিন বাঁচব না আমি, জানো।

তাই শুনে লোকটা ভীষণ ভয় পেল। পাথরের মত শক্ত হয়ে মেয়েমানুষটাকে আঁকড়ে রইল। এমনভাবে আঁকড়ে রইল যেন বোঝাতে চাইল, মনিববাবুর অনেক টাকা, অনেক বল। ও যদি চায় গোটা পৃথিবীটাকেই কিনতে পারে। তখন, আমার কি হবে! আমার দেখ, অল্প টাকা, অল্প বল। আমার কি হবে! ও যদি চায়, হাঁস দুটো, কুকুরটা, মেয়েমানুষটা সব, সবাইকে কিনতে পারে। বল, আদুরি তুই বল, তাই বলে ও তোকেও কিনে নেবে!

আদুরি বলল, আজ তুমি পাহারা দেবে না ?

লোকটা বলল, দেব। বলতে বলতে উঠে গেল ধানক্ষেত পাহারা দিতে।

তখন শিরশির করে বাতাস বইছিল, ধানবনের গোড়ায় গোড়ায় ব্যাঙ ডাকছিল, ধানপাতায় দোল খেয়ে জোনাক জ্বলছিল। তখন কাঠের বাক্সটার মধ্যে গায়ে গায়ে এক হয়ে হাঁস দুটো ঝিম খেয়ে বসে ছিল। ছায়া দেখে চমকে চমকে কুকুরটা কেবল এদিক-ওদিক তেড়ে যাচ্ছিল। তখন টাকড়ায় বিষম লাগা রাত্রিটা যেন ভীষণ একটা বোঝার মত ঘাড়ে গর্দানে চেপে বসেছিল।

লোকটা একপরতা টিন পেটাল। একপরতা জোনাকগুলোকে জ্বলতে দেখল, নিবতে দেখল। একপরতা কুকুরটাকে ছুটতে দেখল। তারপর ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে ভাগ্যের কথা ভাবতে লাগল। ভাবতে ভাবতে ভাবতে, যখন খুব উত্তেজনা এল, তখন আবার টিন পিটিয়ে ও জানান দিল। জানান দিল, ও আছে। ও আছে, অর্থাৎ ওর ঐ রোগা লম্বা চেহারাটা, ওর ঐ ঘোলা-ঘোলা মরামাছের মত চোখজোড়া, ওর গায়ের ঐ খুশকি-খুশকি চামড়ার খোলশটা,

চিবুকের কাছে কাঁচা সুপুরি বঙের মত কাটা একটুখানি দাগটা, আব ওর সারা গায়ের ঘাম-ঘাম রোগা-রোগা গন্ধটা।

একদিন যায় হুদিন যায় তিনদিন যায়, একদিন গায়ে পড়ে এক বন্ধু এসে উপদেশ দিল, জানো হে, সন্দেহ করা পাপ। পাপ যেন আগুনের মত। দগ্ধে দগ্ধে পুড়িয়ে মারে। মন পোড়ে, দেহ পোড়ে, সুখ পোড়ে, জানো ?

লোকটা বলল, জানি।

জানো, তবু কেন সন্দেহ কব ?

কেন কবি ? জানি না।

একদিন যায় হুদিন যায় তিনদিন যায়, একদিন গাযে পড়ে আব এক বন্ধু এসে উপদেশ দিল, জানো হে, ঈর্ষা বড পাপ। পাপ যেন আগুনেব মত। দগ্ধে দগ্ধে পুডিযে মাবে। মন পোড়ে, দেহ পোডে, সুখ পোডে জানো ?

লোকটা বলল, জানি।

জানো, তবু কেন ঈর্ষা কর ?

কেন করি ? জানি না।

একদিন যায় হুদিন যায় তিনদিন যায়, আবাব একদিন গায়ে পডে আর এক বন্ধু এসে উপদেশ দিল, জানো হে, ক্ষোভ বড় পাপ। পাপ যেন আগুনের মত। দগ্ধে দগ্ধে পুড়িয়ে মাবে। মন পোড়ে, দেহ পোড়ে, সুখ পোড়ে, জানো ?

লোকটা বলল, জানি।

জানো, তবু কেন ক্ষোভ কর ?

কেন করি ? জানি না।

লোকটা সত্যি সত্যি জানত, সন্দেহ, ক্ষোভ, ঈর্ষাই ওকে পুডিয়ে মারছে। সন্দেহ, ক্ষোভ, ঈর্ষার মত আরো অনেক, অনেক কিছু পুড়িয়ে মারছে। জানত বলে নিজের ওপর বড় ওর ঘেন্না হত। বড্ড ওর বিরক্তি হত। ইচ্ছে হত গলায় ফাঁস দিয়ে মরে যায়, কিম্বা রামদা দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে

কলজেটা ও কেটে ফেলে। যেন, তা হলেই সব আপদ চোকে। কিন্তু হায়রে, আপদ কি আর গায়ের ময়লা। অত সহজে যায়? যেমনভাবে ব্যামো, না চাইলেও ব্যামো হয়, তেমনভাবে আপদ, না চাইলেও আপদ আসে, আসবেই। লোকটা তাই ঝিমিয়ে পড়ে।

দেখতে দেখতে দুধে-ধান হলুদ হল, ডাঁটো হল। ধানের ভারে সারা বন নুয়ে পড়ল, শুয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে কাস্তে হাতে চাষীরা সব মাঠময় ভেঙে পড়ল। ধানের গুছি জাপটে ধরে প্রাণের সুখে গান ধরল।

এমন যখন মাঠের হাল, লোকটা তখন বুঝল এবার ওর প্রয়োজন মিটবে। কারণ, এবার মাঠের ধান গোলায় উঠবে। এবার হয়ত মনিব ওকে ডেকে নিয়ে বলবে, এবার বাপু বিদেয় হ, বিদেয় হ।

তাই যদি যেতে হয়, হাঁস দুটোকে ও সঙ্গে নেবে, কুকুরটাকে সঙ্গে নেবে, আর মেয়েমানুষটাকেও সঙ্গে নেবে। নিয়ে, অন্য কোথাও, অন্য কোন মনিব খুঁজে, অন্যভাবে আবার কিছুদিন বাসা বাঁধবে। যেন, যা কিছু হোক ও তৈরী আছে। কারণ হাঁস দুটো এখনও যে ডিম পাড়ছে, কুকুরটা যে এখনো রাত জেগে পাহারা দিচ্ছে, মেয়েমানুষটা এখনও যে ভাত রাঁধছে, চুল বাঁধছে, তামাক সাজছে। এক কথায় ও যখন উঠতে বলে তখন ওরা ওঠে, ও যখন বসতে বলে তখন ওরা বসে। এবং নিজের এই ধারণাগুলো যাচাই করে নেওয়ার জন্য সন্ধ্যেবেলায় ও মাঠের দিকে তাকিয়ে থেকে ডাকল, আঃ আঃ আঃ …আর অমনি খুট খুট করে হেঁটে এসে হাঁস দুটো গঠের বাক্সের মধ্যে উঠে বসল। গভীর রাতে মাচায় উঠবার আগে ও কুকুরটাকে খিস্তি করে বলল, থাকিস কোথায়? শালা, শুয়রের বাচ্চা কোথাকার, এঁ্যা? কুকুরটা অমনি ঘড়ঘড় করে সোহাগ-সোহাগ ভাব দেখাল। আর, ভোর হলে মেয়েমানুষটাকে ও কাছে ডাকল, আতুরি, আতুরি? আতুরি এসে সামনে দাঁড়াতেই, তামাক সাজ। তামাক সাজতেই, জল দে। জল দিতেই, এখানে বস। বসতেই, উঠে দাঁড়া। দাঁড়াতেই লোকটা একগাল তৃপ্তির হাসি হাসল। কারণ, যেমনটি ও চায় তেমনটিই আছে।

সবুজ বরণ ধানের মাঠ হলুদে-সবুজ বাহার খুলে বসেছিল। দিনের আলোয় আকাশের নিচে যেন জাজিম পেতে বসেছিল। চাঁদের আলোয় রাতদুপুরে যেন তাল-তাল সোনা ছড়িয়ে পড়েছিল। দেখতে দেখতে এমন মাঠ তছনছ হয়ে গেল। কাস্তে নিয়ে চাষারা যেন যুদ্ধ করে ধান কাটছে।

লোকটা কেবল দেখল। এমন দিনে একজন এসে কু-মন্ত্র দিল, ওহে শুনছ, যা পার হাতিয়ে নাও, হাতিয়ে নাও।

পাপ হবে যে?

পাপ না করলে বাঁচে না কেউ, হাতিয়ে নাও, হাতিয়ে নাও।

এমন দিনে একজন এসে সু-মন্ত্র দিল, ওহে শুনছ, পরের ধন ওসব। মনে রেখ, মনে রেখ।

লোভ হয় যে?

লোভে পাপ, পাপে মরণ। মনে রেখ, মনে রেখ।

সেদিন রাতে আহুরি বলল, জানো, মনিব বাড়ি গিয়েছিলাম।

কেন?

মনিব আমায় জোনাকি-রঙ নাকের ফুল দেবে বলেছিল।

কেন।

কেন কি? বকশিস গো বকশিস। বকশিস জানো না, হ্যাঁ গো, তুমি আমায় বকশিস দেবে? দাও তো, একটা চাই।

কেমনভাবে বুকটা যেন চলকে উঠল। চোয়াল দুটো চড়চড় করে চাক বাঁধল। হাতের সামনে কিছু একটা পেলে যেন এক্ষুণি তা মুঠ করে চেপে ধরে মেয়েমানুষটার চোখ দুটো গেলে দেয়। জাহান্নামের জীব, জাহান্নামেই পাঠিয়ে দেয়। কে একজন ভেতরে বসে কু-মন্ত্র দিচ্ছে, পাপ না করলে বাঁচে না কেউ। কে একজন ভেতর থেকে সু-মন্ত্র দিচ্ছে, সাবধান সাবধান, পাপ করলে মরতে হয়।

আহুরি বলল, দেবে?

লোকটা বলল, কি?

তোমার ঐ হাঁস দুটো? মনিববাবু খেতে চায়।

এমন সময় লোকটা হঠাৎ মেয়েমানুষটার মুখ এমনভাবে চেপে ধরল যে হাতের মুঠোয় চোয়ালটা যেন চিপসে গেল। এখন রাত্রি, তাই ও বুঝতে পারল না হাতটা যে চটচট করে ভিজে যাচ্ছে তা লালায় না রক্তে। ভেজা হাতটা ও মাটিতে মুছে গজগজ করে শুনিয়ে দিল, আমার ইচ্ছা হয় জ্যান্ত মেয়েমানুষের পেট চিরে দেখতে, কেমনভাবে ওখানে রক্তে চর্বিতে বাচ্চাটা লুকিয়ে থাকে। আর দুদিন যাক, তোর পেটটাই চিরব। বলতে বলতে টিন পিটিয়ে নিজেকে জানান দেবার জন্য উঠে গেল লোকটা মাচার দিকে।

সারাটা রাত মাচায় বসে লোকটা কেমন যেন নিথর হয়ে গিয়েছিল। বারকয়েক মুখের মধ্যে থুতু জমিয়ে বিজবিজ করে ফেনা কাটল, বার কয়েক সেই থুতু আকাশের দিকে তাক করে ছুঁড়ে মারল। ঝড়ো কাকলাস ধানক্ষেতের চেহারাটা এমন হল কবে! হায়রে, সারা মাঠ খা খা করছে। এত বাতাস কার জন্যে গো, কার জন্যে। আহা এই যে চাঁদের আলো, কার জন্যে গো, কার জন্যে। ছিঁটে-ফোঁটা ধানের কণাটাও রেখে যায় নি ওরা। খা খা করছে, ধু ধু করছে। আহা গো, এমন সব পুষ্ট পুষ্ট ধানের চারা, কবে ওসব বুড়িয়ে গেল, কবে ওসব ফুরিয়ে গেল!

লোকটা একবার পাগলের মত হাসল। কারণ, এখন আর ওর মাচায় বসে রাত্রি জেগে টিন পেটাবার মানেই হয় না। তবুও জানান দিচ্ছে, হায়রে, তবু ও জানান দিল, ও আছে। ও আছে, অর্থাৎ ওর ঐ চোয়াড়ে লম্বা চেহারাটা ওর ঐ ঘোলা-ঘোলা মরামাছের মত চোখ জোড়া, ওর গায়ের ঐ খুশকি-খুশকি চামড়ার খোলশটা, চিবুকের কাছে কাঁচা সুপুরির রঙের মত কাটা দাগটা, আর ওর সারা গায়ের ঘাম-ঘাম চাষাড়ে-চাষাড়ে গন্ধটা।

লোকটা তারপর বসে বসে নিজেরই মাথার চুল ছিঁড়ল। আকাশের চাঁদটাকে সাক্ষী মেনে অনেক কথা বলতে চাইল। হাতের পাঞ্জা দুটো বারে বারে মুঠ করল, খুলে ধরল। ঘোলাটে চোখে সারা মাঠ দেখতে দেখতে এক-সময় ওর মনে হল ও যেন একটা কুশ পুতুল। যে পুতুলটার মুখ পুরনো হাঁড়ির মত তুম্বো, ভীষণ কালো, কালো আর ঠুনকো। যে পুতুলটার কালো মুখে চুন বুলিয়ে চোখমুখ দগদগে করে এঁকে নেওয়া। যে পুতুলটার গায়ে একটা আলখাল্লা চড়ানো। আলখাল্লার হাত দুটো লম্বাভাবে ছড়িয়ে আছে। ছড়িয়ে থাকে, নড়েও না চড়েও না। বাতাস পেলে কাঁপে, না পেলে কাঁপেও না। আলখাল্লার নিচে একটা মেরুদণ্ড। শুধু দণ্ড, মেদ নেই, মাংস নেই, ফুসফুস নেই, হৃদয় নেই। যে পুতুলটাকে কাক চড়ুই তাড়াবার জন্য দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। সোনার ফসল ফুরিয়ে যেতেও পুতুলটা অমনি দাঁড়িয়ে রইল।

লোকটার তখন চোখ ঝাপসা হয়ে বাষ্প বেরিয়ে আসছিল। লক্ষ্য করল, কুকুরটা কেবল পরিত্রাহি চেঁচিয়ে যাচ্ছে। হাঁসের বাক্সটা নিথর। বাক্সের ওপর গুটিকয় জোনাকি বসেছে। জোনাকগুলো জ্বলছে, নীল বর্ণ কুচি কুচি মুক্তোর মত, জ্বলছে। একটানা ঝিনঝিন করে ঝিঁঝি ডাকছে।

একটানা শিবশির কবে বাতাস বইছে। একটানা ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভেজা-ভেজা বরফ-চাঁদের আলো ঝরছে। ঝরতে ঝরতে একসময়, সব আলোই ফুবিযে গেল। তখন ভোর হল। সারা আকাশ আগুন লাগলে যেমন হয়, তেমনি ধাবা রাঙা হল, ফরসা হল। লোকটা তখন মাচা থেকে নেমে এল। নেমে এসে প্রথমেই সে হাঁসের বাক্সটার দিকে এগোল। বাক্সের মধ্যে হাঁস দুটো নডাচডা কবছিল। বাক্সেব গাযে হাত না দিযেও কেমন যেন অনুভব কবল লোকটা। এ:পলক কি যেন ও ভাবে, তারপব হাঁস দুটোব টুঁটি ধবে হাঁটতে থাকে।

আদুরির চোখে ঘুম ঘুম ঢল, ও কি ? যাচ্ছ কোথায ?

মনিব বাডি।

কেন ?

হাঁস দুটোকে বিদেয কবতে।

বিদেয কবে ফিবে এসে লোকটা আবার ভাবতে লাগল, এবাব থেকে আর কখনো এমনভাবে হাঁস পালবে না ও। হাঁস দুটোকে না পাললে ঝবতি পডতি আযেব পথও বন্ধ হবে আজ থেকে। হাঁস দুটোকে না পাললে দিন চালাতে কষ্ট হবে এখন থেকে। তা হোক, ও দুটোকে না পাললে কুকুবটাকেও দবকার নেই। ঠিক যেমনভাবে মাঠেব ধান গোলায় ওঠায লোকটাবও আব দবকাব নেই। ফলে, রাগটা ওব কুকুবটার ওপব ছডিযে পডল। ডাকল, আদুরি ? আদুবি ?

আদুরি তখন ভাত রাঁধছিল, ছুটতে ছুটতে এল, কী ?

রামদা দে।

কেন ? রামদা কেন, কি হবে ?

কুকুবটাকে জবাই করব। বাঞ্চোৎটা অত চেঁচায কেন, এ্যাঁ ?

সত্যিই হয়তো কুকুবটাকে জবাই করে ফেলত লোকটা। আদুবি কেমন কৌশল করে জন্তুটাকে অনেক দূরে তাডিয়ে এল।

ফলে লোকটা আবার ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে ঝিমিযে পডল।

ভাল কথা, হাঁস দুটোকে বিদেয় করায়, লোকটার এখন কেবল মাত্র কুকুরটা আর মেয়েমানুষটাই সম্বল। কুকুরটা কেমন মনমরা। লোকটার

যখন ব্যামো ছল, তখন যেমন কেঁউ কেঁউ করে কাঁদিত এখনও তেমন কেঁউ কেঁউ করে কাঁদে। কিন্তু মেয়েমানুষটার কথা আলাদা। তখন যেমন চুল বাঁধত, ভাত রাঁধত, গা ধুত, আবার আদুরে-আদুরে ভাব করে কথা কইত, এখনও তেমনি চুল বাঁধে, ভাত রাঁধে, আবার আদুরে-আদুরে ভাব করে লোকটার সঙ্গে কথা [illegible]। বলে, জান, গা কেমন গুলায়, বিষ বিষ লাগে।

লোকটা বলে, তাহলে চল অন্য কোথাও পালিয়ে যাই।

গিয়ে?

নতুনভাবে সুখ খুঁজি।

খুঁজে?

তুই বাঁচবি, আমি বাঁচব। তুই আমি দুজনেই শুধু ভোগ করব। তুই আমি দুজনেই, শুধু দুজনেই। তখন সব দুঃখ ঘুচবে। তখন সব জ্বালা মিটবে।

এ [illegible] কথা ভাবতে ভাবতে একদিন গেল, দুদিন গেল, তিনদিন গেল। তৃতীয় দিন লোকটা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল। আদুরি, আদুরি? আয়, দেখে যা, কুকুরটা কেমন ফাঁদে পড়েছে।

আদুরি দেখল বানর ধরার ফাঁদে কুকুরটা কেমন চিতিয়ে পড়েছে?

লোকটা বলল, দেখত, ওটা মরেছে, না বেঁচে আছে?

মরেছে।

মরেছে! যাক, আপদ গেল।

একদিন গেল দুদিন গেল তিনদিন গেল।

এমন সময় সেই মনিববাবু একদিন ওকে ডেকে পাঠালো।

লোকটা এল।

মনিব বলল, শুনলাম, কুকুরটা নাকি তাড়িয়ে দিয়েছিস?

লোকটা বলল, দিয়েছি।

দিয়েছিস। বেশ বেশ। কুকুর-টুকুর পোষা শোভা পায় না তোর।

লোকটা তখন মাথা নিচু করে ফিরে এল। এসে দাওয়ার ওপর তখনও সেই বস্তাটাকে পাতা দেখে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। তখন সন্ধ্যে হয়ে আসছে দেখে হুকুম করল, আদুরি তামাক সাজ।

একদিন গেল দুদিন গেল তিনদিন গেল।

এমন সময় সেই মনিববাবু, আর একদিন ওকে ডেকে পাঠালো।

লোকটা এল।

মনিববাবু বলল, তা যাই বলিস, হাঁসের মাংস কিন্তু তোফা খেয়েছি। বেশ পুষেছিলি কিন্তু, বেশ।

লোকটা তখন মাথা নিচু করে ফিরে এল। ঘরের কোণে কাঠের বাক্সটার কাছে এসে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। তখন ছিল ভর দুপুর, লোকটা তাই হুকুম করল, আদুরি ভাত বাড়।

একদিন গেল দুদিন গেল তিনদিন গেল।

এমন সময় সেই মনিববাবু, আবার একদিন ওকে ডেকে পাঠালো।

লোকটা এল।

মনিব বলিল, মেয়েমানুষটাকে কি করবি? তার চে বরং আমায় দে। এখানে থাক। দিবি?

লোকটা বলল, দেব। বলতে বলতে মাথা নিচু করে খানিকটা দূর এগোল। এগিয়ে পড়িমরি ছুটতে ছুটতে পালিয়ে এল। বাড়ির দাওয়ায় পৌঁছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে ডাকল, আদুরি? আদুরি?

আদুরি তখন পায়ের নখে রঙ মাখছিল, কী? কেন?

লোকটা বলল, চল, এখনি আমরা পালিয়ে যাই।

কোথায়?

যেদিক ইচ্ছে, সেদিক।

সারা মাঠ তখন খা খা করছে, ধু ধু করছে। তপ্ত তপ্ত বাতাস বইছে। এত বাতাস, কার জন্যে গো, কার জন্যে। ছিঁটেফোঁটা ধানের কণাটাও রেখে যায় নি ওরা। খা খা করছে, ধু ধু করছে। আহা, কার জন্যে গো, কার জন্যে।

লোকটা তখন আদুরির হাত শক্ত করে চেপে ধরল। বলল, চল, চল। এখানে নয়, এখানে নয়, অন্য কোথাও। চল, চল, থামিস না। এখানে নয়, এখানে নয়, অন্য কোথাও। চল, চল।

আদুরি বলল, পারছি না যে।

লোকটা বলল, চল, চল, এখানে নয় এখানে নয় অন্য কোথাও।

একদিন গেল, দুদিন গেল, তিনদিন গেল।

একমাস গেল, দুমাস গেল, তিনমাস গেল।

শীত গেল, বসন্ত গেল, গ্রীষ্ম গেল।

একদিন সারা আকাশ ডিমিডিমি, মেঘ নামল। বর্ষা এল। অঝোর ক্ষ্যাপা বাতাস বইল, বর্ষা এল। ঝিলিক দিয়ে বাজ পড়ল। বজ্রাঘাতে সুপুরি গাছ কুঁকড়ে এল। ভিজতে ভিজতে জাতচাষাবা মাঠে নামল। বর্ষা এল। এমন বর্ষা, এমন বর্ষা!

মনের মধ্যে ময়ুর নাচছে। চারাধানের ফুর্তি কি! এমন বর্ষা, এমন বর্ষা!

এ বর্ষায়, লোকালয় থেকে অনেক দূরে, বহুকালের পুরানো ইট ঝুরো ঝুরো এক মন্দিরের মাঝে রাত গভীরে একদিন প্রদীপ জ্বলল। গা ছমছম দত্যি-দানো পাশেই আছে। ফিসফিস করে তিনটে লোক তাই কথা বলছে।

।দাই বলল, আহা, দেখ দেখ, মুখখানা যেন বাপের মত।

আত্মার বলল, কিন্তু গায়ের রঙটা মনিবের চেয়েও ফর্সা হয়েছে।

লোকটা বলল, তাই না ওকে চিনতে পারলাম। কে জানে আমার মতই ভাগ্য কিনা।

বাইরে তখন অঝোর হয়ে বৃষ্টি ঝরছে: গা ছমছম দত্যিদানো পাশেই আছে। কে জানে এসব ওবা শুনল কিনা!

তাই বলছিলাম, একটা লোক একজোড়া হাঁস, একটা কুকুর ও একটা মেয়েমানুষ পুষত। কিন্তু যে কথা বলি নি সে কথা কে না জানে, লোকটাকে পুষত অনেকে, অনেক কিছুতে।

বলিছে সোনার ঘড়ি

লোকে ডাকে বড় লাট। মোহিনী একগাল হাসে।

কে মোহিনী ?

আমাদের মোহিনী. মোহিনীমোহন। নিচেব পাটিতে দাঁতেব সংখ্যা কয়েকটা কমে গেছে। আগে দাড়ি রাখত না, এখন বাখে। এখন বয়স হয়েছে তিন কুড়ির কিছু বেশি। এ বয়স থেকেই মানুষ তিন-ঠেঙে হতে থাকে, কিন্তু মোহিনী এখনো দিব্যি দু-ঠ্যাঙেই হিল্লি দিল্লী করতে পারে। দেখে মনে হয়, বেশ মজবুত আছে ভিতরের মাল-মশলা। সবাই জানে, মোহিনী জীবন শুরু করেছিল বিশাল হওয়াব স্বপ্ন নিয়ে, বিশাল একটা মহীরূহেব মত নিজেকে বিস্তার করে যাওয়ার বাসনা নিযে। কিন্তু যৌবনকাল থেকেই দাসত্ব কবেছে বাংলা দু নম্বরের।

ফলে যা হয়, খুব মেজাজী লোক বলে খ্যাতি আছে ওব। মোহিনীব নিজেব ভাষায়, মানব জনম যখন পেয়েছি তখন আর ছেড়ে কথা কই কেন! বাঁচতে হয়তো লাটের মতই বাঁচব। তাও আবাব ছোটলাট নয়, বড়লাট। আব জীবনভর সাধনা করে যাব।

কি সাধনা ?

প্রেমের সাধনা, ভালোবাসাব সাধনা। সবাই তারিফ করে যাবে, হ্যাঁ বড়লাটের মতই একজন মানুষ এই জগৎ সংসারে ভালোবেসে বেঁচেছিল বটে। সাবাস বড়লাট, সাব্বাস।

ফলে এসব ক্ষেত্রে যা হয়, পাঁচ পা-আলা গরুর পেছনে যেমন মানুষ লাগে, খোঁচায়, উত্যক্ত করে, লেজ ধরে টানে, ঠিক তেমনি মোহিনীকে দেখে ফোড়ন-কাটা লোকেরও অভাব হয় না। একটু ঝাল-নুন মিশিয়ে গা জ্বালা করা কথা শোনাতে পারলে আর রক্ষা নেই, অমনি ঝিক্কর দেয় মোহিনী, এই শালা ফুটো শানকি, বেশি ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করবি না বলচি। দুধ আর পিটুলি বুঝি এক!

মোহিনী যত রাগে, ছেলে ছোকরারা তত রাগায়। ছেলে ছোকরাদের

ভাম্বি বড় খারাপ। মোহিনী তখন অবস্থা বুঝে কিছুটা বোধ করি থিতিয়ে যায়। দরদ ঢেলে বোঝাবার চেষ্টা করে জীবনের কথা। জীবন কি? জীবন কেমন? বাপ মায়ে তো জন্ম দিয়েই খালাস, কিন্তু বাঁচার মতো বাঁচতে পারে কজন? অথচ যে-জন ভজে, যে-জন সাধনা করে, তার বাঁচায় যে সুখ সে সুখের স্বাদ কি করে পাবি তোরা? পাবি না।

বটে। তুমি পেয়েছ বুঝি বড়লাট?

পাই নি এখনো, তবে পেয়ে যাবো। বীজ বপন করলে যদি গাছ হয়, সাধনা করলে কি সিদ্ধি হবে না? আলবাত হবে। তবে কি জানিস? গণ্ডগোলটা হচ্ছে অন্যত্র।

কোথায়, কোথায়? হামলে পড়ে শুধায় সবাই।

মোহিনী বলে, গণ্ডগোলের মূল হচ্ছে একটা শব্দ। কান পেতে একটু লক্ষ্য কর, তোরাও শুনতে পাবি। শুনতে পাচ্ছিস?

কি শুনতে পাচ্ছিস?

শুনতে পাচ্ছিস না, আরে সেই যে একটা শব্দ, ঘড়ির মত একটা শব্দ।

লে হাওয়া, কিসের ঘড়ি গো আবার?

সোনার ঘড়ি রে, সোনার ঘড়ি। সোনার ঘড়ি কি বলে জানিস না, বলিছে সোনার ঘড়ি টিক টিক টিক। ওই শালাই মনে করিয়ে দিচ্ছে সময় বড় অল্প।

ছেলে ছোকরারা অপরিসীম মজা পায়। তুমি শুনতে পাও বুঝি বড়লাট?

আমি একা কেন, সবাই পায়। তবে শুনেও যদি কেউ না শোনার ভান করে আমি কি করতে পারি। আসলে বুঝলি, সেই বেটা ঘড়িআলাই যত-নষ্টের গুরু। ডম্বরু বাজিয়ে ধেই ধেই করে নেচে যাচ্ছে। নাচছে, নাচছে আর নাচছে। আর নাচার তালে তালে শব্দ হচ্ছে।

বটে, বটে! তুমি তাহলে শুনতে পাচ্ছ বড়লাট, কিন্তু শুনে কোন আঁটিটা বাঁধছ? হি হি।

এাই, ফের খারাপ কথা। বলেছি না খারাপ কথা মুখে আনবি না। বাঁচতে চাস তো এখনো তোদের সময় আছে, সাধনা কর।

কার সাধনা গো, রামায়ণীর?

এবার যেন বুকের মধ্যে দপ করে আগুন জ্বলে ওঠে; উক্তিটার মধ্যে

মুখরোচক কিছু মশলা আছে। চেঁচিয়ে ওঠে মোহিনী, এই শালা ফুটো শানকি, বাপ মা তোদের বৃথাই জন্ম দিয়েছিল দেখছি। সারাটা জীবন কাদা ঘেঁটে ঘেঁটেই গেল।

এইভাবে একবার ওকে চটাতে পারলে রসালো বসালো খিস্তি শোনা যায়, কিন্তু না চটিয়ে একটু ভ্যানতাড়া করলে পাওয়া যায় ক্ষীর সমুদ্রের সন্ধান।

আসলে যা সত্যি, তা হচ্ছে, মোহিনীর কোন পিছটান নেই। পিছনে যে বয়সগুলো চলে গেল, সেগুলো তো আর ফিবে পাওয়াব উপায় নেই, মিছিমিছি কেবল জাবর কাটা। বরং যতক্ষণ তোমার শ্বাস আছে, সামনের দিকে তাকাও। চলো, চলো আর চলো। চরৈবেতি। তবে ওই যে বামায়ণীর কথা তুলে ওকে একটু টুসকি মারা হল, ওই রামায়ণীর প্রসঙ্গেই মোহিনী বড দুর্বল। বামাযণীব ভিতরে যে আগুন, সেই আগুনেব ছোঁয়া একবার যে পেয়েছে সে কি কখনো দুর্বল না হয়ে পাবে!

ফলে প্রতিদিন সন্ধ্যা না হতেই রামায়ণীব দোবগোড়ায় এসে দাঁডায় মোহিনী। আগে আগে বটতলায় সাত হাটের হাটুবেদের সঙ্গে গলাগলি কবে বসে ভব-তারিণীর সেবা করত, এখন আর ঢাক ঢাক গুডগুডেব বালাই নেই। সোজা বোতল মুঠো করে রামায়ণীর দবজায় এসে ডাক পাডে, ও আমাব সন্ধ্যামণি গো, ভুয়ার খোল!

রামায়ণীও অপেক্ষাতেই থাকে। দবজা খুলে এক ঝাঁক খুশিব ঝলক হয়ে সামনে দাঁড়ায়, মোহিনীকে ঘবে এনে মাদুব পেতে বসতে দেয়, বসো। আজ যে বড় সকাল সকাল?

ঘরে একখানা লণ্ঠন জ্বলে। আর দেখা যায় থান কয়েক ছাযা, মানুষেব না জন্তুর ঠিক বোঝা যায় না। জানালার ওপারে ঘুটঘুট্টি আঁধাব জমে থাকে। কখনো সখনো মিঠেল মিঠেল হাসনুহানার গন্ধ ভেসে আসে, আবাব কখনো আলোর টিপ, ঠাণ্ডা আলোর জোনাকি উড়তে উডতে রামায়ণীব শাড়িব ভাজে গা লুকোয়!

মোহিনী আয়েশ করে বসে। রামায়ণী একটা রূপোর পাত-মোড়া গডগড়া এগিয়ে দেয়। মোহিনী জানে, ওটা কড়ি মোক্তারের কেনা। কডি মোক্তাব আর বেঁচে নেই। কিন্তু গড়গড়াটা আছে বলেই মোক্তারের কথা মনে পডে। মোক্তার ওকে ভালবেসে আর কি দিয়েছিল কে জানে। রামায়ণী স্বীকার না করলেও মোহিনী জানে, অনেক টাকা ঢেলেছিল কডি মোক্তার। বামায়ণীর

পিছনে মুঠো মুঠো টাকা খরচ করেছিল। কিন্তু, কি এল গেল! শুকনো টাকা খড়খড় করে বাতাসে বাতাসে উড়ে গেল। ডম্বরু বাজিয়ে সেই শালা ঘড়ি-আলা তা মাড়িয়ে মাড়িয়ে চলে গেল, তাজ্জব সব ব্যাপার।

রামায়ণীরও বয়স কম হয় নি, দু কুড়ি পার তিন। এ বয়সে কাম মরে, কামনা মরে না। কত যে কামনা তা হিসেব কষতে গেলে মাথা বনবন করে। অথচ কামনা থেকে জন্ম নিচ্ছে যত রাজ্যের অতৃপ্তি। শূন্য কুম্ভ শূন্যেই রয়ে গেল চিরকাল।

আচ্ছা বড়লাট, একটা কথা শুধাই!

মোহিনী হাসে, আরক্ত চোখে তাকায়, নিজের কাছেই তো উত্তর আছে বাপু, আমায় কেন?

উত্তর থাকলে কি আর শুধাই। শোন না, এই যে রোজ সন্ধ্যা না হতেই আমার কাছে এসে হাজির হও, কি চাও?

মোহিনীর গলার নলি বেয়ে তপ্ত আগুন ঝলকে ঝলকে নেমে যায়, কি যে চাই, তা কি ছাই স্পষ্ট করে জানি নাকি। তবে হয়তো ভুলে থাকতে চাই। দু দণ্ড শুধু ভুলিয়ে রাখ দেখি আমাকে।

লোকে বড় নিন্দে-মন্দ করে যে?

এই লোকেই আবার পাঁচ মুখে একদিন প্রশংসা গাইবে। লোক মানেই তো নৈবিদ্যির কলা, যেমন সাজাবো তেমনি সাজবে, যেমন বসাবো তেমনি বসবে। হি হি করে হাসে মোহিনী।

কৌতুকে তাকিয়ে থাকে রামায়ণী, মাথাটা তোমার বিগড়ে গেছে বড়লাট।

মোহিনী আবার হাসে। হাসতে হাসতে চোয়াল ঝুলে পড়ে, কাঁকড়ার দাঁড়ার মত হাতের আঙুল গিঁট পাকায়। ছায়াগুলো বিকৃত হয়। বুকের ভেতর থেকে খুবলে বেরিয়ে আসে অদ্ভুত এক অনুভূতি। আসলে কি জানো, স্বপ্নে ছাড়া লোকটাকে আমি ধরতেই পারি না। বড্ড পেছু লেগেছে আজকাল।

কাকে ধরতে পারো না? কৌতুকে তখনও তাকিয়ে থাকে রামায়ণী।

কাকে আবার! সেই যে বেটা ঘড়িওলার কথা বললাম। সারাক্ষণ ঘড়ি হাতে বন বন করে ঘুরছে। চাবি দেয় আর চলে। ধেই ধেই করে কেবল নেচে বেড়ায়। সারাক্ষণ কেবল শব্দ। টিকিস টিকিস শব্দ, বুকের ভেতর যেন পাড় দেয়।

ধুস্, আবার সেই এক কথা। ছাই-ভস্ম ভেবে ভেবে মাথায় তোমার পোকা ধরে গেছে।

তরল আগুন নেমে আসে ঝলকে ঝলকে। কণ্ঠনালী বেয়ে বুকে, বুক থেকে আরো নিচে। বোঝ আর নাই বোঝ, সে বেটাই বড জ্বালায়।

রাত গভীর হলে মোহিনী টলতে টলতে বাড়ি ফেরে। বাড়ির দরজায় তখন কৃষ্ণের জীব পাহারাদার একটা কুকুর। ল্যাজ নেড়ে উঠে দাঁড়ায়, ঘাম চাটে মোহিনীর। মোহিনী ওকে বুকে তুলে ধরে, আদর করে। রামায়ণীর কাছ থেকে সরে এসে রামায়ণীর কথাই বেশি করে মনে পড়ে ওর। কি যেন একটা যাদুমন্ত্র লুকোন আছে ওর ভিতরে, ঠিক মত হদিশ করতে পারে না মোহিনী।

টলতে টলতে কখন যেন ও আছড়ে পড়ে বিছানায়। তারপর নেশার ঝোঁকে দুলতে শুরু করে। দুলতে শুরু করে মাটি, আকাশ, গাছপালা, ফুল, পাখি। দোলে, দোলে আর দোলে।

হঠাৎ। নিঃশব্দে সমস্ত দুলুনি ওর থেমে যায়। কে? কে বাবা কৃষ্ণের জীব। হাত বিছিয়ে দেহটাকে ও স্পর্শ করে। নিটোল একটা দেহ। হ্যাঁ, পাথর খোদাই, মসৃণ একটা অবয়ব। ধীরে ধীরে হাতের অনুভবে বোঝার চেষ্টা করে মোহিনী, কে, কে হতে পারে! রামায়ণীর আসার কথা নয় এখানে। তবে কি শৈল? শৈল তার পাখ-ছাড়ান পাখির বাচ্চার মত কাকলাস ছেলেটাকে মাই ধরিয়ে শুয়ে আছে ঘরের আর এক প্রান্তে। শৈলর লোহার গরাদের মত হাড় গিজগিজ করা বুক। অথচ এ বুক কত প্রকাণ্ড, কত ছড়ান। কে হতে পারে! এই কে আবার জ্বালাতে এলো গো মাঝরাতে?

কথা নেই, অন্ধকার ঘরে কেবল শব্দ। সোনার কলকজার একটা শব্দ; কোন সুদূর অনন্তকাল ধরে বয়ে চলে শব্দটা, আশ্চর্য।

ভোর হলেই আবার সব ফাঁকা। আকাশে দোল খাওয়া পাখিদের দিকে তাকিয়ে মাথার চুল ছেঁড়ে মোহিনী। যাহ্ শালা মাথাটাই খারাপ হয়ে গেল না তো। রাতে এসে সত্যি সত্যি যদি কেউ শুয়েছিল পাশে তবে চিহ্ন থাকে না কেন! নাকি নেশা, নাকি ঘোর, নাকি—

লোকে ডাকে, বড়লাট। কি গো বড়লাট ভালো?

মোহিনী হাসে, কে জানে বাপু, ভালো না মন্দ ঠিক বুঝতে পারি না।

তোমার ঘড়িআলা কেমন আছে?

মোহিনী গুম মেরে যায়। কথাটার মধ্যে একটু ব্যঙ্গ আছে। পরে গলা চড়িয়ে পালটা নেয়, ফের ঘড়িআলার কথা! খারাপ কিছু বলেছ তো মুখ ছিঁড়ে নেব বলছি।

লে হাওযা। কথা না বলতেই চোটপাট, গাছে না উঠতেই এক কাঁদি নামিয়ে দিলে যে।

মোহিনী বোধ হয় তাব ভুল বুঝতে পাবে। একটু নবম হয। আসলে কি জানো বাপু, একটা গণ্ডগোলে পড়ে গেছি। তাই, কি বলতে কি বলে ফেলি।

কি গণ্ডগোল গো? ঝামেলা না থাকলে বল না শুনি।

বলব! মোহিনী এপাশ ওপাশ তাকায। তাবপর বলেই ফেলে। বাত হলে বাপু, এক শালা পাশে এসে দিব্যি আবামে ঘুমোয। অথচ বেটাকে হদিশ করতেই পারি না। কে হবে বলো দেখি?

কে আবার, হাত বুলিযে দেখলেই তো পার।

তা কি আর বুলাই না। গাযে হাত দিলেই কেমন যেন মাখম মাখম লাগে—

বটে বটে! খানাখন্দে হাত পড়ে না?

মোহিনী ঠিক ইঙ্গিত বুঝতে পাবে না। চোখ গোল গোল কবে তাকায়।

মানে ইযে আর কি! বুকেব দিকটা উঁচু উঁচু?

মোহিনী এবাব আবক্ত হয়। চেঁচিয়ে ওঠে, এই শালা ফুটো শানকি। হুড়কো দেখ নি বুঝি, না! ভাগ, ভাগ বলছি।

অথচ মিথ্যে নয, মোহিনীব জ্বালায মোহিনীই জ্বলছে। রামাযণীকে একদিন কথাটা বলল মোহিনী, যদি ভবসা দাও তো একটা কথা বলি।

বলো।

কদিন ধবে বড্ড ঝামেলায পড়েছি, সেই বেটা ঘড়িআলা—

আবার ঘড়িআলা! মরণ আমাব।

আহা শোনই না। রাতে যখন শয্যা যাই, সেই শালা কৃষ্ণের জীব ঘাপটি মেরে পাশে এসে শুয়ে থাকে।

কে শোয়? বামায়ণী যেন আকাশ থেকে পড়ে।

বিশ্বাস করো। সেই শালা ঘড়িআলাই যে আমি বুঝতে পারি।

রামাযণী কিছুক্ষণ চুপ মেরে লক্ষ্য কবে ওকে। বুঝেছি হয়ে এসেছে তোমার। বলি একটা কথা শুনবে?

কি কথা?

এবার বরং ভালো দেখে একটা ওঝা ধরো।' ওঝায় বিশ্বাস না কর, হেকিম আছে, কোবরেজ আছে, একটা কিছু বিহিত কর।

মোহিনী জানত, এই ধরনেরই উপদেশ দেবে লোকে। হো হো করে হাসে। তাই যদি করব তোমায় শোনাতে আসব কেন ?

রামায়ণী বলে, ওই ঘড়িআলা কেবল তোমাব ঘাড়েই চাপে নি, রক্তের মধ্যেও সেঁধিয়ে বসেছে। রাতে যখন দেহটা তোমার আলগা হয়, ও বেটা তখন বেরয়। আর দশজনের তো এমন হয় না।

আর দশজনের সঙ্গে তুলনা করছ! আবার হাসে মোহিনী।

তুলনা ঠিক না, তবে—আচ্ছা, শৈল শোয় না তো পাশে ?

মোহিনী বলে, শৈল শোয় তাব ছেলে কোলে, ঘরের আর এক প্রান্তে। আমার শোয়া নাকি খারাপ, আমি নাকি হাত পা ছুঁড়ে মানুষ খুন করি।

তা'লে এক কাজ কর না, সন্দেহ রেখে আব লাভ কি! এবার যেদিন পাশে এসে শোবে দড়িগাছা দিয়ে পাশমোড়া করে বেঁধে ফেল। দশজনকে ডেকেডুকে দেখাও।

মোহিনী বলে, তাই দেখাতে হবে দেখছি।

তক্কে তক্কে থাকে মোহিনী। সোনাব ঘড়িটা শব্দ করে টিক টিক টিক······ ঠিক ব্রহ্মতালুতে, শিরদাঁড়ায়, মনে হয় ঠিক বুকের এই কোমল জায়গায়, কিংবা রক্তের ভিতর, কোষে কোষে, মজ্জায় মাংসে হাড়ে, সোনার ঘড়িটা শব্দ করে, ঠিক কোন জায়গা থেকে যে শব্দটা ভেসে আসে বুঝতে পারে না মোহিনী।

কত বয়স হলো গো বড়লাট ?

তা আজ্ঞে তিন কুড়ির কিছু বেশি।

তোমার সাধনা ? কতদূর এগোলে হে শিল্পী ?

তা আজ্ঞে······না, আর কোন জবাব পায় না মোহিনী। তা আজ্ঞে, বীজ বপন তো করেছি, ফলের আশায় দিন কাটাই।

আর কত কাল কাটাবে! সেই যে লোকটা পেছু লেগেছে চেন নি তাকে ? পারবে তাকে ঠেকিয়ে রাখতে ?

নাহ্, এ সব কথা ভাবলেই শালা মাথাটা কেমন গরম হয়, চাঁদিটা কেমন ফাট ফাট করে। হাতে, পায়ে, কপালে, ঘাড়ে গিঁট পাকায়। কাঁকড়ার মত

হামলে পড়ে কাদা খোঁচাতে ইচ্ছে করে। বেশ খানিকক্ষণ ছটফট করে বেলাবেলিই আজ রামায়ণীর দরজায় এসে দাঁড়ায় মোহিনী।

ওমা গো। কি কপাল আমার! আজ যে বড় সুয্যি না ডুবতে?

চলে এলুম।

শৈলর সঙ্গে কষে ঝগড়া করেছ বুঝি?

শৈলর সঙ্গে নয়, নিজের সঙ্গে।

ওমা গো, সে কি রকম! কি নিয়ে হলো?

ঝগড়া করার ইচ্ছে হল, করলাম। ছুতোর অভাব হয় নাকি।

রামায়ণী ওকে বসতে দেয়। এগিয়ে দেয় সেই গড়গড়া। কড়ি মোক্তারের কথা সারাদিনের পর আর একবার মনে পড়ে ওদের। জব্বর গড়গড়াটা কিন্তু।

লোকটাও ছিল জব্বর। অমন অকালে যে চলে যাবে জানতুম নাকি!

মোহিনী আবার গুম মেরে যায়। আসলে বুঝেছ, ওই ঘড়িআলাই যত নষ্টের।

আবার ঘড়ি!

তরল আগুন গলা দিয়ে নামিয়ে দেয় মোহিনী। সত্যি কথায় বুঝি ভয়। তা বাপু সাধ করে কি আর বলি, বলায়।

বলায়, বেশ তবে বলো। রামায়ণী লণ্ঠন জ্বালে। ঘরের ভিতর কুড়িয়ে আনে ছায়া। বাইরেটায় আবার আঁধার জমে। হাসনুহানার গন্ধ। জোনাক জ্বলে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আলোয়। মোহিনী বলে তার সাধন কথা, ভজনের কথা। রামায়ণী কেবল হুঁ হাঁ করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কেবল ছাখে, বড় পাগল ভোলা। অথচ মুখে বলে না। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছায়া দেখে। ঘরের বেড়ায় ছায়া, মানুষের না জন্তুর ঠিক বোঝা যায় না। দুঃখ পায়, আহা, এমন পাগল ভোলা না হলে কি ঠাই পেত এখানে।

রাত গভীর হয়, বুক জ্বলতে থাকে মোহিনীর। বুকের আগুন গড়াতে গড়াতে উপচে পড়ে চোখ বেয়ে। গায়ের চামড়ায় রাম নামের অক্ষর হয় প্রকট। চোখ ঘুরিয়ে নেয় মোহিনী। ঘড়িআলা যেন ঘরের বাইরে ওই অন্ধকারে কোথাও ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে আছে। কলকব্জা নড়ে, শব্দ হয়, টিক্টিক টিক্টিক·····

মোহিনী উঠে দাঁড়ায়। ঢেউ শুরু হয়েছে দেহের ভিতরে। কাশি থেকে

কাঞ্চি, কৌশল থেকে ঝাবকা; মাটি দুলছে, গাছপালা, পাখি, ফুল, প্রজাপতি, দুলছে; দুলছে আব দুলছে। পাশে পাশে কে যেন ওর হাঁটতে শুরু কবে। কে? চমকে ওঠে মোহিনী।

আমি?

আমি কে?

আমি সেই ঘড়িআলা।

থমকে দাঁড়ায় মোহিনী। পাথব খোদাই একটা দেহ, মসৃণ। কাজল টানা চোখ, প্রশান্ত। মোহিনী বলে, দাঁড়াও তো একটু দেখি।

সামনেই বয়েছে সাপেব মত বাস্তা। মাথাব উপবে আকাশ, কালপুরুষ অসি ঝুলিয়ে দাঁড়িযে। বুনো বাতাসেব গন্ধ এসে নাকে লাগে ওব। একটু দাঁড়াও না।

চৌমাথায চলো। সোনাব কলকব্জা নড়ে ওঠে, শব্দ হয় টিক্টিক টিক্টিক

ঘড়িআলা সাঁপুড়েব মত নাচে, নাচতে নাচতে এগোয।

মোহিনী এগোয পাশে পাশে, আহা দড়িগাছা যদি সঙ্গে থাকত তোমাকে বেঁধে বাখতাম।

বেঁধে!

সবাইকে আমি দেখিযে দিতাম তোমাকে আমি বেঁধেছি। সবাইকে আমি দেখিযে দিতাম সাধনায কি না হয়।

সোনার ঘড়ি শব্দ কবে। হাতুড়িব মত ঘা পড়ে ওব বুকে।

চৌমাথায এসে দাঁড়ায মোহিনী।

ঘড়িআলা?

বলো।

তোমাকে যদি মনের মত করে একবার হাতেব কাছে পেতাম।

না হয মনে কর না, পেয়েছ। কি চাও?

দিনগুলোকে ফিরে পেতে চাই ঘড়িআলা, গোড়া থেকে আবাব শুরু কবতে চাই।

চাঁদের আলোয় ঝলমল করে বুক। কি বিশাল এখন চেহারা হযেছে ঘড়িআলার। মোহিনী দেখে, ঘাড পিঠ টান করে আলাদিনেব দৈত্যেব মত একটা মানুষ। মাথা ছুঁয়ে যাচ্ছে আকাশ, এলোমেলো এক মাথা চুল

মেঘের মত ভাসছে। কি বিশাল ছড়িয়ে আছে দুই বাহু। পায়ের কাছে অত্যন্ত নগণ্য মোহিনী, কত সামান্য, কত ছোট।

সোনার ঘড়ি শব্দ করে। হাতুড়ির ঘা বাজে ওর মাথায়।

ঘড়িআলা ?

বলো।

কত বিরাট তুমি। কত উঁচুতে তোমার চোখ।

সোনার কলকব্জা নড়ে, শব্দ হয়, টিক্টিক টিক্টিক……

বল না কি কি দেখছ? আমি দেখ না, ঘাসের ডগা ছাড়া কিছুই দেখি না। কত ছোট আমি। অথচ লোকে ডাকে আমাকে বড়লাট।

ঘড়িআলা নাচের ভঙ্গিতে দোলে। আমার দেখার দাম নেই গো বড়লাট। এত উঁচুতে আমার চোখ, সব কিছু কেমন সমতল। কেমন যেন ধূসর।

মোহিনী কেমন শিটিয়ে যায়।

ঘড়িআলা ডম্বরু তুলে নেয় হাতে। নাচে, নাচে আর দোলে। বিরাট একটা পা, একপেয়ে হয়ে যায় ঘড়িআলা। যেন সেই পেতলের কাজ করা নটরাজের মূর্তি। ভয়ে কেমন শিটিয়ে গিয়ে ঘাসের ভেতর মুখ লুকায় মোহিনী।

তুমি বরং তোমার কথা বলো। তিন কুড়ি পার হতে হতে কি দেখলে। তোমার সাধনার কথা শোনাও বড়লাট।

মোহিনী আরো গুটিয়ে যায়। সামান্য একটা পোকার মত ছোট হতে হতে ঘাসের ভেতর নিজেকে যেন লুকিয়ে ফেলতে চায় মোহিনী।

সোনার কলকব্জা শব্দ করে। কি ভীষণ শব্দ। যেন হাড়গোড় গুঁড়িয়ে দেবে ওর। কি ভীষণ উদ্দাম নৃত্য করে চলেছে ঘড়িআলা। কি সর্বনেশে নাচ।

হঠাৎ এক সময় ককিয়ে ওঠে মোহিনী। শীতল এক চাপ আঘাতে মুখ থুবড়ে পড়ে। অর্থহীন কতগুলো শব্দ নিয়ে মিছিমিছি কিছুক্ষণ উঠে দাঁড়াতে চায়। অথচ পারে না। হিম শীতল বাতাসের ঘায়ে সব সাধনা ওর জুড়িয়ে যায়।

সোনার ঘড়ি শব্দ করে, টিক্টিক টিক্টিক……

ভোর হলে মাঠঘাট ভেঙে লোক ছুটে আসে চৌমাথায় চিৎ হয়ে পড়ে আছে

বড়লাট। দেহটা যেন বরফ। হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরা রয়েছে এক কুচি ঘাস। শুকনো বাতাসে উড়তে উড়তে কয়েকটা গাছের পাতা বুকে এসে ঠেকে রয়েছে। চোলাই মদের গন্ধে বোধ হয় মিষ্টি একটা আমেজ, লাল পিঁপড়ে কানের পাশ দিয়ে বেয়ে বেয়ে ঠোঁটের কাছে এসে ভিড় জমিয়েছে।

অথচ কেউই বুঝতে পারল না সেই ঘড়িআলারই কাণ্ড এটা। 'সোনার কলকব্জা নিয়ে কি সর্বনেশে খেলা খেলে চলেছে লোকটা।' কেউ শুনতে পায় না সেই শব্দ, সেই বুক ফাটানো শব্দ, টিক্টিক টিক্টিক।

বঙ্গ আমার জননী আমার

ডান অথবা বাঁ বুকের কোন দিকে যে শ্বাসযন্ত্রটা ধুকপুক করছে বুঝতে পারে না সতীশ। বুঝতে পারে না এক বিঘত লম্বা ঝকঝকে ছুরিখানা ওর পাঁজরার ডান দিক দিয়ে ঢুকল, না বাঁ দিক দিয়ে। যে দিক দিয়েই ঢুকুক, পলকেই ওর চোখের সামনে হলুদ রোদ ফিনকি দিয়ে উঠল। চোয়াল দুটো ফাঁক হয়ে খিল লেগে রইল অনেকক্ষণ. অবশেষে অর্থহীন কয়েকটা শব্দ বীভৎসভাবে বেরিয়ে এল ওর গলা চিরে।

সতীশ টলতে শুরু করল। ফিনকি দেওয়া রক্তের ধারাটুকু থাবলে দু' হাতের মুঠোয় চেপে ধরবার চেষ্টা করেও রেহাই পেল না। আঙুলের ফাঁক দিয়ে বুজবুজ করে রক্ত বেরিয়ে আসছে। অথচ কি আশ্চর্য যন্ত্রণাটি যেন ক্ষতস্থান থেকে সরে গিয়ে নিম্ন পেটে নাভির কাছাকাছি এসে ঘুরপাক খাচ্ছে। মনে হচ্ছে নাভির শুকনো কলিটাকে লক্ষ করে গনগনে একটা লোহার শিক ঢুকিয়ে দিয়েছে কেউ। যেমনভাবে শূকরনিধন যজ্ঞ হয়, ব্যাপারটা যেন অনেকটা সেইরকম। এ অবস্থায় সতীশ কোন একটা অবলম্বনের আশায় নর্দমার পাশে ল্যাম্পপোস্টটাকেই জড়িয়ে ধরে টান টান হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। অথচ সেই বানর আর বাঁশের অঙ্কের মতই ল্যাম্পপোস্টের গা বেয়ে পিছলে ওর নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ল বারবার।

শেষ পর্যন্ত পোস্টের গোড়ায় কিম্ভূত-আকৃতি একটা জীবের মত দলা পাকিয়ে গেল সতীশ। পোস্টের বাল্‌বখানা দিন কয়েক ধরেই ফিউজ হয়ে পড়েছিল। কে জানে, পিনকিরাই ওকে বাড়ি ফেরার পথে এইভাবে আক্রমণ করবে বলে বাতিটার ঐ হাল করে রেখেছিল কিনা। এখন আবছা অন্ধকারের মধ্যে সতীশকে ঠিক চেনা যাচ্ছে না। হাত। বুক পেট সব কিছু একাকার। মুখখানা ছুঁচলো, যেন এই মাত্র নর্দমার কাদা খুঁচে এসেছে ও। অথচ মিনিট কয়েক আগেও পূর্ণাঙ্গ একটা মানুষের মত সতীশ এ রাস্তা ধরেই হেঁটে এসেছিল। বাস থেকে নেমে চার পয়সার বিড়ি কিনেছিল ও মামুদের দোকান থেকে।

পরনে ছিল পাজামা আর হাফ-হাতা শার্ট। কাঁধ বেয়ে একটা ঝোলানো ব্যাগের ভিতর ছিল আধা-ফিনিশ লজেন্সের বোয়ম আর চামচ। সতীশ বনগা লাইনে লজেন্স ফিরি করে। রেল কোম্পানীর দয়ায় জামা-কাপড়ের যা ফুটি-ফাটা অবস্থা, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাসই হবে না কারো। আর এক প্রস্থ জামা-কাপড় না করালেই নয়। অথচ গোটা মাস ধরেই মন্দা চলছে বাজারে। সতীশ লক্ষ করেছে, প্যাসেঞ্জারেরা বোয়মের উপর চামচ ঘষার শব্দ শোনে, তাকায়, তুটো চারটে ফুটকুরিও কাটে কেউ কেউ, অথচ কেনার নামে ঢুঁ ঢুঁ। তা ছাড়া লাইনের অবস্থাও আর আগের মত নেই। মনে পড়ছে, আগে এখানে সাকুল্যে ছিল চার পাঁচ জন ফেরিঅলা, এখন পঞ্চাশ ষাট তো বটেই, আরো বেশী কিনা কে জানে। এর মধ্যে আবার লজেন্সের দিকেই ঝোঁকটা যেন বেশী।

ব্যাপার-স্যাপার একটু খতিয়ে দেখলে মুষড়ে পড়াই স্বাভাবিক। বিশেষ করে সতীশের মত একজন নগণ্য লোকের পক্ষে তো কথাই নেই। চলন্ত গাড়ির মধ্যে ছুটোছুটি, হাঁকাহাঁকি, জীবন মুঠোয় করে এক বগি থেকে আর এক বগিতে গা ঘষটে ঘষটে এগোনো—কিন্তু এত করেও যদি তু'চার পয়সা রোজগারই না হল, তা হলে আর কিসের আশায় লাইনে থাকা। তবু দিনের আশাতেই লেগে থাকতে হয়েছিল ওকে। দিনের আশাতেই ছুটোছুটি করে টিঁকে ছিল সতীশ।

এদিকে পাড়ার অবস্থাও কহতব্য নয়। বোমাবাজি তো আছেই, পার্টি পার্টি খণ্ড-যুদ্ধটুদ্ধ এখন গা সওয়া, কিন্তু ইদানীং এক উটকো মাগীর কীর্তিকলাপ দেখে চক্ষু থ হয়ে গিয়েছিল সবার। মহিলাটি দিন কয়েক আগে আড়ম্বর করে ধুনিটুনি জ্বেলে প্রচার করল, সে কালী পেয়েছে স্বপ্নে। কালীর মহিমা শেষ পর্যন্ত পুলিসে গিয়ে গড়াল। বেআইনীভাবে তারাপদবাবুর জমির উপর সে মন্দির গড়ার চেষ্টা করায় পুলিস এসে তাকে ভ্যানে তুলে থানায় নিয়ে গেল। সে এক হুলস্থুল ব্যাপার। আর এ ঘটনার ঠিক পরদিনই তারাপদবাবুকে কে বা কারা যেন কুপিয়ে মেরে রেখে গেল এই নর্দমার ধারে। ঠিক এ রাস্তায় এই লাইটপোস্টটার কাছেই। তারাপদবাবুর মৃত্যু যে এই মহিলাটির সঙ্গেই জড়িত কোন ব্যাপার সন্দেহ রইল না কারো।

যথাবিহিত আবার পুলিশ ঢুকল পাড়ায়। পুলিশের কুকুর তারাপদবাবুর দেহের উপর নাক রেখে গন্ধ শুঁকে পাড়াটাকে আগাপাশতলা চষে হতাশ হয়ে

ফিরে এল। ভাগ্যিস সে সময় পাড়ায় সতীশ ছিল না। পুলিস দেখলেই ওর বুকের ভিতর এক ধরনের কম্পন শুরু হয়। মনে মনে আশঙ্কা জাগে, পৃথিবীর যাবতীয় অপরাধ যেন ওর জন্যই ঘটে যাচ্ছে। পুলিসের কুকুরের যেন অধিকার আছে হঠাৎ ওর বুকের ওপর লাফিয়ে পড়ে ওর গলার নলিটাকে কামড়ে ধরার।

অথচ তারাপদবাবুর খুনের ব্যাপারে সতীশ সন্দেহ করত পিনকিকে। সকলেই করত বোধ হয়, কিন্তু মুখ ফুটে সে কথা কেউ উচ্চারণ করতে সাহস পেত না। পিনকির ব্যাপারে ভুলেও নাক গলাতে চায় না সতীশ। পিনকি একাই এক শ'। সাহস আছে। নিজের চোখেই সতীশের দেখা, চারপাশ থেকে রাইফেলধারী পুলিস চড়াও হয়েছিল ওর ওপর। পিনকি আর পিনকির বউ তখন ঘরে। ট্যাঁ ফুঁ করলেই ব্যুম ব্যুম করে ফায়ার করবে পুলিস এমনি একটা মতিগতি। সতীশ তার নিজের বাড়ির জানালা ফাঁক করে নেয়ে ঘেমে একাকার হয়ে তাকিয়ে ছিল ঘটনার দিকে। সেদিনও এমনিধারা আলো জ্বলেনি রাস্তায়। আকাশটা মেঘলা মেঘলা ছিল, কয়েক পশলা নামলেও নামতে পারত, নামেনি। সতীশ কেবল রুদ্ধ নিশ্বাসে তাকিয়েই ছিল ওদিকে। রাইফেল থেকে আগুনের ঝলক দিয়ে গুলি বেরুতে যেটুকু সময়। পুলিস সার্জেণ্ট একবার হেঁকেও উঠেছিল, পিনকি বেরিয়ে আয়, বাঁচতে চাস তো বেরিয়ে আয় পিনকি। অথচ বেশ কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়েই হম্বিতম্বি করছিল পুলিসরা, প্রাণের ভয় কারই বা না আছে।

সতীশ এর পর যে দৃশ্য দেখেছিল, জীবনে ভুলবে না। কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ দুমদুম করে দুটো পেটো। পুলিসগুলো হকচকিয়ে শুধু মুহূর্তখানেক সময় নিয়েছে; সাদা ধুঁয়োর ভিতর দিয়ে অমনি পোঁকের পিনকি কাট।

এই হল পিনকির চেহারা। ফলে বড় রাস্তায় বাস থেকে নেমে সতীশ যখন বিড়ি কিনে গলির মুখে পা বাড়িয়েছিল সে সময়ই ওর সাবধান হওয়া উচিত ছিল কিছুটা। কয়েক পা এগিয়ে এসে সতীশ লক্ষ করেছিল, পিনকি আর অপরিচিত একটি মুখ ধীরে ধীরে ওরই পিছু ধরেছে।

সতীশ একটা বিড়ি ধরিয়ে নিজেকে নিরপরাধ রাখার চেষ্টা করল। মনে মনে গুনগুন করে একটা গান আওড়াবার চেষ্টা করল ও। মনে পড়ে গেল দাদের মলমের বিপিনের অঙ্গভঙ্গি করে ছড়া কাটা; বিকৃত করিয়া মুখ/ চুলকাইতে বড় সুখ, সুখ রে—এ এ এ। মনে পড়ে গেল ওরও পাজামার নীচে

কুচকির কাছাকাছি একটা দাদচক্র জন্ম নিতে শুরু করেছে আজকাল। এক কৌটো মলম বিপিনের কাছ থেকে চেয়ে নিলে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হত না। কিন্তু—

বিড়িটা নিবে যাওয়ায় আবার ওকে ধরাতে হল। আর ঠিক এ সময়ই ও শুনতে পেল, পিনকি ওকে দাঁড়াতে বলছে, ডাকছে।

সতীশ দাঁড়িয়েছিল।

চোখের নিমেষে ওরা দু পাশে এসে শুধু পজিশন নিতে যেটুকু সময় নিল। তারপর বাঁকা চোখে তাকাল।

কি হয়েছে রে? সতীশ ভয়ে ভয়ে শুধাল।

কি হয়েছে। পিনকি যেন শবাগার থেকে উঠে আসা মমির মত সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, কি হয়েছে এখনো তোমাকে খুলে বলতে হবে সতীশদা। কি হয়েছে তুমি জান না? পিনকি চোয়াল শক্ত করে খিস্তি করতে যাচ্ছিল। সামলে নিয়ে বলল, আমাদের লিস্টে নাম রয়ে গেছে তোমার, বুঝতে পারছ?

পুরো ব্যাপারটাই কেমন যেন রসিকতা বলে মনে হল সতীশের। ফলে দুর্বলতাটুকু চাপা দেবার চেষ্টা করে গলায় কৌতুক মিশিয়েই সতীশ শুধাল, লিস্টে! কোন লিস্টে আবার নাম উঠে গেল আমার?

অপরিচিত লোকটি সহসা একটা ঝকঝকে ছোরা জামার ভেতর থেকে বার করে এনে সতীশের সামনে তুলে ধরল। সতীশের চোখের রং ফ্যাকাশে হয়ে গেল মুহূর্তেই। ঘটনাটা যে সামান্য নয়, অত তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার নয়, বুঝতে অসুবিধা হল না ওর। বুকের ঠিক যে জায়গায় ছোরাটাকে তাক করে ধরে রেখেছে ওরা সে জায়গায় কেমন যেন সুড় সুড় করে চরকি খেয়ে উঠল। সারা গায়ে সজারুর কাঁটার মত কিরকির করে লোম গজিয়ে উঠল ওর। ভয়ে, বিস্ময়ে কেমন যেন কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল, তবু মাইডিয়ারী গলায় বলবার চেষ্টা করল, এই পিনকি, কি করছিস তোরা, লেগে যাবে যে!

পিনকি জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল বার কয়েক। জানের জন্য খুব মায়া হচ্ছে, না সতীশদা? তারাপদবাবুর ব্যাপার নিয়ে পুলিসের কাছে চুকলি কেটেছ কেন? মনে আছে?

পুলিসের কাছে! আমি! সতীশ যেন আকাশ থেকে পড়ল। যাহ, মাইরী তোরা শেষ পর্যন্ত ভুল ঘোড়ায় বাজি ধরেছিস।

পুলিসের লোকই নাম বলেছে তোমার।

অসম্ভব। হতে পারে না। হঠাৎ আকাশ ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল সতীশ, অপরিচিত লোকটা হাঁটু চালিয়ে ওর পেটের নিচে একটা কোঁৎকা মারল, চেঁচালে শালা এখনি এটাকে বাঁট সুদ্ধ গুঁজে দেব। চোপ্!

কান্না পেল সতীশের। মাইরী পিনকি, বিশ্বাস কর, কোন কিছুই জানি না আমি। যদি আমি পুলিসকে কিছু বলে থাকি, মাইরী আমার কুষ্ঠ হবে।

কি হবে! ছায়াছবির পর্দায় দেখা মমির মত অবিকল মনে হচ্ছিল পিনকিকে। শত সহস্র ফাটল ধরা জীর্ণ একটা দেহ নিয়ে পিনকি ওর সামনে দাঁড়িয়ে বিকৃত গলায় হেসে উঠেছে। ওর চোখ পড়ল পিনকির ঝুলন্ত হাতের দিকে। হাতের আঙুলে শক্ত করে জড়ান রয়েছে লোহার পাঞ্চ। একটা শটেই ছিটকে গিয়ে নর্দমায় গড়িয়ে পড়তে পারে সতীশ।

ইচ্ছে হল ঘপাত করে পা দুটো ও জড়িয়ে ধরে পিনকির। বাড়িতে ওর বউ রয়েছে, রয়েছে আড়াই-বছরি একটা বাচ্চা। এ তো আর সতীশকেই শুধু খতম করা নয়, ও দুটোকেও স্রেফ লেডিকুত্তা বানিয়ে ছাড়া।

পাড়ায় তোমাকে ভালমানুষ, ভেজা বেড়াল বলেই জানতাম সতীশদা, কিন্তু পুলিসের কাছ থেকে পয়সা খেয়ে ভেবেছ খুব পার পেয়ে যাবে, তাই না।

সতীশ গলা নিচু রেখেই প্রতিবাদ করে উঠল, মিথ্যে কথা। স্রেফ বানানো কথা ওগুলো। পুলিস দেখলেই আমার পেচ্ছাব পেয়ে যায় জানিস—তোদের কাছে মিথ্যে কথা বলব না বলেই বলছি।

তারাপদবাবু যে পুলিসের টিকটিকি ছিল জান না তুমি?

তোরা মাইরী এমন করছিস—আমি ওসব কিছুই জানি না। বিশ্বাস কর—

ছোরার ডগাটা এখন চামড়ার সঙ্গে লেগে আছে। একটু নড়তে গেলেই বুকের মধ্যে বিঁধে যাবে। পুকুরের জলে ঢিল পড়লে যেমন হয়, ছোরার ডগা থেকে তেমনি করে সারা গায়ে ওর ঢেউ গড়াচ্ছে। ঘাড়ের পাশে ঢেউগুলি এগিয়ে এসে যেন চড়াত চড়াত করে ভেঙে পড়ছে। সত্যি সত্যি চালিয়ে দেবে না তো ছোরাটাকে। পিনকিদের পক্ষে এ সব কাজ যে এতটুকু কঠিন নয় সতীশ জানে। তবু বিশ্বাস করতে কেমন যেন খটকা লাগছিল ওর। তা হোক, এখনো ওরা সতীশদা বলেই সম্বোধন করছে ওকে।

সতীশ ঝকঝকে ছুরিটার দিকে তাকাল। ইস্পাতের ফলার দুটো দিকই ব্লেডের মত ফিনফিনে মনে হল ওর। শুধু ছুঁইয়ে দিতেই যেটুকু সময়। এ সময় শালা আশেপাশের বাড়িগুলোও কেমন ঝিম মেরে ঘুমিয়ে আছে দেখ। দরজা খুলে লাঠি সোটা নিয়ে হইহই করে বেরিয়ে পড়ছে না কেন সবাই অন্তত ঐ হলুদ রঙের কোণের বাড়ির জানালাটাকে বার তিনেক তো খুলতে দেখল আবার বন্ধ করতেও দেখল সতীশ। মেয়েছেলেগুলো বোধ হয় জানালার ধারেই ঘাপটি মেরে লুকিয়ে লুকিয়ে লক্ষ করছে ওদের। সতীশের কেমন কুলকুল করে বমির উদ্রেক হল। পচা নর্দমার ভুসভুসে গন্ধটাই যেন ওকে ঘিরে ধরেছে এ সময়। তারাপদবাবুর পচা লাসের গন্ধও বোধ হয় মিশে আছে ওর ভিতর। সতীশ নিশ্বাস নেওয়া বন্ধ করল।

হঁ্যা, তারাপদবাবুই যত ঝামেলা বাধিয়েছে ও বুঝতে পারছে। অথচ লোকটার সঙ্গে সতীশের যোগাযোগ না রেখেও উপায় ছিল না। মালতীর শেষ সম্বল বালা দুটো লোকটার কাছেই বন্ধক রেখেছিল ও। সে আজ মাস পাঁচ ছয় আগের কথা। সুদের চোট সামলাতে সামলাতেই জিভ বেরিয়ে যাচ্ছিল ওর। ফলে মাঝে মাঝেই লোকটার কাছে আসতে হত সতীশকে। সে সময় হয়তো দেশকালের অবস্থা নিয়ে গল্পসল্পও হত। আট পার্টির জোর বাড়ছে না, ছ' পার্টির, নাকি আবার নাক ঘুরিয়ে রাবণ রাজাই বাজা চালাবে সে সব কথাই ফেঁদে বসত লোকটা। সতীশ অত পার্টি-ফার্টির ঝামেলায় থাকতে চায় না। যে যতই পার্টি কর বাবা, আলু দেড় টাকা, কুমড়ো এক, চাল আড়াই। চালের কথায় ওর মনে পড়ে যায়, চাল পাচারকারী সেই মেয়ে, সন্ধ্যার কথা। লাইনে হাজার হাজার মেয়ে চাল নিয়ে ছুটোছুটি করছে কিন্তু সন্ধ্যাকেই কেমন যেন ওর মনে ধরেছিল। দেখা হলেই লজেন্স নিয়ে সাধত সতীশ, খাবি? মেয়েটাকে ও লজেন্স খাওয়াত বিনি পয়সায়, মেয়েটা খাওয়াত ওকে সুপুরিকুচি। সেই সন্ধ্যা পুলিসের কাছে তাড়া খেয়ে পালাতে গিয়ে জীবনটাকেই শেয়াল-কুকুরের মত বিলিয়ে দিল। এত সাবধান থাকা সত্ত্বেও দেহটাকে বাইরের দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে পাদানির কাছে নিজেকে লুকোতে গিয়েছিল ও। ইলেকট্রিক পোস্টে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়েছিল দশ বিশ হাত দূরে পানাকচুরির মধ্যে। নে, কত চাল পাচার করবি, এবার কর। আসলে লাইনটাই বড় রিস্কের।

অথচ এই রিস্কের ভিতর দিয়েই সতীশকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে বড় কৌশলে। কৌশল বইকি! তবে পিনকিদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সতীশ

কেমন যেন হিমসিম খেয়ে উঠছে এখন। সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে ওর।

পিনকি শুধলো, তারাপদবাবুর কাছে আমাদের নামে ফুসুর ফুসুর করোনি তুমি?

কক্ষনো না। সতীশ আকুতি মিশিয়ে প্রতিবাদ করল।

অপরিচিত লোকটা রাগে দাঁতের উপর দাঁত ঘষে নিল একবার। মুখটা ওর কার্টুনের মত বাঁকা হয়ে উঠল। ঐ অবস্থাতেই ও ছোরাটাকে আরো খানিকটা সাঁটিয়ে ধরল ওর পাঁজরার কাছে, ভ্যানতারা আর ভাল লাগছে না রে পিনকি। ছেড়ে দিবি তো দে, নইলে বল কিচাইন করে কেটে পড়ি।

পিনকি আর একটু ধৈর্য ধরবার জন্য হাত তুলেছিল, কিন্তু কতগুলি ঘটনা মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার তোয়াক্কা করে না। গলির মুখ থেকে সাঁ সাঁ করে ছুটে দৌড়ে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে গেল ওদের। পিনকি হাতের পাঞ্চ সমেত বোঁ করে ঘুরে দাঁড়াল, আর সেই মুহূর্তেই সতীশ বুঝতে পারল, ওর বুকের ডান অথবা বাঁ যে-কোন একটা দিক দিয়ে ছোরাটা আমূল ঢুকে গিয়ে আবার রক্তের চাপেই পিছলে বেরিয়ে আসছে।

ওর মুখটা শুয়োরের মত ছুঁচলো হয়ে গেল এর পর। হাত-পাগুলো ছোট ছোট। পেটের দিকটা পাম্প খেয়ে ফুলে ওঠার মত, রক্তে রক্তে একাকার হয়ে লাইটপোস্টের গোড়ায় আস্ত একটা শুয়োরের মতই পড়ে [illegible] ল ও।

আর, এ অবস্থায় ও লক্ষ করল, আশেপাশে অনেকগুলি জানালা থেকেই গোপনে গোপনে কারা যেন ওকে লক্ষ করছে। ভাগ্যিস ফুটফুটে আলো নেই এখানে, নইলে এখনকার এই সতীশ বেচারার অবস্থা দেখে হাহা হিহি করে হেসে উঠত সবাই। হাসত, আর আঙুল তুলে দেখাতে দেখাতে বলত, বাঁচতে হয় কেমন করে শেখেনি লোকটা, দেখেছ।

পেটের ভিতরে গনগনে লোহার শিকটা ওর নাড়িভুড়িগুলো পুড়িয়ে পুড়িয়ে কেমন খাক করে দিচ্ছে এখন। কুতকুতে চোখে সতীশ এপাশে ওপাশে তাকাবার চেষ্টা করল। চোখ তো নয়, লোহার দরজা। যেন মরচে পড়ে গেছে খুলতেই চায় না। অথচ একটা কোন পুলিশের গাড়ি বা অ্যাম্বুলেন্সের জন্যই যেন অপেক্ষা করতে হবে এখন। হর্ন বাজাতে বাজাতে গাড়িগুলো এগিয়ে এলেই যেন সতীশ বাঁচোয়া।

স্ট্রেচারে ওর বডিটাকে তুলতে তুলতে হয়ত ওর মুখের কাছে ঝুঁকে পড়বে কেউ, ও মশাই শুনতে পাচ্ছেন, আপনি কি ওদের চিনতে পেরেছিলেন? নাম বলুন না দু'একজনের।

সতীশ হয়ত পিনকির নামটাই বলবে বলে ভেবে রাখছিল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে পড়ল, পুলিসের কাছে চুকলি কাটায় বিপদ অনেক, বিশেষ করে পিনকির নাম। ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করতে হয়। তার চেয়ে বরং স্রেফ মাথা নেড়ে দেব, উঁহুঁ, কাউকেই মশাই চিনি না আমি। আপনাদের যেমন চিনি না তেমনি ওদেরও আমি চিনি না। আমাকে একটু শান্তিতে মরতে দেবেন এখন।

কিন্তু পুলিসও শালা তেমনি কেউ। বকর বকর চালিয়েই যাবে কানের কাছে। তাড়াতাড়ি নাম ঠিকানা বলে ফেলুন দেখি। বলুন, বলুন। মানে ওদের মতলবখানা যেন এরকম, তাড়াতাড়ি সতীশ মরে গেলে ওর বডিটাকে সনাক্ত করে যেন বরফ চাপা দিয়ে ফেলে রাখতে না হয় বেশী দিন; সতীশের বালবাচ্চার কাছে বডিটাকে চালান করে দিতে পারলেই যেন খেল খতম।

পুলিস দেখলেই পিলে চমকায় সতীশের। সতীশ নাম বলবে, ঠিকানা বলবে। বলবে, দেখুন তো আমার মুখটা শুয়োরের মত ছুঁচলো দেখাচ্ছে কিনা?

ততক্ষণে স্ট্রেচারে করে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে নেওয়া হবে ওকে। স্ট্রেচারের নীচে চাকা লাগান, অ্যাম্বুলেন্সের ঝোলানো রেলে চাকাগুলো লাগিয়ে দিয়ে সুরুত করে ভিতরে ঠেলে দেওয়া হবে।

সতীশ হয়তো এসময় দড়াম করে কোন কিছুর সঙ্গে একটা ধাক্কা খেয়ে খানিকটা কাত হয়ে পড়বে, সে দিকে কারো ভ্রূক্ষেপই থাকবে না। সব শালা ডিউটি করে। এদের ডিউটি হচ্ছে স্পট থেকে হাসপাতাল অবধি নিয়ে যাওয়া। পথে যদি মরেই যায় সতীশ, কার কিবা এল গেল। সতীশ মরে গেলে ডাক্তার একটা সার্টিফিকেট লিখে দেবে খস খস করে, সতীশ ডেড।

সতীশ ডেড। বেশ তো, সতীশ না-হয় মরেই গেল। এবার ওর বউ আর বাচ্চাটার হাতে ছেড়ে দাও দেখি বডিটা। কিন্তু মরেও কি কারো শান্তি আছে, পুলিসের কাজ পুলিস করল, ওদিকে পাড়াময় খবর ছড়িয়ে গেল সতীশ খতম। সতীশ হো গিয়া, মরগে পৌঁছে গেল সতীশ।

দরজা ঠেলে সতীশকে ঘরগের ভিতর ঢোকাতেই টের পাওয়া গেল বরফের মত ঠাণ্ডা জমে আছে চারপাশে। মিনমিন করা আলো, থরে থরে সাজান রয়েছে টেবিল। সেই টেবিলে উদোম ন্যাংটো হয়ে শুয়ে আছে সব মানুষ। সতীশকেও শুইয়ে দিয়ে কে যেন চোরের মত ওর জামাকাপড়গুলো খুলে নিয়ে পিটটান মারল।

সতীশ হাসবে কি কাঁদবে বুঝতে পারল না। মরেই যখন গেছে ও, ন্যাংটো থাকতে আর ক্ষতি কি। কিন্তু ঘরগের বাইরে কারা যেন এ সময় গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে শুনতে পাচ্ছে সতীশ। কমরেড সতীশ জিন্দাবাদ। খুনকা বদলা খুন হ্যায়, জানকা বদলা জান। একজন বিলম্বিত লয়ে সুর করে চেঁচাচ্ছে, কমরেড সতী-ঈ-ঈ-শ—আর সকলে ধুয়ো তুলছে, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ।

সতীশের খুব কৌতুহল হল। টেবিল থেকে তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর দরজা ফাঁক করে একটু বাইরের দিকে তাকাল। তাকিয়েই থাকল। অনেককেই ও চিনতে পারছে এখন। ওদের পাড়ার মিহিরবাবু এক হাতে কোঁচা সামলিয়ে তারস্বরে বক্তৃতা ঝাড়ছে, দেখতে পেল সতীশ। মিহিরবাবুর সঙ্গে ভোটের সময় আলাপ হয়েছিল ওর। ভোটার লিস্টে সতীশের নাম ছিল না। মিহিরবাবু বুঝি তাইতেই আগ্রহ দেখিয়ে সতীশকে দিয়ে একটা ফলস ভোট দিইয়েছিলেন। সে একটা মজার অভিজ্ঞতা ওর।

মিহিরবাবু এখন বলছেন, সতীশ ছিল আমাদেরই লো। আমাদের পার্টির একজন কর্মী। তাকে যারা নৃশংসভাবে হত্যা করল, বন্ধুগণ, আমরা তাদের ক্ষমা করতে পারি না।

সতীশ এখন ন্যাংটো হয়ে আছে বলেই বাইরে বেরিয়ে এসে ঠাস করে লোকটার গালে একটা চড় কষাতে পারছে না। বেড়ালের মত পা ফেলে ফেলে দরজাটা ভেজিয়ে রেখে আবার ও টেবিলে এসে শুয়ে পড়ল।

ফুলের মালা নিয়ে এসেছে লোকগুলো। হয়তো সতীশকে নিয়ে ওরা মিছিল করবে। ওরা বলাবলি করছে, সতীশ মরেনি। শহীদ হয়েছে সতীশ। ভালই হল, মরে গিয়ে তো আর কিছুই হওয়া যাচ্ছিল না, শহীদ হওয়া গেল। সতীশ আবার মনের সুখে দাদের মলমের বিপিনের ছড়াটাকে আওড়াতে শুরু করল, চুলকাইতে বড় সুখ, সুখ রে—

কিন্তু সতীশের মনে হচ্ছে, বাইরে যেন হঠাৎ একটা ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে

গেল। সবাই কেমন চুপ মেরে গেছে। হঠাৎ এরকমভাবে উত্তেজনা থেমে যাওয়ার কারণ বুঝতে পারল না ও। অপেক্ষা করল। চারপাশে তাকাল, উদোম ন্যাংটো ছেলে মেয়ে বুড়ো, দশাসই জোয়ান আর যুবতী ফ্ল্যাট হয়ে শুযে আছে। সব শালাই চিত নয়, কেউ চিত, কেউ কানকি মেরে এক পাশে হেলে, কেউ বা উপুড় হয়ে।.সব শালাই গটমট করে তাকিয়ে নেই, কেউ হাফ-চোখে, কেউ ফুল, কেউ বা আবার পুরোটাই বুজে রেখেছে চোখ। কারো মাইয়েব ছায়া পডেছে পেটেব দিকে, কারো হাঁটু চকচক কবছে আলোয় কলাগাছেব মত। বেশ স্থখেই আছে মনে হচ্ছে সবাইকে।

সতীশ ঠিক কোন পজিশন নিয়ে শুয়ে থাকবে বুঝতে পাবল না। হঠাৎ ওর কানে এল বাইবে যেন আবার গোলমাল শুরু হয়েছে। তবে কি এবাব ভিন্ন আর একটা দল এল মালা নিয়ে? এক হাতে মালা আব এক হাতে বল্লম। হয়তো এবার পিনকিদেব দলটাই এসেছে ওদের পার্টিব ফেস্টুন নিয়ে। হযতো এবার পিনকিই বক্তিমে ঝাডবে, প্রতিক্রিয়াশীলদেব হাতে খুন হযেছে সতীশ, এ অত্যাচাব বাংলা দেশ সইবে না। বন্ধুগণ······

কানে তুলো গুঁজে পড়ে থাকতে ইচ্ছে হল ওর। পাবল না। বাইবে হয়তো দু'দলের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে থেকে শান্তিবক্ষা করছে পুলিস। কিন্তু এমন মজাব দৃশ্য দেখবার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ বোধ করল না সতীশ।

ববং সতীশ .পাশের ধুমসী মাগীটাব দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। নাকেব দিকটা ধ্যাবডা হয়ে আছে মাগীটার। শোবাব সময় কোঁকডান চুলগুলো টেনে এনে মাইয়ের উপব ফেলে বেখেছে। ময়দাব তালেব মত মাংসপিণ্ড দুটো উঁচু হয়ে আছে। যেমন মাই তাব তেমন ভুঁডি। ভুঁডি, না পেটে বাচ্চা আছে বুঝতে পাবল না সতীশ।

মহিলাটিও গটমট কবে সতীশের দিকে তাকাল। সতীশ সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে ভিন্নমুখী হল। দেখল, আর এক পাশে, দেহেব সঙ্গে গলাটা সরু একটু চামডায় লেগে টুলটুল করছে লোকটাব। কেউ হয়তো সডকি চালিয়ে গলাটাকে পুরোপুরি নামিয়ে দিয়েছিল ওর। সতীশ চুকচুক কবে জিভ নাডল, আহা বেচারা।

লোকটা কেমন গৌতম বুদ্ধের মত হাসি ছড়িয়ে রেখেছে চোখে। বাণী দেওয়াব মত করে বলল, সাত দিন ধরে পড়ে আছি দাদা, নো ক্লেম। পুলিসও আমার কিনারা করতে পারছে না কিচ্ছুই। বেশ ভালই আছি এখানে।

সতীশ উঠে বসল। পায়ের দিকে নজরে পড়ল, আঠারো বছরের একটা ছেলে। ছেলেটার দিকে তাকাতে না-তাকাতেই শুনতে পেল সতীশ, ছেলেটা বলছে, পাইপ গান চেনেন, আমি পাইপ গানে প্রাণ দিয়েছি। ক্ষতি নেই, কিন্তু আরো কয়েকটাকে খতম করে মরতে পারতাম তো শান্তি হত।

ওরই পাশাপাশি আর একটি ছেলে, উৎসাহে চি হি চি হি করে বলল, আমি বোমায়। মুখটাকে এপাশে ওপাশে নেড়েচেড়ে দেখল ভেজা পাউরুটির মত ল্যাতপ্যাত করছে ওর চোয়াল আর গলা।

তাকাতে কেমন ঘেন্না হচ্ছিল সতীশের। উঠে দাঁড়িয়ে এপাশে ওপাশে খানিক হাঁটল। বাইরে ততক্ষণে চেল্লাচেল্লির কমপিটিশন লেগে গেছে। ভেতরে ও সব বালাই নেই। হিমঘরে হিম হয়ে আছে বডিগুলো। কারো নিতম্ব পাহাড়ের মত উঁচু, কারো মুখে দাড়িই গজায়নি এখনো, কারো আঁকা পর [illegible]কিবিগুলো দেখতে একাকার হয়ে ধরা পড়ে গেছে!

আট দশ বছরের একটা মেয়ের দিকে চোখ পড়ল হঠাৎ। মেয়েটা অমনি ঝটপট করে বলে বসল, আমারটা হচ্ছে রেপ কেস। সঙ্গে সঙ্গে ওপাশ থেকে একজন মধ্যবয়সী গ্রীসিয়ান কেস ভদ্রলোক, যার বুকের মাংস পাকা কুমড়োর মত দেখাচ্ছে, তড়বড় করে বললেন, আমার কিন্তু কোনও পলিটিক্যাল ব্যাপার নয় মশাই। আমারটা স্রেফ অ্যাকসিডেন্ট। ব্রেক ফেল করেছিল।

আপনার? বুড়োমত এক ভদ্রলোককে শুধোল সতীশ। ভদ্রলোকের মুখভর্তি শুভ্র দাড়ি, মাথায় বাবরি, অনে[illegible] ঠিক রবি ঠা[illegible]রের পাথরের মূর্তির মত দেখাচ্ছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা পদ্য ওর মনে পড়ে গেল শুধু বিঘে দুই, ছিল মোর ভুঁই/আর সবি গেছে ঋণে—

ভদ্রলোক কেবল মিটমিট করে হাসছিলেন। বললেন, ওপাশে যাও, ওপাশে বিদ্যেসাগর মশাই পড়ে আছেন। ওঁকেই জিজ্ঞেস করে এসো।

বিদ্যেসাগর! সতীশ উৎসাহে—বিদ্যেসাগরের দিকে এগোতে গিয়ে আগেই একটা টেবিলের ওপর নেতাজীকে পড়ে থাকতে দেখল।

নেতাজী খানিকটা ফৌজী কায়দায় ধমকে উঠলেন সতীশকে; দেখতে পাচ্ছ না, কী ভাবে পড়ে আছি। ফাজলামো করার আর সময় পাও না, না? এই দেশটার জন্যই কিনা আমি জীবন শপথ নিয়েছিলাম!

সতীশ লজ্জা পেয়ে সরে এল। আর বুঝতে পারল চারপাশ থেকে হইহই করে সবাই এখন ওকেই প্রশ্ন করছে, আপনি? আপনার কি হয়েছিল বলুন?

কিছুটা আমতা আম্‌তা করে সতীশ পিনকির নামটাই বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু পিনকির নামে চুকলি কাটার পরিণতির কথা ভেবে বিষণ্ণ গলায় বলল, আমার কথা শুনলে আপনারা হাসবেন। আসলে আমাকে একটা শুয়ারের মত দেখায় বলে ভুল করে চাকু চালিয়ে দিয়েছে এক আততায়ী। হেঁ হেঁ—

সতীশ অনুভব করল সত্যি সত্যি ওর মুখটা শুয়োরের মত লম্বা। হাত-পাগুলো ছোট ছোট, পেটের দিকে চর্বিঠাসা পুরুমত চামড়া। অবিকল একটা শুয়োর।

ফলে বিষণ্ণভাবে সতীশ নিজের টেবিলে এসে ঘাড় গুঁজে শুয়ে পড়ল। স্যাঁত-সেঁতে হিমের মধ্যে আর নড়তে ইচ্ছে হল না ওর। তবু চোখ পিটপিট করে ও দেখল, টেবিলে টেবিলে দেহ বিকৃত, বীভৎস, উদোম ন্যাংটো। চালচুলো সব কেমন একাকার হয়ে গেছে সবার।

আর এইসব দৃশ্য দেখে বুকের ভিতরে ঝিমঝিম করা একজাতীয় অস্থিরতা বোধ করল সতীশ। মুখ বাঁকা করে অনেকটা ঠিক বিপিনের মতই প্যাক দিয়ে উঠতে ইচ্ছে হল ওর। কিন্তু মরে গেলে প্যাক দেওয়ার আর অধিকার থাকে না বলে সতীশ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল। হিমঘরে হুলে হুলে হিমবাতাস বইতে লাগল। সতীশ চোখের জলে আঁকাবাঁকা অক্ষরে লিখল, সে বাঙালী, ১৯৭০ সালের কোনও এক সন্ধ্যায় চোরাগোপ্তা খেয়ে সে মারা গেছে। মরে গিয়েও এই দেশেই সে আরো একবার জন্ম নিতে চায়। এই মাটিতে, এই ধুলায়, এই কলঙ্কে। তারপর ভাঙা গলায় অস্পষ্ট করে হঠাৎ গান গাইতে গেল : বঙ্গ আমার·· ···

হাত

মাসের প্রথম দিকেই সদানন্দ এবার একটা বড়গোছের দেয়াল-আয়না কিনে ফেলল। সুদৃশ্য কারুকাজ করা ফ্রেম। সাধারণত কেরাণীবাবুদের ঘরে এ আয়নাই যথেষ্ট আভিজাত্য আনতে পাবে। ফলে দোকানীর সঙ্গে দরকষাকষিও করল না ও। পকেট থেকে কুড়িটা টাকা ফেলে দিয়ে আয়না নিয়ে চলে এল। ওর দৃঢ় বিশ্বাস শেফালির নির্ঘাৎ মনে ধরবে বস্তুটা। দামের জন্য একটু খচখচ করলেও দু'-একবার আয়নার সামনে দাঁড়ালেই সব কিছু সয়ে যাবে। সদানন্দ মনে করতে পারল, কতকাল ধরে এই রকম একটা বড আয়নাব ওবা অভাব বোধ করছিল। কত রাত এই নিয়ে ওরা জল্পনা-কল্পনাও করেছে। আজ হুট করে শেফালির হাতে আয়নাটা তুলে দিলে বেচারী নিশ্চিত ভড়কে যাবে। বলবে, 'ওমা, আয়না! দেখি দেখি—' আয়নাটা সামনে ধরে ঘাড গলা বাঁকিয়ে, ঠোট উলটিয়ে, চোখ ছোট করে বড় করে···শেফালি কেমন ভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আয়নায় নিজের প্রত্যঙ্গ দেখবে ভাবতে বেশ একটা আমেজই বোধ করছিল সদানন্দ।

কিন্তু বাস্তবে যা যা ঘটল তা অতি সাধারণ। শেফালি আয়নাটা ছোঁ মেরে সদানন্দের হাত থেকে তুলে নেওয়াব বদলে বলল, 'কোন্ জায়গায় টাঙাবে শুনি? দেয়ালের যা ছিরি হয়েছে।'

সদানন্দ তবু তৃপ্তি সহকারে হাসল, 'তুমিই বল না, কোন্ জায়গায় টাঙালে ভাল হয়?' তারপর কাগজের ভাঁজ থেকে আয়নাটা খুলে নিয়ে শেফালির দিকে তাক করে ধরল।—'কি, ছোট আয়নায় তো একসঙ্গে গোটা চেহারাটা পেতে না। এবার একবার ভাল করে দেখে নাও। আমি যেমন যেমন বর্ণনা দেই তার সঙ্গে মিলছে কি না–

শেফালি চাপা একটু তিরস্কার করে বলল, 'বয়স তোমার বাড়ছে, না কমছে।' বলেই পাকা গৃহিণীর মত সাত কাজে নিজেকে ভিড়িয়ে রাখবার জন্য রান্নাঘরের দিকে পা দিল।

হঠাৎই এ সময় সদানন্দের বাড়ির পোষা বেড়াল বাচ্চাটার কথা মনে পড়ল। যেন বেড়ালের মতই শেফালিও রহস্যময় একটা তৃপ্তিতে নিজের ভিতরেই ফুলে উঠেছে এখন। এবং ও ভাবল এইভাবে এখন আয়না নিয়ে শেফালির পিছন পিছন খানিকক্ষণ ছুটোছুটি করলে অদ্ভুত একটা নাটক জমতে পারে। ও তাই দ্বিরুক্তি না করে আয়না নিয়ে শেফালির সঙ্গে রান্নাঘরে এসে পা দিল। ফিস ফিস করে বলল, 'রাগ করলে নাকি ? জানো, কুড়িটা টাকা নগদ ঢেলে কিনেছি, একবার একটু দেখ।'

শেফালি বলল, 'ফুরিয়ে তো আর যাচ্ছে না। এখনই টুপা এসে পড়বে। তা ছাড়া মা রয়েছেন বাথরুমে, কি ভাববেন বল দেখি।'

সদানন্দ কেরানী সুলভ কায়দায় বলল, 'সরি। ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু কোথায় টাঙাতে হবে তা বলে দাও ?'

'আমি আবার কি বলব !' শেফালি ছোট করে হাসল। 'এমন জায়গায় টানাও যেন উঠতে বসতে সব সময় চোখে পড়ে।'

'অল রাইট।' সদানন্দ শেফালির চোখের ভাষা বুঝতে পারল। বলল, 'নোড়াটা দাও, পেরেক ঠুকতে হবে।' বলতে বলতে নোড়া নিয়ে শোবার ঘরে চলে এল।

এসে অনেকক্ষণ এদিক-ওদিক তাকিয়ে ঘর জোড়া চৌকির একপ্রান্তে পেরেক ঠুকতে শুরু করল। অনেক কালের পুরনো দেয়াল। অনেক কাল চুনকাম নেই। দেয়ালে ছোপ ছোপ বিচিত্র সব দাগ। আয়নাটা ঝুলিয়ে দিলে পানের পিকের মত দাগগুলো তবু খানিক চাপা পড়বে ভেবে সদানন্দ খানিকটা যেন স্বস্তিই বোধ করল।

পেরেকের মাথাটা বেঁকে যাচ্ছিল। কায়দা করে আরো কয়েকবার ঠুকতে হল। তারপর খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে আয়নাটা এক সময় ঝুলিয়ে হাত ঝেড়ে সামনে এসে দাঁড়াল। দু পা পিছিয়ে আসতেই সমস্ত দেহটা ওর আয়নায় ধরা পড়ল। অদ্ভুত এক ক্লান্ত চেহারা সদানন্দের। নামের সঙ্গে চেহারার এতটুকু মিল নেই। চোখ দুটো গরুর চোখের মত—কে যেন এই ধরনেরই একটা উপমা দিয়ে ওকে বর্ণনা করেছিল। সদানন্দ কৌতূহলী দৃষ্টিতে নিজের চোখের দিকে তাকাল। চোখের তারায় বিবর্ণ হলুদ আভা। জনডিসের রুগীর মত। কে জানে, ঐ জাতীয় কোন একটা রোগ সত্যি সত্যি ওর দেহের মধ্যে আশ্রয় করে আছে কিনা। যদি থাকে, সদানন্দ হেল্পলেস।

জীবনে অনেক কিছুই অমনভাবে সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গোপনে রয়ে গেছে। যাদের প্রতি সদানন্দের কিছুই করণীয় নেই। কি করবে সদানন্দ। সাধারণ একজন কেরানীর পক্ষে কতটুকুই বা করা সম্ভব।

সদানন্দ বুঝল আয়নায় নিজের প্রতিকৃতি অমন অগোছালো লাগছে তার অন্যতম কারণ কয়েকদিন ওর শেভ হয় নি। ফলে গালে হাত বুলাবার জন্য হাত তুলল। প্রথমে ডান হাত। গলাটাকে সারসের মত খানিকটা এগিয়ে ধরল। আর ঠিক এ সময়ই ও সেই অভূতপূর্ব জিনিসটা আবিষ্কার করে চমকে উঠল। যা আবিষ্কার করল তাতে শক্ত হয়ে পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া কারো গত্যন্তর থাকে না। ওর প্রশ্বাস রুদ্ধ হল। ও দেখছিল, ডান হাতের কনুই থেকে কবজি অবধি অংশটা অস্বাভাবিক রকম ছোট মনে হচ্ছে ওর। অথচ বা হাতখানা স্বাভাবিক। প্রথমে মনে হল ভুল দেখছে। পরে মনে হল, অসম্ভব। তবে কি আয়নাটাতেই গলদ আছে? আমাকে স্রেফ ঠকিয়ে দিল নাকি লোকটা! পরে মনে হল অসম্ভব। আয়নার যে অংশে ডান হাতের প্রতিবিম্ব দেখছিল ও সেই অংশে বাঁ হাতটা এগিয়ে ধরে প্রতিবিম্ব দেখল। নাহ্, বেশ স্বাভাবিক আছে বাঁ হাতটা। তা হলে? তবে কি ওর অজান্তেই অপুষ্টিজনিত কোন রোগে আক্রান্ত হয়ে ডান হাতখানা দিনে দিনে ছোট হয়ে আসছে। তবে কি এতকাল বড় একটা আয়নার অভাবে হাতের এই অস্বাভাবিক অবস্থাটা ওর নজরে পড়ে নি। নিজের চোখকে অবিশ্বাস করার উপায় নেই। সদানন্দ বাঁ হাতটাকেও ডান হাতের মত ভাজ করে গালের উপর স্থাপন করল। নাহ্, বেশ স্পষ্ট ও হাত দুটোর দৈর্ঘ্যের তফাৎ বুঝতে পারছে। মনে হচ্ছে ডান হাতের কনুইয়ের কাছে মাংসপিণ্ড কিছু পরিমাণ ভারী। যেন দৈর্ঘ্যে ছোট হয়ে যাওয়ার জন্যই অমন ধাবা বেঢপ দেখাচ্ছে ওটাকে। অথচ বা হাতটা পুরোপুরি স্বাভাবিক। সদানন্দ হাত নামাল। দু হাত দু পাশে সটান ঝুলিয়ে দিল। নাহ্, স্পষ্টই বুঝতে পারছে ডান হাতখানা বাঁ হাতের তুলনায় বেশ কিছুটা ছোট। আগেও কি এমন ধারা ছোট ছিল হাতখানা! থাকলে কোন না কোন সময়ে ঠিক ধরা পড়ে যেত। সদানন্দ অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে ঘামতে লাগল।

এমন সময় হঠাৎ পিছনে, দরজায় মায়ের গলার শব্দ পেল ও। 'আয়না এনেছিস শুনলাম?'

সদানন্দ চোরের মত ডান হাতটাকে লুকোবার চেষ্টা করে বলল, 'হু।' তারপর দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

'চা হয়ে গেছে, খেয়ে বেরিয়ো কিন্তু।' রান্নাঘর থেকে শেফালিও পিছু ডাকল। কিন্তু ডান হাতটা এখন কি রকম যেন অবশ অবশ লাগছে না। যেন প্যারালাইজড রুগীর মত হাতটায় এখন এতটুকু বশ নেই। শেফালিকে কি এই অস্বাভাবিক অবস্থাটার কথা বলা উচিত! সদানন্দ দাঁড়া'ল। মাথার মধ্যে বিশ্রীভাবে ঝিমঝিম করছে। শেফালিকে বললে ব্যাপারটা হয়ত এখনই অন্য রকম দাঁড়াবে। নির্ঘাৎ কান্নাকাটি শুরু করে দেবে ও। অথচ এ নিয়ে এখন একটা কেলেঙ্কারী শুরু হোক কে চায়। ফলে স্বাভাবিক হওয়ার জন্য সদানন্দ বলল, 'দাও, এক্ষুনি আবার বেরুতে হবে।'

শেফালি চায়ের কাপে চামচ নাড়ছিল। এবার ডিস শুদ্ধ এগিয়ে ধরল। ধরতেই সদানন্দ কেমন যেন বোকাভাবে তাকিয়ে রইল। কোন হাত দিয়ে কাপটাকে ধরা দরকার। ডান হাত দিয়ে' সর্বনাশ, যদি ধরে রাখতে না পারি বেশিক্ষণ? যদি দুর্বলতায় হাত থেকে খসে পড়ে কাপ-ডিস? তা হলে এখনই ধরা পড়ে যাব। অথচ বাঁ হাতখানা এগিয়ে দিলেও যদি ও সন্দেহ করে—

'কি হল? ধর, দাঁড়িয়ে থাকব নাকি?'

সদানন্দ চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি বাঁ হাতটাই এগিয়ে দিয়ে চায়ের ডিসটাকে তুলে ধরল।

'আয়না দেখে মা কিছু বললেন না?'

'কি আবার বলবেন।' সদানন্দ সংক্ষেপে উত্তর সেরে চায়ের কাপে ঠোট ছোঁয়াল।

'মা যে কিছু বলবেন না আমি জানতাম। বাড়িতে কিছু নতুন জিনিস হলেই মায়ের মুখ ভারী হয়ে যায়, আমি বুঝি। মায়ের ধারণা আমিই ওসব তোমাকে দিয়ে কেনাই।'

সদানন্দের ইচ্ছে হল কাপটা এই মুহূর্তে শেফালির দিকে ছুঁড়ে মেরে যে কোন দিকে বেরিয়ে যায়। চুলোয় যাক ঘর-দোর। শালা নিজে মরছি হাজার রকম জ্বালায় তার উপর এই সব ইতর কাণ্ড। কিন্তু ডান হাতের কবজির কাছে চিনচিন করছে না? উহ্, কি বিপাকেই পড়া গেল। সদানন্দ

ঝুঁকে কাপটাকে নামিয়ে রেখে বেরিয়ে পড়ল। শেফালি তখনও বিড়বিড় করে কি যেন বলবার চেষ্টা করছিল কানে আনল না ও।

বাড়ির বাইরে একদল ছেলের সঙ্গে টুপাকে খেলা করতে দেখে থমকে দাঁড়াল সদানন্দ। 'টুপা, এদিকে আয়।'

টুপা খেলা ফেলে চোরের মত এগোল।

সদানন্দ বলল, 'আর একটু এদিকে আয়। তোকে একটা জিনিস দেখাব।'

একটু নির্জন জায়গায় এগিয়ে এল বাপ ছেলে। সদানন্দ এবার তার বাঁ' হাতখানা এগিয়ে ধরে বলল, 'কি দেখছিস ?'

টুপা কৌতুকে তাকিয়ে রইল।

'কি দেখছিস হারামজাদা ? কোন হাত এটা ?'

টুপা ভয়ে ভয়ে বলল, 'বাঁ হাত।'

'বেশ, এবার দেখ।' পকেট থেকে ডান হাতটা বার করে সদানন্দ আবার প্রশ্ন করল, 'এবার ? এবার কেমন দেখছিস ?'

টুপা তেমনি ভাবে হতভম্বের মত তাকিয়ে রইল।

'ডান হাতটা ছোট মনে হচ্ছে না তোর ?'

টুপা ভয়ে ভয়ে বলল, 'হু।'

সদানন্দের বুকের ভিতর ভুর ভুর করে নড়ে উঠল। ছোট মনে হল তোর ? এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে। তা হলে ব্যাপারটা এখন এমন দাঁড়াল যে, সদানন্দের ডান হাত ক্রমশই কনুই থেকে কবজি অবদি ছোট হয়ে আসছে। দিন কয়েকের মধ্যেই এ ঘটনাটা অফিসে জানা জানি হয়ে যাবে। এটা যদি কোন ধরনের ছোঁয়াচে রোগ বলে প্রমাণিত হয় তা হলে ওকে সিক লিভ নিয়ে ঘরে বসে থাকতে হবে। যাহ্, ছোঁয়াচে রোগ অত সোজা। ছোঁয়াচে রোগ বলতে কলেরা, বসন্ত, টিবি—আরো এক গাদা রোগের নাম ওর মনে পড়ছিল। কিন্তু একটা রিকশ ওর সামনে দিয়ে ঠুন ঠুন করে চলে যেতে ওর খেয়াল ভাঙল। তাকিয়ে দেখল টুপাও সামনে থেকে সরে গিয়ে ছেলেদের দলে মিশে গেছে। ফলে উলটো মুখেই হাঁটতে শুরু করল সদানন্দ। হাঁটতে হাঁটতে অত্যন্ত ধীরে ভাঁজ করা পাঞ্জাবীর অংশটুকু খুলে গোটা হাতটাকে ঢেকে নেবার চেষ্টা করল। চুড়িপাঞ্জাবির বোতামগুলো একটাও আস্ত নেই। না থাক, কবজি অবদি তো ঢাকা পড়ল।

বাঁ হাতের ভাঁজও ও খুলে দিল। তারপর ডান হাতটাকে পকেটে ঢুকিয়ে—আশ্চর্য, বাঁ হাতের আঙুলগুলো পকেটের শেষপ্রান্তে জড় হয়ে আছে, কিন্তু ডান হাতের আঙুলগুলো অনেক উপরে। এর দ্বারাও কি প্রমাণ হচ্ছে না ডান হাতটা আমার বেশ কিছুটা ছোট হয়ে গেছে। সত্যি, কথাটা ভাবতে বড় অদ্ভুত লাগছিল সদানন্দের, দেহের এতবড় একটা পরিবর্তন গোপনে ঘটে যাচ্ছিল এতদিন ধরে, অথচ একটুও টের পায় নি সদানন্দ। তবু যা হোক আয়নাটা কিনে আনায় আজ হঠাৎ ধরা পড়ল। কে জানে, আরো কিছু দিন এই ভাবে চললে ওর কনুই কবজি এক জায়গায় এসে মিশে যেত কি না। তখন ও ঠুঁটো, যে দেখবে সেই অদ্ভুত চোখে ওর এই হাতখানার দিকে তাকিয়ে থাকবে। যেমনভাবে কয়েকদিন আগে রাস্তার মোড়ে সদানন্দ একটা গাট্টাগোট্টা বেঁটে ধরনের গরু দেখেছিল। গরুটার পাগুলো অত্যন্ত ছোট ছোট, কিন্তু দেহের অন্য অংশের গঠনগুলো সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল। গরুর মালিক তিলক-কাটা এক ভণ্ড, গরুটাকে দেখিয়ে গান গেয়ে, ঘণ্টা বাজিয়ে পয়সা রোজগার করছিল। সদানন্দও গরুটার মত বেঁটে হয়ে যাচ্ছে নাকি। দ্যুত ছাই, কি সব আবোল তাবোল মাথায় আসছে। সদানন্দ বড় রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল। সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় ধুঁয়ো চাপা অদ্ভুত একটা থমথমে ভাব লক্ষ করল। চোখ জ্বলছে ধুঁয়োয়। কিন্তু, আমি এখন যাচ্ছি কোথায়? কোথায়? কার কাছে যাচ্ছি? সদানন্দ এমন একজনের নামও মনে করতে পারল না যে ওর অত্যন্ত আপনার। যার কাছে গিয়ে এখন গল গল করে ওর এই গোপন ব্যাধিটার কথা বলা যায়।

হঠাৎ মনে পড়ল, কাছেই একটা ফার্মেসী আছে। ডাক্তার ঘোষও ওর অপরিচিত নন। ঘোষের কাছেই চুপি চুপি গিয়ে ব্যাপারটা খুলে বললে কেমন হয়। —দেখুন ডাক্তারবাবু, বেশ কিছুদিন ধরে লক্ষ করছি আমার এই হাতখানা—

ডাক্তার ঘোষ নিশ্চয়ই বলবেন, স্ট্রেঞ্জ! এমন কেস তো সচরাচর চোখে পড়ে না। বলুন, আপনার কি কি ট্রাব্‌ল্ হচ্ছে? বলুন?

আমার কি কি ট্রাব্‌ল্ হচ্ছে? প্রথমত, আমার ডান হাত অস্বাভাবিক রকম ছোট হয়ে যাচ্ছে। যদি এই রকম হারে ছোট হতে থাকে তা হলে আমার আকৃতিটা কেমন কদর্য দেখতে হবে ভাবুন। আকৃতির কথা ছেড়ে দিন, আমার হাতটা প্যারালাইজড রুগীর মত কেমন যেন অবশ অবশ

লাগছে। অথচ ডান হাতই আমার সব। এই হাতেই আমি কলম পিষি। মাসের শেষে সই করে এই হাতেই আমি টাকা নেই। আমার উপরই আমার ছেলে, আমার স্ত্রী, আমার মা নির্ভর করছে, ভাবুন একবার। আপনি কি মনোযোগ দিয়ে আমার কথাগুলি শুনছেন ডাক্তার ঘোষ?

হঠাৎ সদানন্দের চমক ভাঙল। ওর কাঁধের উপর কে যেন হাত ছুঁইয়েছে। 'কে?' চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়াল সদানন্দ। —'আরে, গোপাল!'

'সেই কখন থেকে ডাকছি, একদম শুনতেই পাস না।' গোপাল ওর কাঁধের উপর ঝাঁকি দিয়ে বলল।

সদানন্দ ডান হাতটা সঙ্গোপনে দেহের সঙ্গে সাটিয়ে রেখেই বলল, 'একটু অন্য কথা ভাবছিলাম। তা কেমন আছিস? কোথায় যাচ্ছিস?'

'যাহ্ বাবা, এমন ভাব করছিস যে অনেক কাল পর তোর সঙ্গে দেখা হল। কি হয়েছে বলত? কি ভাবছিস?'

'নাহ্, কিছু না।' সদানন্দ ঘোলাটে চোখে তাকাল। গোপাল ওর অনেক কালের বন্ধু। ওর অনেক গোপন কথাই গোপালের জানা। যেমন গোপালের কথাও সদানন্দ জানে। কিন্তু গোপালের সঙ্গে অতর্কিতে দেখা হয়ে যাওয়ায় সদানন্দ যেন এক ধরনের বিপাকেই পড়ল। পর মুহূর্তেই মনে হল, তবে কি ভগবানই এমন যোগাযোগ ঘটিয়ে দিলেন। তবে কি গোপালকেই ওর হাতের ব্যাপারটা এখন খুলে বলা দরকার। হয়ত গোপালই ওকে এ ব্যাপারে কিছু সৎবুদ্ধি দিতে পারে। সদানন্দ বলল, 'চল, সাউথ কাফেতে বসি। অনেক কথা আছে।'

'কি বিষয়ে?' গোপাল ওর পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে প্রশ্ন করল।

'আছে, বলবোখন।' সদানন্দের বুকটা যেন ছলকে ছলকে কাঁপতে শুরু করেছে। ডান হাতটায় এখন আর কোন রকম অনুভূতি আছে কি না ধরতে পারছিল না ও। ইস, রোগটা যদি আরো কিছুকাল আগে ধরা পড়ত নির্ঘাৎ সামলে উঠতে পারতাম। সবই ভাগ্যের ব্যাপার।

'কি বিষয়ে কথা রে? পারিবারিক না অন্য কিছু?' গোপাল নিচু গলায় প্রশ্ন করল।

সদানন্দ বলল, 'পারিবারিকও বলতে পারিস, আবার অন্য কিছুও।'

'ভারী ইনটারেস্টিং তা হলে?'

সদানন্দ বলল, 'শুনলে কিন্তু মনটন খারাপ হয়ে যাবে। মস্ত বড় দুঃসংবাদ

একটা।' ডান হাতটা হঠাৎ চিন চিন করে নড়ে উঠল। ঠিক যেমন ভাবে এক এক সময় সমস্ত গা অহেতুক ঝাঁকি খেয়ে নড়ে ওঠে তেমনি ভাবে নড়ে উঠেই আবার স্থির হয়ে গেল।

'দুঃসংবাদ।' গোপাল খানিকটা সন্দেহের চোখে সদানন্দের দিকে তাকাল।

'চল, চা খাই, সব বলছি।' সাউথ কাফের সিড়িতে দাঁড়িয়ে সদানন্দ ইশারা করল গোপালকে।

গোপালও ওর কাঁধে হাত রেখে বলল, 'চল।'

ওরা কোণের দিকে একটা নির্জন টেবিলে বসল। গোপাল ইশারা করল বেয়ারাকে চা দিতে। সদানন্দ বলল, 'সিগারেট ছাড়।'

সিগারেট বার করে সামনে এগিয়ে দিল গোপাল। সদানন্দ ভয়ে ভয়ে বাঁ হাত তুলল। একটা সিগারেট আঙুলের ভাঁজে কায়দা করে তুলে নিল। বলল, 'ধরিয়ে দে।'

গোপাল বলল, 'ব্যাপার কি বলত? বড্ড নার্ভাস হয়ে গেছিস মনে হচ্ছে?'

সদানন্দ বিবর্ণভাবে তাকাল। 'সাইবি ভীষণ নার্ভাস ফিল করছি। এমন একটা ঘটনা ঘটেছে, যা তুই চোখে দেখলেও বিশ্বাস করতে পারবি না। দে, দেশলাইটা জ্বাল।'

গোপাল দেশলাইটা পকেট থেকে বার করে টেবিলের উপর রাখল।

সদানন্দ বলল, 'জানিস, ডান হাতটা আমার অকেজো হয়ে গেছে। তুই ধরিয়ে দে।'

গোপাল লক্ষ করল সদানন্দ ডান হাতটাকে সটান ওর ডান পাশেই ঝুলিয়ে রেখেছে। হাতের কবজি অবদি পাঞ্জাবির হাতায় ঢাকা। হাতের চেটোটাও দেখবার উপায় নেই, ওটা পকেটের মধ্যে লুকান।

'হয়েছে কি বলবি তো?' দেশলাই জ্বালিয়ে সিগারেট ধরিয়ে দিতে দিতে বলল গোপাল, 'চোট-টোট পেয়েছিস।'

'না, ও সব না। আসলে আমার ডান হাতটা দিনে দিনে ছোট হয়ে যাচ্ছে। অনেক দিন থেকেই হাতটা কেমন অবশ অবশ লাগছিল, একটু চিনচিনে ব্যথাও। বেশিক্ষণ একটানা লেখালেখি করলেই হাতের আঙুলগুলো ঝিন

ঝিন করে কাঁপত। তখনও ভাই বুঝতে পারি নি আসলে রোগটা ঠিক কোথায়?'

'কি বলতে চাস তুই?' গোপাল কৌতুকে তাকিয়ে রইল সদানন্দের দিকে।

বেয়ারা এসে দু' কাপ চা রেখে গেল।

সদানন্দ বলল, 'আমি জানতাম, তুই কেন, যেই শুনবে সেই এটাকে ভূতুরে বলে উড়িয়ে দিতে চাইবে। বাট ইট হ্যাপেণ্ড।' তারপর সবিস্তারে সদানন্দ আয়না কেনার প্রসঙ্গ থেকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের হাত ছোট হয়ে যাওয়া আবিষ্কার ইত্যাদি সমস্ত কিছু গাম্ভীর্য নিয়ে বলে গেল।

গোপাল খানিকক্ষণ নীরব থেকে বলল, 'দেখি, হাতটা দেখা একবার।'

সদানন্দ বলল, 'এখানে? এত লোকের মধ্যে? অনেকেই কেমন তাকিয়ে আছে। পরে দেখাব।'

'তুই একটা আস্ত পাঁঠা।' গোপাল বিরক্তভাবে বলল।—'না দেখালে বুঝব কি করে। তাছাড়া তোর মনের ভুলও তো হতে পাবে।'

'মনের ভুল!' সদানন্দ এমন ভাবে কথাটা উচ্চারণ করল যেন দিনরাত্রি মিথ্যে হতে পারে, কিন্তু ওর হাত ছোট হওয়াটা মিথ্যে নয়। —'মনের ভুল বলছিস কেন? আজকাল তো কত অদ্ভুত রোগ হয় মানুষের, কাগজে দেখিস না! আমারও হয়ত অমন অদ্ভূত কিছুই হয়েছে।'

'কি রকম অদ্ভুত? দুটো একটা বল শুনি?'

সদানন্দের চট করে মনে পড়ল কিছুদিন আগে সেক্স-চেঞ্জ হয়ে একজন মহিলা কি রকম পুরুষ হয়ে গিয়েছিল। বলল, 'এই যেমন ধর না সেক্স-চেঞ্জ হয়ে—'

'ওটা প্রকৃতির খেয়াল।'

'তা হলে আমার হাত ছোট হওয়াটা অবিশ্বাস করছিস কি করে? এটাও তো একটা খেয়াল হতে পারে!'

'হু। প্রকৃতির আর কাজ নেই তোর হাত ছোট করার জন্য বসে আছে।'

বেয়ারা এসে দাঁড়াতে গোপাল চায়ের দাম চুকিয়ে দিল। তারপর একটা সিগারেট ধরাল। তারপর নীরবতা। সদানন্দ ম্যানেজারের টেবিলের দিকে

চোখ পেতে বসে আছে। গোপাল দেখল অত্যন্ত ক্লান্ত বিষণ্ণ দেখাচ্ছে ওকে। আশ্চর্য, রাতারাতি একটা আয়না কিনে পালটে গেল নাকি ছেলেটা! ইচ্ছে হল জোর করে ওর ডান হাতের উপর একটা ঘুষি চালিয়ে দেয়। পর মুহূর্তেই ভয় হল, যা সিরিয়স টাইপের ছেলে, হিতে না জানি বিপরীতই কিছু ঘটিয়ে দেবে। কিন্তু কিভাবে ওকে সান্ত্বনা দেওয়া যায় ভেবে পাচ্ছিল না গোপাল। হঠাৎই প্রশ্ন করল, 'শেফালি কি বলল?'

'ওকে এখনও বলি নি।' ম্যানেজারের টেবিল থেকে চোখ সরিয়ে গোপালের দিকে তাকাল সদানন্দ।

গোপাল বলল, 'তা হলে কোন ডাক্তারের কাছেই চল। অফিস থেকে ছুটি নিয়েছিস?'

'অফিসেও জানে না। এই তো খানিকক্ষণ আগে আমি অসুখটাকে ধরতে পেরেছি। কাল আমি অফিসে যাব কি করে তাই ভাবছি।'

'ডাক্তার দেখিয়েছিস?'

সদানন্দ বলল, 'দেখাতেই হবে। কাল সকালে যাব ভাবছি। চল, উঠি এবার।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দুজনেই নীরবে এসে রাস্তায় নামল। গোপাল বলল, 'বাড়ি অবদি পৌঁছে দেব তোকে?'

'না না, আমি একাই যেতে পারব। তবে মাইরি কাউকে যেন ব্যাপারটা তুই বলে বেড়াস না।'

'না না, পাগল হয়েছিস, বলে বেড়াব।' গোপাল ওর পিঠে হাত রেখে সান্ত্বনা দিল। তবে যদি দরকার হয় আমাকে একটা খবর দিস।'

'ঠিক আছে।' সদানন্দ হন হন করে বাড়ির রাস্তায় এগোতে শুরু করল। গোপালটা ওকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ করছে বুঝতে পেরেও ও পিছন দিকে তাকাল না।

কাজটা কি ভাল করলাম। সদানন্দ ভাবল। যতই বন্ধু হোক গোপাল অসুখের কথাটা না বললেই বোধ হয় ভাল হত। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে চাকরি নিয়ে নির্ঘাৎ গোলমাল শুরু হবে। এমন একটা ছ্যাঁচড়া ধরনের অফিসে চাকরি করি। ডাহা পথে বসতে হবে তা হলে। অথচ এ সব ব্যাপার কতক্ষণই বা চাপা রাখা যায়। ডাক্তারকেও তো ঘটনাটা বলতে হত। তখনই তো চারদিকে ছড়িয়ে যেতে পারত! যাকগে, যা হবার হয়েছে। একটা

বড ডাক্তারেব সঙ্গে কনসাল্ট করতে পারলে ভাল হত। বড ডাক্তার মানেই ষোল টাকা, তারপব চিকিৎসা খরচ। ধ্যুত, বড ডাক্তার ছোট ডাক্তার সবই সমান। আসলে ভাগ্য। ভাগ্য মন্দ হলে কোন শালার ক্ষমতা নেই কিছু করে। হঠাৎ মনে হল, এখনো তো রাত বেশি হয় নি, একবার কি ঘোষের ফার্মেসী থেকে ঘুরে আসব। একটুক্ষণ দাঁড়াল সদানন্দ। ধরা যাক আমি চেম্বারে গিয়ে ডাক্তারেব কাছে সব কিছু বললাম। ডাক্তাব আমার হাত পবীক্ষা করে যদি সাংঘাতিক কিছু বলেন। যদি বলেন এমপুট করে হাতখানা বাদ দিতে হবে মশাই। নাহ্, থাক, সকালেই যাওয়া যাবে। সদানন্দ আবার টুকটুক করে বাড়িব বাস্তায় হাঁটতে লাগল গলিব মুখে লাইটপোস্টের বালবটা সেই ক'দিন থেকেই ফিউজ হয়ে আছে। জাযগাটা অন্ধকার মত লাগল। গোটা শহরটাই এমন অন্ধকার থাকলে মন্দ হত না। কেউ ওর হাতের দিকে লক্ষ করাব সুযোগ পেত না। চোবেব মত ঘাড গুঁজে সদানন্দ এগোতে লাগল।

তাবপর এক সময ঘরে ঢোকার মুখে শুনতে পেল, টুপা সুর করে কবিতা পড়ছে। ঐ একটাই কবিতা বোজ ওকে পডতে দেখে সদানন্দ। ছেলেটাও মহা ধড়িবাজ হয়ে উঠেছে। সদানন্দ টুপাব কাছাকাছি এগিয়ে এল। টুপা চোখ তুলে তাকাতেই প্রশ্ন করল, 'তোর মা কোথায় টুপা?'

টুপা বলল, 'রান্নাঘবে।'

'আব ঠাকুমা?'

'পূজো কচ্ছেন।'

সদানন্দ আব দাঁড়াল না। নিজেব শোবার ঘবে এসে ঢুকে পড়ল। টুক কবে সুইচ টিপে আলো জ্বালল। আয়নাটা জ্বল জ্বল কবে ঝুলছে। খাসা দেখতে আয়নাটা। কিন্তু— সদানন্দ আয়নার সামনে এসে দাঁড়িযে হাত থেকে পাঞ্জাবিটা আবাব গুটিয়ে কনুইযেব উপরে তুলে রাখল। নিজেব চোখেব দিকে তাকাল সদানন্দ। মনে হল চোখের চারদিকের কালো আভাটা বড় বেশি প্রকট হয়ে উঠেছে। চোখেব মণি দুটো বীভৎস দেখাচ্ছে। দুই ভুরুর মাঝখান থেকে কপালের শেষ সীমা অবদি কেঁচোব মত একজোড়া শিরা ফুলে উঠেছে। চোয়ালের হাড দুটো যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল সদানন্দ। চোখ নামাল। নিচে আয়নায় ঝুলে থাকা ডান হাতের দিকে লক্ষ করল। খর্বাকৃতি হাতটা অনড হয়ে ঝুলে আছে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সদানন্দ, বাঁ হাতের

তুলনায় ডান হাতটা অসম্ভব ছোট দেখাচ্ছে। দুটো হাতই উঠিয়ে ভাঁজ করে সামনে তুলল। দুটো হাতের প্রতিচ্ছবিই আয়নায় দেখতে পেল। একটা ছোট, একটা বড়। ফলে, ভীষণ গুমোটে বুকের ভিতরে কেমন একটা চাপ সৃষ্টি হতে লাগল ওর। যেন আর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে মাথা ঘুরে পড়ে যেতে পারে সদানন্দ। তাড়াতাড়ি বাঁ হাতের উপর ভর দিয়ে চৌকির একপ্রান্তে বসে পড়ল। দেখল, সামনেই খোলা দরজা। আমি যে এসেছি শেফালি বোধ হয় এখনো টের পায় নি। টুপা সেই পুরনো কবিতাটাই চিৎকার করে পড়ে চলেছে। যেন বাপকেই কবিতা শোনাচ্ছে ছেলে। খুব শাহানশা হয়েছে ছেলেটা। সদানন্দ চীৎকার করে ওর কবিতা পড়া বন্ধ করতে যাচ্ছিল, দম চেপে নিজেকে সামলে নিল।

মাথাটা সন্ধ্যা থেকেই ঝিম ঝিম করছিল। সমস্ত দেহটাই এখন ঝিম ঝিম করছে। প্রচণ্ড রক্তপাত ঘটে গেলে শরীরে বোধ হয় এই ধরনের একটা অবসাদ জাগে। এত অবসাদ যে ওর পক্ষে আর বসে থাকাও সম্ভব হচ্ছিল না। ডান হাতটাকে সামলে নিয়ে সদানন্দ আগোছাল বিছানার উপর এলিয়ে পড়ল।

এই সময়ে আবার ওর মনে হল, এমনও তো হতে পারে সত্যিকারের ভালোমানুষ দেখে দোকানদারব্যাটা নির্ঘাৎ আমাকে ঠকিয়ে দিয়েছে। আসলে–আয়নাটাতেই গলদ আছে। আহা, আমার ডান হাত! ডান হাতটা নাড়বার চেষ্টা করল সদানন্দ। দোকানদারকে এ সময় একবার পেলে হত। —'এই যে মশাই, শেষ পর্যন্ত খারাপ আয়নাটাই চালিয়ে দিলেন?'

দোকানদারটা যদি চেঁচিয়ে ওঠে, 'অসম্ভব। কে বলেছে খারাপ মশাই? আপনি ভুগছেন রোগে, দোষ দিচ্ছেন আয়নার?'

সদানন্দ ভাবল, যতই হোক দোকানী কি কখনো তার সওদাপত্রের নিন্দে করবে! অসম্ভব। তা হলে আমি করি কি?

উঠে আবার আয়নার সামনে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে হঠাৎ খানিকটা যেন আশার আলো দেখতে পেল। ভাবল, সেই লোকটাকে যদি খুঁজে পাই, যে লোকটা বানিয়ে ছিল আয়নাটা! উত্তেজনায় থর থর করে কেঁপে উঠল সদানন্দ। ব্যাস, এইবার ঠিক পাওয়া গেছে। আয়না-মিস্ত্রীর ঠিকানা? ও আমি ঠিক বার করে নেব। এইবার একটা হিল্লে হতে পারে ব্যাপারটার।—'হ্যাঁ মশাই, আপনিই তো আয়নাটা বানিয়েছেন?'

'যে আজ্ঞে, বানিয়েছি।

'বেশ বেশ। একবার দাঁড়ান তো সামনে। আপনাকে একবার আয়নার ভিতরে দেখতে চাই।'

সদানন্দ এবার ভীষণ তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ করবে লোকটার ডান হাতটাও ছোট দেখায় কি না। যদি ছোট, বেঁটে গরুর পায়ের মত দেখায়। হুররে—

আর যদি স্বাভাবিক দেখে সদানন্দ!

ধীরে ধীরে আবার সমস্ত আশার আলো যেন ঝিম মেরে নিবে এল। সদানন্দ বুঝতে পারছিল না দোষটা তা হলে কার—আয়নার, না আমার? আয়নাটাই কি মেকি? না আমিই কোন রোগে ভুগছি।

ধ্যাত্ তোর! ইচ্ছে হল, আয়নাটাকে লুকিয়ে বাইরে কোথাও ফেলে দিয়ে আসে; কিন্তু শেফালি? শেফালিকে কিছুতো একটা বলতে হবে। কি বলব; বলার মত কিছুই ভেবে পেল না সদানন্দ।

তারপর কিছুই ভেবে না পেয়ে ঠিক করল যা হয় হোক। হাওয়ায় যেন নিজেকে ভাসিয়ে দেবার জন্যই ও তৈরি হল।

নাগরদোলা

অফিস ছুটির পর হঠাৎই একদিন বীণার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমাদের সেই যাদবপুরের বীণা। যার বাড়ির রোয়াকে আমাদেব আড্ডা বসত। কখনো বা ভিতরে যাওয়ারও পারমিট পেতাম আমরা মাসীমার কাছ থেকে। মাসীমা নারকেল মুড়ি খাওয়াতেন, কখনো তেলে ভাজা, কখনো আবার চা-কফিও জুটে যেত। আমরা মাঞ্জা মেরে শানিয়ে থাকতাম, কথায় কথায় জগৎ অন্ধকার করে দিতাম—সেই দিনগুলোর কথা সুন্দরভাবে মনে পড়ে গেল।

দেখলাম, হালকা একটা ছাপা শাড়ি পরে বীণা ট্রাম স্টপে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে বেতের বোনা ব্যাগ, মৌচাকের মত খোঁপা ; একটু যেন মুটিয়েছে মেয়েটা। এ সময় চোরেব মত এগিয়ে গিয়ে ওব চোখ দুটো টিপে ধরলে কেমন হয় ? বল তো কে ? উঁহু, আগে নাম বল। বেশ মজা হয়। কিন্তু চারপাশে তখন অফিস ছুটির ভিড় ; বেশ কিছু যাত্রী হা হা করে তাকিয়ে থাকল। রাস্তার মাঝে ঢ্যামনাগিরি না করলেই কি চলে না দাদা! অগত্যা শান্তভাবে এগিয়ে, 'আরে বীণা যে! কি খবব ?' কিংবা, 'কি সৌভাগ্য আমার!' বললে কেমন হয়।

এগোলাম, 'মাই গুডনেস, তুমি এখানে ? কি মনে করে ?'

'ওম্মা প্রেম! তুমি কোত্থেকে ?' বীণাও পাল্টা বিস্ময় প্রকাশ করল। যেন লটারীর টিকিট লেগে গেছে। তারপর তড়বড করে বলল, 'কি আশ্চর্য! দুদিন আগেই কিন্তু তোমার খোঁজ করছিলাম আমবা। জানো, বুলকিব বিয়ে হয়ে গেছে।'

আমার প্রেমাঙ্ক নামটাকে ওরা ছোট করে 'প্রেম' বলে ডাকত! প্রায় বছর খানেক পরে সেই 'প্রেম' ডাকটা যেন খট করে কানে এসে বিঁধে গেল। আমাদের বাসা বদলির খবর শুনে বীণা বেশ মজা করে একটা কথা বলেছিল। বলেছিল, 'আর কি, এবার তো যাদবপুরের প্রেম চলে যাচ্ছে বেহালায়। আমরা এখন প্রেম-বিহীন হয়ে থাকব।'

অবশ্য বীণার সঙ্গে আমাদের ঐ রকমই টার্ম ছিল। পাছে আরো বেশী দুর এগোতে হয় এই ভয়ে বেহালায় বাসা বদলির পর একদিক থেকে যেন বেঁচেই গিয়েছিলাম। বীণার যিনি পতি দেবতা হবেন তাঁর লাইফ যে একেবারে অন্ধকার এবিষয়ে আমরা আলাদাভাবে আলোচনা করতাম, সিক্রেট আলোচনা, বলবি না কিন্তু, হ্যা ? বলব না।

শুধালাম, 'কার সঙ্গে হল শেষ পযন্ত ?'

'কার সঙ্গে আবার সেই মাদ্রাজী ছেলেটাই। যাকে ও বাংলা শেখাতে শুরু করেছিল, মনে নেই!' বীণা চোখ টিপে হাসল। সে অনেক ইতিহাস।'

'তাই বুঝি ?'

'তাই বুঝি কি! তোমার তো আর পাত্তাই নেই, পাড়া পালটেছ বলে কি আসতে নেই নাকি।'

'না না, সেজন্য নয়। সময় পাই না একদম।' খুব বিনয় করে বললাম। যেন কতই না উদ্‌গ্রাব হয়ে আছি তোমার জন্য, অথচ অফিসের চাপ, বাড়ির ঝামেলা-- 'তোমার কথা প্রায়ই মনে পড়ে।' বীণাকে খুশী করতে হলে ঐভাবেই বলতে হয়। বললাম।

বীণা তড়বড় করে আরো একগাদা কথা বলল। ওটা ওর স্বভাব। ভীষণ বকবক করতে পারে মেয়েটা। মিনিটে বোধ হয় পঞ্চাশ যাটটা শব্দ বলতে পারে।

আমার খুব গা ঘেঁষে এগিয়ে দাঁড়িয়েছিল বীণা। বলল, 'কত্তোকাল পরে দেখা হল, তাই না! চল না একটু চা খাই।'

বললাম, 'চায়ের দোকান মানেই তো ঘনঘন বেয়ারাদের আর কি খাবেন! তার চে' চল মাঠে কোথাও নির্জন জায়গায় বসি। এক ফাঁকে ভাঁড়ের চা খেয়ে নেব। ভাঁড়ের চায়ে আপত্তি আছে নাকি তোমার ?'

'তা নেই। তবে কোন মাঠে বসবে, ময়দানে ? ভীষণ বাজে জায়গা। তার চে' চল লেকের দিকে এগোই। ঘরেরও কিছুটা এগিয়ে থাকা যাবে।'

মন্দ প্রস্তাব করে নি বীণা। বললাম, 'তাই চল। ট্রামেই যাবে, না বাসে ? বাসেই বরং তাড়াতাড়ি হত।'

'তুমি বড় কিপটে হয়ে গেছ প্রেম। প্লীজ, ট্যাক্সি কর না একটা। কথা বলতে বলতে চলে যাব।'

মরেছে! ট্যাক্সি! তাও আবার এখান থেকে লেক, বেশ কিছু জক খেতে হবে আজ। তবু অনেক দিন পর দেখা বলেই রাজী হয়ে গেলাম। তা ছাড়া বীণাকে একটু নতুন নতুন লাগছিল। সন্ধ্যাটা বেশ জলজ্যান্ত একটা মেয়েব সান্নিধ্যে কাটিয়ে দেওয়া যাবে। বললাম, 'কিন্তু ট্যাক্সি পেলে তো!'

'না পেলে হাঁটব। চল হেটেই এগোতে থাকি।'

আমরা ধর্মতলার দিকে হাঁটলাম, তারপর অভাবনীয়ভাবেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেলাম।

'তোমার কপাল ভাল।' ট্যাক্সিতে উঠে বীণাকে বললাম।

বীণা বলল, 'ভীষণ ভালো। নইলে তোমার সঙ্গে দেখা হয়।'

'কোথায় যাবেন?' ড্রাইভাব ছোকরা গাড়িব হর্ন দিল বার তিনেক, পিছনে তাকাল।

বললাম, 'লেকে চলুন। একটু নির্জন মত জায়গা দেখে আমাদের নামিয়ে দেবেন। বুঝতেই পারছেন।'

ড্রাইভার কি বুঝল কে জানে। তার চোখের সামনে আয়নাটাকে একটু হেলিয়ে দিল। 'আপনারা ভিক্টোরিয়ার কাছেও যেতে পারেন। ওখানে অনেকেই যায়।'

বীণা আমার দিকে তাকাল। চতুব ভাবে হাসল। হাসিতে এমন কিছু বোঝাতে চেষ্টা করল, যা আমরা ছেলেরা হলে স্পষ্ট গলায় বলতাম, মাল ক্যাচেড রে।

'না, আপনি লেকেই চলুন। রেড রোড ধরে চলুন।'

নেতাজীর স্ট্যাচু পার হয়ে ট্যাক্সি সাঁ সাঁ করে এগিয়ে চলল।

বীণা পিছনে হেলান দিয়ে বসতে বসতে বলল, 'তুমি আস না কেন প্রেম? আমাদের আড্ডাটা দিনে দিনে ভেঙে যাচ্ছে।'

মনে মনে বললাম, বাঁচা গেছে। মুখে বললাম, 'এক বুলকির বিয়েতেই শুবলেট। এরপর কবে হয়ত শুনব তোমারও হয়ে গেছে।'

'হবেই তো। তোমাদের জন্য বসে থাকব নাকি!' বীণা চটপট উত্তর করল। 'মাঝখানে আমার এক সম্বন্ধ এসেছিল, সেটা জান না বুঝি? ভারী মজার ঘটনা।'

বীণা এখন এক লম্বা কাহিনী শুরু করবে। ড্রাইভার ছোকরা নিশ্চয়ই কান পেতে আছে এদিকে। তা ছাড়া আয়নাটাকে ঘুরিয়ে রাখার মধ্যেই ওর মতিগতি বোঝা গেছে।

বললাম, 'সব কথা যদি ট্যাক্সিতেই বলে ফেলবে তাহলে কিন্তু ফুরিয়ে যাবে সব। তারপর লেকে গিয়ে গালে হাত দিয়ে ভাবুক হয়ে বসে থাকতে হবে শেষটায়।'

'আহা, শোনই না। শ্রীমান নাকি কোন এক কারখানায় চাকরি করে। করকরে সাড়ে তিন শ' টাকার চাকর।'

'প্লীজ!' হাত জোড় করলাম। বীণার মুখে কাহিনী শোনা এক বিরক্তিকর ব্যাপার। প্রসঙ্গ ঘোরাবার জন্য বললাম, 'বীণা তুমি কিন্তু একটু মুটিয়েছ।'

'ধেৎ।' বীণা ছোট্ট করে একটা চিমটি কাটল হাঁটুতে। 'মুটিয়েছটা কোন দেশী ভাষা। তুমি না, এখনো সেই গেঁইয়াই রয়ে গেলে।'

'না, মানে কেমন যেন একটু—'

'বলো না স্বাস্থ্যবতী হয়েছি।' বীণার ধবধবে দাঁত দেখা গেল।

'মোটা হলেই স্বাস্থ্য হয়েছে বলা চলে না। তবে—'

ভিক্টোরিয়ার কাছ দিয়ে ট্যাক্সি পার হচ্ছিল।

'এই, এই, ওদিকে ঐ গাছের নীচে দেখ।' খুব চাপা গলায় বলল বীণা।

দেখলাম ঝাপসা অন্ধকারে এক যুবক আর এক যুবতীর মন ভোলাবার চেষ্টা করছে। ভারী ইনটারেস্টিং কেস তো।

ড্রাইভার ছোকরা বলল 'এ আর কি দেখছেন, আর একটু ভিতরে যান অনেক মজার মজার দৃশ্য দেখবেন।'

বীণা কৌতুকে আমার দিকে তাকাল। যেন বলতে চাইল, ভীষণ নাক গলাবার টেণ্ডেন্সি তো লোকটার!

আমি ড্রাইভারকে পাত্তা না দেবার ভঙ্গি করে বীণাকে ইশারা করলাম উত্তর না দিতে। বললাম, 'সুরেশ আসে আজকাল?'

'মাঝে মাঝে।'

'বটু?'

'আসে। টিউমারটা অপারেশন করিয়ে নিয়েছে বটু। এখন মুখের কাটিং ওর অন্য রকম হয়ে গেছে। দেখলে ভাবতে হয় বটু তো!'

'তাই নাকি! কারো সঙ্গেই আর দেখা হয় না। অফিস করি আর চিনেবাদাম চিবোতে চিবোতে বাড়ি ফিরি। একদিন পাল্লায় পড়ে রেসের মাঠে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি সুরেশের ছোট ভাই। সাঁ করে রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে কাটিং।'

'সুরেশের ছোট ভাই রেস খেলে নাকি? ভীষণ ভিজে বেড়াল তো।'

'মাঠে একদিন গেলে অনেককেই তুমি চিনতে পারবে। ও এক মজার জায়গা।'

বীণা ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে রইল।

'কিছু লোক আছে, যারা নবদ্বীপ গেলে তিলক কাটে, ঘোড়ার মাঠে এসে জ্যাকপট খেলে, আবার মিছিলে নেমে রাজনীতি করে। যখন যেটা দরকার।'

'তুমিও আবার রাজনীতি-টাজনীতি করছ নাকি আজকাল?

'মরতে। বেশ আছি বাবা।' একটা সিগারেট ধরালাম অনেকক্ষণ পর।

হরিশ মুখার্জী পার হয়ে ভিড়ের রাস্তা জগুবাবুর বাজার। তাও পার হয়ে হাজরার দিকে ট্যাক্সি চলল। বাইরে ফ্লুরেসেন্ট লাইটের আলো, ট্রাফিক কণ্ট্রোলের পুলিশগুলো যেন কার্তিকের মত দাঁড়িয়ে থাকে। একটা হল্লা পুলিস আসছিল বোধ হয়, হকাররা অদ্ভুতভাবে গলির দিকে লুকোচ্ছিল। ফলঅলার গড়িয়ে পড়া একটা আপেল গড়াতে গড়াতে একটা গাড়ির নীচে সেঁধিয়ে গেল। সামনেই লাল আলো বলে গাড়িটা থেমে আছে। আপেলটা চাকার নীচে পড়লে বেশ শব্দ করে ফাটতে পারত। বীণাকে আঙুল তুলে দেখালাম, 'ঐ গাড়ির নীচে একটা আপেল ঢুকে আছে বীণা।'

বীণা ঘাড় ঝুকিয়ে দেখল। 'কোনটা?'

'ঐ যে ফোর ফোর জিরো ফাইভ। দেখছ না।'

ততটুকু সময়ের মধ্যে আবার লাল আলো নীল হয়ে গেল। ট্যাক্সিটা সাঁ করে ওভারটেক করে বেরিয়ে গেল।

বললাম, '(খলে না যখন, ছেড়ে দাও?'

বীণা আবার হেলিয়ে পিছন দিকে গড়িয়ে বসল। বেশ উৎসব উৎসব লাগছে বাইরেটা, না? যাই বলো তোমাদের বেহালার ওদিকটা আজকাল বড়বাজারের মত হয়ে গেছে। ভিড়, ঠেলাঅলা, সরু সরু রাস্তা, কি নেই?'

'সে তোমাদের এদিকে যাদবপুরেও আছে। তবে, বেশী আর কম।'

ড্রাইভার ছোকরা আবার কথা বলল। 'যা বলেছেন। ভিড় সব রাস্তাতেই, গাড়ি বেড়েছে কত।'

বীণা আবার কৌতুকে আমার দিকে তাকাল। চাপা ভাবে হাসল এবার।

বললাম, 'তা যা বলেছেন!' বলার মধ্যে একটু বিরক্তি মেশাবার চেষ্টা করলাম।

লোকটা পিছনে ঘাড় ঘুরিয়ে বীণার দিকে এক পলক তাকাল। শালা।

রাসবিহারীর মোড় পার হচ্ছিল। লোকটা বলল, 'কুড়ি মাইলের বেশী স্পীড চাপালেই গড়বড় হওয়ার ভয় থাকে।'

'এখন কত মাইল চলছে?'

'কত আর, দশ পনের। ফাঁকা রাস্তা পেলে কুড়ি পঁচিশ।'

সাদার্ন এভিন্যুর ছিমছাম রাস্তা পড়ল এবার। সামনেই লেক স্টেডিয়াম। বাঁ ফুটের সম্পন্ন বাড়িগুলোয় রহস্যময় আলো জ্বলছে। বাতাসে ঠাণ্ডা একটা আমেজ। বেশ ঝরঝরে লাগছিল।

লোকটা বোধ হয় কেরামতি দেখাতে হঠাৎ তিন চার গুন স্পীড বাড়িয়ে দিয়েছে এবার। ঝড়ের বেগে ছুটিয়ে দিয়েছে। বীণা কৌতুকে আবার আমার দিকে তাকাল।

'রোককে, রোককে। হ্যা, বাঁ পাশে রাখুন। চ এখানেই নেমে পড়ি!'

বীণা বলল, 'নামলেই হল।'

ট্যাক্সি থামতে যেন হাফ ছেড়ে বাঁচা গেল। লোকটা কিন্তু মহা ধড়িবাজ। যেন ইয়ার পেয়েছিল আমাদের। নেমে পয়সা চুকিয়ে দিয়ে এগোতে যাচ্ছি, ড্রাইভার ঝুঁকে তাকাল. 'বকশিস করবেন না কিছু।'

'কেন? কিসের বকশিস?' কৌতুকে বীণার দিকে তাকালাম।

'না, মানে এখানে এলে অনেকে দেয় কিনা। তাই।'

'ও, সে জন্য বলছেন। তা ঠিকানাটা দিয়ে যান, বিয়ের দিন নেমন্তন্ন করব?'

ছোকরা অদ্ভুত চোখে হাসল।

বীণা বলল, 'কী অসভ্য, ভাগ।'

ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে আমরা এরপর গায়ে গায়ে মিশে লেকের জলের দিকে এগোতে লাগলাম।

আবছা অন্ধকার। বড় বড় গাছ ঝোপ। বিক্ষিপ্ত কিছু বায়ুসেবী। নরম ঘাসের ওপর দিয়ে আমরা হাঁটতে লাগলাম। বেশ ঠাণ্ডা একটু বাতাস লাগছিল চোখে মুখে। গাড়ি ঘোড়ার ধুলো নেই। আর যাই হোক এই রকম শান্ত বিশুদ্ধ জায়গায় বসে থাকলেও মন ভাল হয়।

বীণা বলল, 'তুমি অমন করে লোকটাকে বললে কেন! ও কি ভাবল!

'কচু ভাবল। আর যাই ভেবে থাকুক আমরা যে একসঙ্গে লেকের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছি না তা ও জেনে গেছে। ওরা এরকম বহু লোককেই এখানে বা ভিক্টোরিয়ায় পৌঁছে দেয়।'

বীণা কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু এমন সময় একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক পাশ দিয়ে লাঠি ঘোরাবার কায়দায় চলে গেলেন। খানিক দূর এগিয়ে লোকটা একটা গাছের গুঁড়িতে মূত্রত্যাগ করতে বসে গেলেন। আচ্ছা ফোর টোয়েন্টি লোক রে বাবা!

আমরা এগিয়ে একটু অন্ধকারমত জায়গা বেছে পেলাম। একটা ছোট্ট কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে বেশ পরিষ্কারমত মনে হল। পাশেই অবশ্য বাঁশঝাড়মত জঙ্গল। তা ছাড়া এদিকে লোকজন বড় কম। 'এখানেই বসি কি বল?' লেকের জল বেশ ঘন কালো দেখাচ্ছে। ওপারে একটা রোয়িং ক্লাব। ক্লাবের আলো জলের উপর পড়েছে, কাঁপছে। খুব সেফ জায়গা বলে মনে হল আমার।

'এই এই, কি লেখা আছে, দেখে যাও।' বীণা ডাকল।

গাছের গায়ে এক টুকরো সাদা কাগজে কি যেন লেখা। দেশলাই জ্বেলে লেখাটা পড়বার চেষ্টা করলাম।

'এই মরেছে! ভারী মজার ব্যাপার তো!' লেখা আছে, "এই গাছতলায় কেহ বসিবেন না। ইহা রিজার্ভ করা আছে, বসিলে দু টাকা ভাড়া দিতে হইবে।"

বীণার দিকে তাকালাম। বীণা বলল, 'কেউ ফিচকেমি করেছে। বসো দেখি। এখানটাই সব চেয়ে ভাল জায়গা।'

'তা অবশ্য ভাল জায়গা কিন্তু যারা নোটিশ টানিয়ে গেছে তারা হয়ত আশে-পাশেই আছে কোথাও। গ্যাঁক করে এসে চেপে ধরবে।'

'তোমার মুণ্ডু। এটা কারো কেনা জায়গা নয়।'

'মস্তানদের তো আর চেনো না। ড্যাগার তুলে সামনে এসে যখন দাঁড়াবে, কই, ভাড়াটা নিয়ে আসুন দেখি ব্রাদার। নইলে দেখছেন।'

'রাম ভীতু তুমি।' বীণা বসতে যাচ্ছিল, দাঁড়াল। 'কোথায় বসবে তা হলে?'

'চল না, একটু এগিয়ে দেখি। কি দরকার এসব ঝামেলায় থেকে।'

জলের ধার দিয়ে আমরা হাটলাম। ধীরে ধীরে। কোথাও ছায়া, কোথাও ঘোর অন্ধকারমত। তারই ফাঁকে জোড়ায় জোড়ায় সব বসে আছে। যেন প্রেমের কুঞ্জবন। কারো কারো দুটো একটা ভাঙা কথা কানে আসছিল, কেউ হাল্কা নীচু গলায় গলা ভাঁজছিল। বেশ জমে গিয়েছিল কেউ কেউ।

অল্প দূরে কিছু উঠতি ছোকরা হঠাৎ চেঁচিয়ে সিনেমার গান ধরে বসল। বীণা ঐ দিকেই এগোচ্ছিল, বললাম, 'ওদিকে না এদিকে এসো।' এ সব ছেলেদের সব সময় দৃষ্টির বাইরেই রাখা ভাল। আর একটু ঢালের দিকে নেমে এসে বীণাকে বললাম 'এখানে বসবে?'

বীণা বলল, 'বসো।' বসে পড়ল। খানিকটা দূরে এক মারোয়াড়ী পরিবার ছোটখাট একটা সংসার পেতে বসেছে। টিফিন ক্যারিয়ার, ফ্লাস্ক, তোয়ালে, কত কি সরঞ্জাম। বেশ সুখে আছে লোকগুলি।

বীণার পাশে রুমাল বিছিয়ে বসলাম।

বীণা বলল, 'ঘড়ির দিকে লক্ষ্য রেখো কিন্তু, ঠিক আটটায় উঠে পড়ব।'

'মাথা খারাপ! আমি আজ উঠছিই না। কত্তোকাল পরে লেকে এলাম। তাও আবার জলজ্যান্ত একজন প্রেমিকাকে সঙ্গে নিয়ে।'

'ইস রে। দেখো, আবার অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে যেও না যেন। আমি কিন্তু অ্যামবুলেন্স ডাকতে পারব না তা আগেই বলে রাখছি।'

'অ্যামবুলেন্স ডাকতে হবে না। দয়া করে একটু ধাক্কা দিয়ে লেকের জলে ফেলে দিও তা হলেই হবে।' হাসলাম।

অন্ধকারটা এখানে তেমন কিছু ঘন নয়। বীণার চকচকে চোখ দেখা যাচ্ছিল। খুব ঢিলে ঢালা ভঙ্গি নিয়ে বসেছে। কোলের ওপর বটুয়া। খুব আয়েসী হয়ে, একটু কাত হয়ে, যেন আজকেই কেবল নতুন নয়। এমন সহজ ভঙ্গিতে ও কথা বলছিল যেন কতকাল ধরে ও প্রেম করে যাচ্ছে। কেমন যেন

খানিকটা ঘরনী ঘরনী চেহারা দেখাচ্ছিল বীণার। বীণা একটু জুতমত উত্তর খুঁজছিল মনে মনে। সহসা এক চিনেবাদামঅলার প্রবেশ।

'বাদাম দেব দাদাবাবু?'

বড় বিরক্ত করে। বললাম, 'না।'

বীণা সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'পঞ্চাশ কত? গরম তো?'

বাদামঅলা পঞ্চাশ গ্রাম বাদাম দিল। ঝালনুন দিল। তারপর পয়সা বুঝে নিয়ে চলে গেল।

'চা এলে চা খাওয়া যেত।' চিনেবাদামের খোসা ছাডাতে ছাড়াতে বীণা বলল।

'খানিকক্ষণ বসে থাক, ঠিক আসবে।'

অনেকক্ষণ ধরেই অদৃশ্য কোন পোকা-মাকড়ের মিহি অথচ চিকন শব্দ হচ্ছিল। গা শিরশির করে ওঠে শুনলে। হয়ত বাঁশঝাড়েব ভিতর থেকেই শব্দটা বেরচ্ছিল। শব্দটার দিকে কান পেতে পোকাটার প্রকৃতি ধরবার চেষ্টা করলাম। বিষধর কিছুও হতে পারে। এ বাঁশঝাড় লেকের ধারে বলেই ভয় নেই, কিন্তু অন্য কোন শ্মশান টশানের কাছে হলে আর দেখতে হত না। বীণাকে এ সময় একটু ভয় দেখালে কেমন হয়, 'তুমি ভূত বিশ্বাস করো বীণা?'

বীণা কৌতুকে তাকাল। তারপর দু দাঁতে চেপে একটা বাদাম ফাটাল, 'মানে?'

'না, মানে সামনে বাঁশঝাড কিনা, তাই জিজ্ঞেস করলাম।'

'প্রেমালাপ বুঝি ভূত দিয়ে শুরু কবতে হয়। তুমি না আস্ত একটা গেঁইয়া। কোথায় বলবে, আহা কি সুন্দর ঝিরঝিরে বাতাস, জলটা যেন অমৃতেব মত টলটল কবছে। কোথায় চাঁদের বর্ণনা ফুলের বর্ণনা, তা না ফ্যাতা।

'সরি। আর বলব না।'

মনে পড়ে গেল বটু বলত, মেয়েদের যদি মন পেতে চাস কেবল ওদেব প্রশংসা করবি। পেত্নীকে বলবি পরী। বীণার প্রশংসার দিকগুলো হাতড়াতে লাগলাম। কিন্তু এমন সময় নতুন আব এক উপদ্রব।

'অন্ধকে পাঁচটা পয়সা দেবেন বাবু?' দেখি পিছনে এক প্রকৃতই অন্ধ। বাচ্চা একটি ছেলের হাত ধরে দাঁড়িয়ে, হাত বাড়িয়ে রেখেছে। নাও, ঠেলা সামলাও এবার।

'না, না, পয়সা নেই, ওদিকে যাও।'

শুনল না। কানের কাছে পাঁচ পয়সা কথাটা আবৃত্তি করতে লাগল।

'আরে, মহা জ্বালায় দেখছি। যাও না, পয়সা নেই।'

কোন কোন সময় ভিখিরি দেখলে ভীষণ রাগ হয়। এ সময়ও দাঁতে দাঁত চেপে আমি বিরক্তি প্রকাশ করলাম।

বীণা বলল, 'আহা বেচারা অন্ধ।' যেন 'অন্ধজনে দেহ আলো' আবৃত্তি করল করুণ সুরে। তারপর নিজের ব্যাগ খুলে পয়সা দিয়ে বিদেয় করল।

অন্ধজন চলে যেতে আবার বলল, 'নিরিবিলিতে যে একটু প্রেম করব তারও উপায় নেই। তারপর জিভ বাজিয়ে চুক চুক করে একটা সহানুভূতির শব্দ করল।

'উপায় নেই ঠিক বলব না। তবে এমন একটা জায়গা আছে যেখানে গিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসলেও কেউ দেখতে আসবে না। খুব চমৎকার জায়গা।'

'কোথায় বল না?' বীণা আবদার করার মত প্রশ্ন করল।

'অবশ্য এখনো আমাদের সেখানে যাওয়ার মত স্টেজ আসেনি। আর সে জায়গার নাম বললেই তুমি মারতে আসবে।'

'আহা বলই না, ঢং।' বীণা অদ্ভুত মিষ্টি একটা ভঙ্গি করল। বটু থাকলে এ সময়ে চুপি চুপি বলত, নেকু দি গ্রেট।

বললাম, 'কবরখানায়।'

'মানে?' গম্ভীর দেখাল বীণাকে।

'মানে বুঝলে না। যাদের প্রেমের জ্বালা খুব তীব্র, অর্থাৎ "তীব্র দহন জ্বালো" যাদের তারা বিকেল বেলা একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে, পার্ক সার্কাস চলিয়ে জী। সার্কুলার রোডের খৃষ্টানদের কবরখানার সামনে এসে নামে। আট আনা দিয়ে একগোছা রজনীগন্ধা কেনে, তারপর হেলে দুলে গেট পেরিয়ে ভিতরে যায়। দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে, মাইকেল সাহেব যেখানে শুয়ে আছেন সেখানে এসে ফুলগুলো শুইয়ে রাখে। তারপর হঠাৎই যিনি প্রেমিক তিনি একটা ফুলের কলি ছিঁড়ে নিয়ে প্রেমিকার খোঁপায় পরিয়ে দেন। তখন প্রেমিকা বলে, চল না কোথাও বসি। ওরা অন্ধকারে কোন কবরের পাশে বসে প্রেম নিবেদন করতে শুরু করে।'

'মাই গড! তুমি কবিতা লিখলে খুব নাম করতে পারতে।' বীণা ছোট্ট করে বলল।

'তা পারতাম। তবে কবি হলে দাড়ি রাখতে হয়। আর দাড়ি রাখলেই আমার সন্ন্যাসী হতে ইচ্ছে হয়। ফলে ও লাইনে আমি নেই বাবা।'

'তা ঠিক, লাইন তোমার একটাই।' বীণা মিষ্টি করে বলল, 'বিয়ের লাইন। একটা কলাবউ দেখে এবার বিয়ে করে ফেল না, খুব পেট ঠুসে নেমন্তন্ন খাই।'

'তা তো খাবেই, কিন্তু লেডিজ ফার্স্ট যে। আগে তোমার হয়ে যাওয়া দরকার। বুলকির হয়ে গেছে, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি এবার তোমার হোক।'

'ওরে আমার কে রে।' বীণা আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু—

'এই যে বড়দা, হেঁ হেঁ।'

চমকে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি দুজন যুবক। হাতে খাতার মত কি যেন একটা বস্তু। ঠোঁটে কলম ঠুকতে ঠুকতে একজন আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে।

'বলুন।'

'রিলিফ ফাণ্ডের চাঁদাটা—'

বুক শুকিয়ে গেল। 'কোন্ রিলিফ ফাণ্ড?'

'দাদা যে একেবারে গাছ থেকে পড়লেন। বিহারে দুর্ভিক্ষ চলছে জানেন না? পাঁচটা টাকা ছাড়ুন দেখি, কেটে পড়ি।'

বীণা বলল, 'চাঁদা তো একবার দিয়েছি আমরা।'

'আবার দেবেন। সবাই দিচ্ছে। বিহারী ভাইরা না খেয়ে মরছে আর আপনারা সাহায্য করবেন না তাও হয়!'

'আমরা তো ভাই টাকা নিয়ে বেরই নি।' খুব বিনয়ের সঙ্গে বললাম।

'কেন ঝামেলা বাড়াচ্ছেন দাদা, বুঝি না। দিয়ে দিন চলে যাই।'

গলার স্বরে খানিকটা শাসানি ছিল। বীণা বলল, 'একটা টাকা দিয়ে দাও।'

শেষ পর্যন্ত দু' টাকাতে রফা করতে হল। দুটো টাকা ফালতু গচ্চা খেয়ে মেজাজ কারো ঠিক থাকে না, বললাম, 'খুব হয়েছে। আর আমার প্রেমের দরকার নেই, এবার উঠে পড় দেখি। এবার আবার বাপ মরেছে, সৎকার করতে পাচ্ছে না বলে কেউ হাজির হলেই হল।'

বীণা বলল, 'এই তো সবে সাড়ে সাত। আর কেউ আসবে না, তুমি বসো।'

'এ সব জায়গায় সন্ধ্যের পর বসা যায় না। রটন! যা সব রহস্যময় লোক ঘুরছে চারপাশে।'

'হাজার হাজার লোক বসে আছে, তোমারই কেবল ভয়। চাঁদা না দিলেই পারতে।' বীণা বিরক্তি প্রকাশ করে তাকাল।

'না দিলেই পারতাম,' বেশ বললে। লোক দুটোকে দেখনি, একজনের আবার ভ্রুর ওপর কেঁচোর মত পাকান একটা দাগ। ওরা যে চাঁদা চেয়েছে এই বেশী। আর কিছু চাইলেই হয়েছিল আর কি।'

'বিহারে দুর্ভিক্ষের জন্য না-হয় দুটো টাকা দিলেই, এমন কিছু ক্ষতি হবে না।'

একটা অশ্লীল কথা মুখে আসছিল। ঢোক গিলে চেপে গিয়ে বললাম, 'যদি বলতো, সঙ্গে কি মালকড়ি আছে ছাড়ুন দেখি দিদি। মাঝখান থেকে আমার হাতের ঘড়িটা আর তোমার কানের দুল দুটো সাফাই করে নিয়ে চলে যেত। প্রেম বেরিয়ে যেত তখন।'

'আমার দুল দু'টো গেলে ক্ষতি নেই। নকল সোনা।'

'কিন্তু আমার ঘড়িটা তো নকল নয়। ওটা গেলে আমি পথে বসব!'

'যদি যায়, চটপট একটা বিয়ে করে নতুন ঘড়ি আর একটা যোগাড় করে নিও।' খুব হেঁয়ালি মিশিয়ে বলল বীণা।

এরপর আর কথা চলে না। খানিকক্ষণ নীরব থেকে আবার একটা সিগারেট ধরালাম। বাঁশঝাড়ের সেই চিকন শব্দটা বোধ থেমেছিল একটু, আবার শুরু হল। শব্দটার দিকে কান পেতে থাকলাম।

'এই, এই দেখছ!' বীণা বাঁশঝাড়ের নীচে একেবারে জলের গায় গায় ঢালুতে আঙুল তুলে দেখাল। 'আর জায়গা পেলনা ওরা!'

কেন বেশ তো বসেছে। অনেক কষ্টে ওরা ও জায়গাটা বেছেছে। চাঁদাঅলারা অতদূর গিয়ে বিরক্ত করবে না ওদের।'

'কিন্তু সাপে কামড়ে দিতে কতক্ষণ। বাব্‌বা সাহস আছে!'

অন্ধকারে যুগল প্রেমিকদের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। 'কাঁদছে নাকি রে বাবা। ফোঁস ফোঁস করে নাক টানার শব্দ আসছে, শুনেছ?'

'তোমার মুণ্ডু। মেয়েটা দেখছ না কেমন সোহাগী হয়ে কোলে মাথা রেখে শুয়েছে। পুলিসের চোখে পড়লে হয় একবার!'

দ্রৌপদী

আমরা পাঁচ বন্ধু পুরী বেড়াতে এসে একটি মেয়ের চক্করে ফেঁসে গেলুম। মেয়েটির বয়স অনুমান করলাম পাঁচজন পাঁচ রকম। হিরু বলল, লাকি টোয়েন্টি; বাদল আটাশের কম নামাল না; সোনা একটু বুনো স্বভাবের, তুড়ি মেরে বলল, আমার বয়সের চেয়ে চার কম অর্থাৎ চব্বিশ; লিণ্টু বলল, বয়সে কিবা আসে যায় সখা, ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে আজকাল প্রেম করার মাপ কাঠি হিসাবে বয়সের ব্যারিয়ার থাকে না। আমি বললাম, অল রাইট, যে যা ভেবেছ তার একটা গড় কষে নিয়ে নেমে পড়।

মেয়েটির মুখশ্রীতে এমন এক লাবণ্য ছিল যা যে কোন লম্পটকেও প্রেমিক করে তোলে। সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী, প্রথম দর্শনেই খানিকটা বিচলিত করে দেয়। অন্তত আমাদের যে দিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। আমরা সমুদ্রে স্নান করতে এসে সমুদ্র ছাড়াও বড় আকর্ষণ হিসেবে এই মেয়েটিকেই বেছে নিয়েছিলাম। যদিও আমরা আমাদের স্বপ্নের প্রেমিকার সঙ্গে এই মেয়েটির পুরোপুরি মিল খুঁজে পাচ্ছিলাম' কিনা সন্দেহ তবুও উত্তেজনাকর কিছু কিছু চাপল্য নিয়েই আমরা মেয়েটির কাছে এগিয়ে এলাম।

ওর সাদা সালোয়ার পাঞ্জাবি কি যেন এক যাদুমন্ত্রে সমুদ্রের ঢেউয়ের মত শিহরিত হচ্ছিল। বাদল এক সময় উদাসভাবে বলল, আর জন্মে হে ঈশ্বর, আমার যেন নুলিয়ার ঘরে জন্ম হয়। সোনা বলল, এ জন্মটা আগে সামলা, পরের জন্মের কথা পরে। এই দ্যাখ আমি ঢেউয়ের ঝুঁটি ধরে ঘোড়ায় চড়ার মত এগিয়ে যাচ্ছি। বলতে বলতে সে প্রকাণ্ড একটা শংখের মত ঢেউয়ের নিচে তলিয়ে গেল। খানিকক্ষণ পর যখন সে জলের উপর ভেসে উঠে হাওয়ায় তার সদর্প চুল আছড়াল তখন সেই মেয়েটির ঠোঁটে চাপা একটা হাসি ছড়িয়ে গেছে।

লিণ্টু বলল, হেসেছে রে, হেসেছে!

বাদল চেঁচিয়ে উঠল, চালিয়ে যা সোনা, চালিয়ে যা। বলতে বলতে বাদলও একটা ভাঙা ঢেউয়ের মধ্যে নিজেকে সেঁধিয়ে দিল।

সোনা সাঁতার জানে। লিণ্টু বা বাদলও দম তৈরি করতে পারলে ঢেউয়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। ঢেউ নিয়ে ওদেরই ছেলেমানুষি শোভা পায়। হিরু আমার কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, শুধাল, হাসল কেন রে?

লিণ্টু এগিয়ে এসে বলল, মেয়েদের হাসির হাজার রকম মানে হয়। কিন্তু কেমন চোখ ভাসিয়ে বসে আছে ছাখ।

দেখলাম, ভেজা সালোয়ার পাঞ্জাবি গায়ের প্রতিটি ভাঁজই যেন প্রখর করে দেখাচ্ছে। চুলের ঢল পিঠের দিকে গড়িয়ে আছে, সাপের তুলনা মনে আসে। চোখের মণিতে কোন শিল্পী যেন রঙে ডোবান তুলি বুলিয়ে নিয়েছে। ঠিক এমনটিই যেন আমরা চেয়েছিলাম।

দেখলাম, মেয়েটি আবার ঢেউ ভাঙবার জন্য নুলিয়ার হাত ধরে এগোচ্ছে। লিণ্টু বলল, এইবার নেমে আয় হিরু। তোর পাঁচ টাকা দামের কস্টিউমখানা সার্থক কর।

হিরু বালির ঢালে একটা জলজ জীবের মত শুয়ে পড়ল। হাতের মুঠোয় বালির মণ্ড। মণ্ডটি তাক করে আমার দিকে ছুঁড়ে দিল। আমি অহেতুক নিজেকে আর একটু সমুদ্রের দিকে ছুঁড়ে দিলাম। দিয়েই বুঝতে পারলাম সফেন সমুদ্র আমার কোমর অবদি উঠে অত্যন্ত দ্রুতভাবে পায়ের নিচ থেকে বালি সরিয়ে নিচ্ছে। এ সময় এক বিচিত্র অনুভূতি জাগে। আমি তেমন একটা সাঁতারু নই। ফলে হুমড়ি খেয়ে দু' হাতের মঠোয় বালি আঁকড়ে স্থির হয়ে থাকবার চেষ্টা করলাম। আর ঠিক এই সময়ই আর একটা ঢেউ এসে আমাকে আবার আছড়ে ফেলে হিরুর কাছাকাছি নিয়ে এল।

হিরু বলল, বোস, সিভালরি দেখাবার অনেক স্কোপ পাবি। লিণ্টু বা সোনার যা পোষায় আমাদের তা পোষাবে না। বাদলটাকে দেখ না তিমি মাছের মত কতখানি এগিয়ে গেছে মাইরি।

আমি গা এলিয়ে পিঠের উপর রোদ ধরে রাখবার চেষ্টা করলাম। সমুদ্রের উপর দিয়ে উদ্ভ্রান্ত বাতাসের দাপট বইছে। হোটেলগুলোর দিকে শাড়ি উড়িয়ে ভাসতে ভাসতে কারা যেন এগোচ্ছে। নুলিয়াদের কাঠের ডিঙি এদিক-ওদিক ছড়ান। ওপাশে স্ত্রীকে ঢেউয়ের দিকে দাঁড় করিয়ে রেখে কে যেন ক্যামেরা নিয়ে ব্যস্ত। ঝিনুক কুড়াতে কুড়াতে এক দঙ্গল ছেলে ছোকরা কলকল করে চলে গেল। এদিকে বালির বিছানায় অজস্র স্নানার্থী। ভাঙা

ঢেউয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কেউ কেউ, আবার ছেলেমানুষি বুড়ি-ছোঁয়া খেলার মত কেউ ছুঁয়ে ছুটতে ছুটতে পালিয়ে আসছে।

দেখলাম, মেয়েটিকে অভয় দিচ্ছে নুলিয়া। ঢেউ ভাঙা শেখাচ্ছে। কি ভাবে ঢেউয়ের মধ্যে নিজেকে সেঁধিয়ে দিতে হয়, কিভাবে স্ফীত জল-তরঙ্গে নিজেকে ভাসিয়ে দোল খেতে হয়, শেখাচ্ছে। অথচ বার বার মেয়েটা নুলিয়ার হাতের মুঠোর মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে। নুলিয়ার কি কপাল মাইরি।

দেখলাম, অনেকক্ষণ এই ভাবে দোল খেয়ে ক্লান্ত হয়ে এক সময় ও টলতে টলতে তীরে এসে বসল। নুলিয়াকে হাসিমুখে পয়সা দিয়ে বিদায় করে দিল। তারপর হালকা তোয়ালেটা বুকের উপর বিছিয়ে দিতে দিতে এক পলক তাকিয়েই চোখ ঘুরিয়ে নিল।

হিরু আমাকে জড়িয়ে ধরল, তাকিয়েছে, তাকিয়েছে। মরে যাব।

আমি খানিকটা শাসনের ভঙ্গিতে বলে উঠলাম, এই, হচ্ছে কি হিরু, শুনতে পাচ্ছে যে!

পেলেই বা। হিরু সহসা মেয়েটির কাছাকাছি এগিয়ে গেল। ফুলের উপর ভাসমান ভ্রমরের মত খানিকক্ষণ এপাশে-ওপাশে দুলল। তারপর খানিকটা তফাতে বসে ছেলেমানুষি কায়দায় বালি ছুঁড়তে লাগল।

অনেকক্ষণ পর 'লিণ্টু আর বাদলকেও দেখা গেল। ঢেউয়ের দ্বিতীয় ভাঁজ পার হয়ে গিয়েছিল ওরা। সোনাকে কখনো কখনো দেখাই যাচ্ছিল না। নুলিয়াদের ভেলার মত দূরে অনেক দূরে ও হারিয়ে যাচ্ছিল। অতদূরে নুলিয়ারাও যেতে সাহস পায় কিনা সন্দেহ।

এইভাবে অনেকখানি সময় কেটে গেল। তারপর কখন যেন সেই মেয়েটির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার মধুর মহেন্দ্রক্ষণও এসে গেল। দেখলাম, কেমন এক বিষণ্নতা মেয়েটির চোখে মুখে হঠাৎ যেন ছড়িয়ে গেল। খানিকটা বিচলিত ভাবে ও চারপাশে কি যেন খুঁজে দেখছিল। হয়ত অভিনয় করছে মেয়েটি। তবু অভিনয়েরই সুযোগ নেওয়ার ইচ্ছে হল, এগিয়ে এলাম। অবশ্য এসব মেয়েদের বিশ্বাস নেই। গায়ে পড়ে কিছু বলতে সাহস হচ্ছিল না আমার।

হিরুটা সাহানশা। অদ্ভুতভাবে মেয়েটার পাশে এসে দাঁড়াল, যেন 'কতকালের পরিচয় ওদের।

দেখুন তো কি মুশকিল! মেয়েটিই প্রথম গ্রীবা ফুলিয়ে হিরুকে যেন বলল, হাতে আংটি ছিল, কোথায় যেন পড়ে গেল।

হিরু বিস্ময় প্রকাশ করল, আংটি! সে কি, আংটি পরে এসেছিলেন? এই শুনছিস—, আমার দিকে তাকাল হিরু, আংটি লস্ট।

আমিও সহানুভূতি জানালাম, ইস আংটি পরে কেউ নামে নাকি! স্নান করার সময় প্রায়ই ওরকম চুড়ি আংটি হাত থেকে খুলে যায়।

কি করি বলুন তো! মেয়েটি অসহায়ভাবে আমাদের দিকে তাকাল।

লিণ্টু মুহূর্তেই চোঁ করে আমাদের কাছাকাছি উঠে এল। ওর গা দিয়ে জল ঝরছিল, কি রে হিরু, কি কেস! কি হল?

হিরু বলল, অত বাচ্চা হুলিয়া নিয়ে না নামলেই ভাল করতেন। একেবারে আনাড়িদের সব কিছু ওরা সামলাতে পারে না।

মেয়েটি বিষণ্ণ চোখে সমুদ্রের দিকে তাকাল।

বললে আমরাই আপনাকে ধরে চান করিয়ে নিতে পারতাম, দুম করে বলে বসল লিণ্টু। মহা ধড়িবাজ ছেলে লিণ্টু। সাহসও কম না।

বললাম, যাক গে, এখন কি করবি! খুঁজে দেখবি!

খুঁজলেই বুঝি পাওয়া যাবে। যেমন বুদ্ধি তোর! তার চে' বরং আয় সমুদ্রটাকে কষে খুব গালাগালি করি।

লিণ্টু বলল, আপনার খুব মন খারাপ হয়ে গেল এখানে বেড়াতে এসে। কবে এসেছেন আপনারা?

মেয়েটি বলল, কাল। মা আমাকে বারণ করেছিল একা আসতে। এখন ফিরে গিয়ে খুব বকুনি খেতে হবে।

বোঝা গেল না মা ছাড়া সঙ্গে আর কেউ এসেছে কিনা। নিশ্চয়ই আসে নি। আসলে একা একা এই সমুদ্রে কেউ স্নান করতে আসে। হিরু সন্দিগ্ধ-ভাবে তাকাল, কোথায় উঠেছেন, হোটেলে?

বাদলও এসে ভিড়ে গেল। বাকি এখন সোনা। সোনার নিশ্চয়ই এখনও আমাদের দিকে নজর পড়ে নি। এলেই আমরা পঞ্চপাণ্ডব একটা আংটি-হারানো-মেয়েকে ঘিরে উদাসভাবে বসে শোক প্রকাশ করতে পারতাম।

এসেছি এখানেই, একটু ভিতর দিকে একটা ঘর ভাড়া করে।

কোন বাড়ি বলুন তো? লিণ্টু প্রশ্ন করল। বাদল কোমরে হাত দিয়ে নিজের লম্বা ছায়াটা মেয়েটার গায়ের উপর দিয়ে পার করিয়ে দিল একবার। লিণ্টুর মেদবহুল ঘাড়ে গর্দানে মিহি দানার বালি জমে আছে। রোদের আলোয় কেমন চিকমিক করছে। হিরু নিজের গালের উপর ঘন ঘন হাত রাখছিল, সকালে সেভ না করে ভুল করেছে কিনা, গালের উপর হাত বুলিয়ে তা অনুমান করবার চেষ্টা করছিল। খানিক বাদে সোনাও এসে পড়ল। সোনার চোখে ধূর্ত একটা আভা। টকটকে লাল চোখের চারপাশে যেন রক্ত জমে গেছে।

মেয়েটা আঙুল তুলে দেখাল, ওই দিকে। ওই যে হলুদ রঙের বাড়িটা দেখছেন ওই বাড়ির দোতলায়। ওখানে আমি সারাদিন জানালার ধারে বসে সমুদ্র দেখি।

হিরু চোখ টিপল লিণ্টুর দিকে। লিণ্টু প্রতিদান দিতে পারল না, মেয়েটা ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। সোনা বালিতে বসে নাঙ্গা সাধুর মত গায়ে বালি মাখতে শুরু করল। খানিক দূরে গ্রাম্য বধূর মত কায়দায় একজন সদ্যস্নাত মহিলা গামছা দিয়ে চুল ঝাড়ছিল। এদৃশ্য দেখলেই 'চুল ঝাড়ে আর ফুল পাড়ে' মনে পড়ে যায়। একজন আয়েসী মেদ-বহুল ভদ্রলোক একজোড়া নুলিয়া নিয়ে জলে নেমেছে। একজোড়া নুলিয়ার উপরও ভরসা নেই। এমন ভীতভাবে হাত পা ছুড়ছে যেন ওকে বধ্য ভূমির দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

বাদল বলল, আপনি তো চান করতে না করতেই উঠে পড়লেন। তারপর আংটি হারিয়ে মন খারাপ করে বসে রইলেন।

মেয়েটি বিষণ্ণ হাসল। চোখ না তুলেই মসৃণ বালির উপর কি সব আঁকিবুকি করল।

সোনা শুধাল আবার চান করবেন? আসুন না, আমরা আছি।

মেয়েটির চোখ ধনুকের মত বাঁকা হল। তারপর মিষ্টি একটু হাসি ছড়িয়ে বলল, না, অনেকক্ষণ এসেছি আজ। কাল না হয় নুলিয়ার বদলে আপনাদের সঙ্গেই নামব।

বাদল বলল, কাল আবার আংটি পরে আসবেন না যেন!

লিণ্টু বলল, নেড়া বারবার বেলতলা যায় না রে বাদলা। বলে হেসে উঠল।

মেয়েটি বলল, আমি কিন্তু নেড়া নই। ছোট ছোট ঝিনুকের মত দাঁতগুলো দেখা গেল ওর। বড় সুন্দর করে হাসতে পারে। এবং সেই হাসির সঙ্গে সঙ্গে আমরা বুঝতে পারলাম মেয়েটা আমাদের পারমিট দিচ্ছে সহজ হবার। আমরা খুব নিশ্চিন্ত হয়ে উঠতে লাগলাম। ঠিক এমনটিই হোক আমরা যেন চেয়েছিলাম।

এক সময় মেয়েটি বলল, চলি আজ।

এখনই উঠবেন ? সোনা চোখ পিট পিট করে প্রশ্ন করল।

মেয়েটি বলল, হু, চলি। এর পর দেখব মা আমাকে খুঁজতে বেরিয়েছেন।

মেয়েটা উঠে দাঁড়াল। মাগো, কি পাগলের মত বাতাস।

বাতাসে সালোয়ার পাঞ্জাবি সামলাতে সামলাতে সে বালির চরায় পা ফেলে চলে গেল।

আমরা পাঁচ বন্ধু পুরী বেড়াতে এসে এই মেয়েটিকে নিয়ে জমে গেলাম। পাঁচজন পাঁচ রকম নাম রাখলাম ওর। সোনা বলল, বুলবুলি। হিরু বলল, সী-গার্ল। বাদল একটু দোহারা দীর্ঘনামের পক্ষপাতী, বলল, শ্যামলবরণী। রাবিশ, যেমন টেস্ট তোর, লিণ্টু বলল, বরণী ফবণী চলে না আজকাল। মেয়েরা শুনলে ফায়ার হয়ে যায়। আমি বরং ওর নাম রাখছি মরিচীকা। হায় মরিচীকা।

আমি বললাম, তোরা কেউই ওর আসল নামটা বলতে পারলি না, ওর আসল নাম হচ্ছে লতা। ও নামটাই ও তখন বালি উপর আঙুল বুলিয়ে বুলিয়ে লিখছিল, কেউ তোরা লক্ষ করিস নি।

মাইরি। লিণ্টু আমার পিঠে একটা থাবড়া মারল। শালা তুমি ডুবে ডুবে জল খাও, শিবের বাবাও জানতে পারে না। মেয়েটা কি আঁকিবুকি করছিল তাও তুমি লক্ষ করেছ।

বললাম, করতে হয়। ও সময় ওর আঁকিবুকি করার মানেই তো যে সব কথা ও বলতে পারছে না তা লিখে আকারে ইঙ্গিতে জানাতে চায়।

সোনা বলল, বলছিস। আয়, তা হলে আমরা সকলে মিলে লতা দেবীর নামে একটা স্লোগান দেই।

লতা নামটাকেই সকলে মেনে নিলাম। পরে অবশ্য জানলাম উনি

কেবলমাত্র লতাই নন, সঙ্গে তড়িৎও আছে। অর্থাৎ তড়িৎলতা। নামটা বড় সেকেলে, সুলোচনী বা সরলাসুন্দরী গোছের অনেকটা, তাই না!

বাদল বলল, নাম ধুয়ে কি জল খাবি। যা জুটছে তাই আমাদের বাপের ভাগ্যি। চল এবার নী-বীচে গিয়ে বসি। মেয়েটা তারপর আমাদের খুঁজে খুঁজে ফিরে যাবে।

আমরা সমুদ্রতীরে বসলাম। এবং বসবার খানিকক্ষণ পরেই দেখলাম এলো চুল মেঘের মত উড়িয়ে দিয়ে সে আসছে। মেরুন রঙের শাড়ি পরেছে, ময়ূরের পাখার মত ফুলে ফুলে উঠছে। কপালে ঝাউপাতার মত একটা টিপ আঁকা। সারাদিন ঘুমিয়েছে বোধ হয়, চোখের নিচে ফলের মত খুশি ঝরছে। পুরুষ্টগালে কোন রঙ মেখেছে কিনা বোঝা যাচ্ছিল না। গায়ের রঙ কিন্তু বিদ্যুতের মত তীব্র নয়, একটু মিয়োন। বাদল বলল, আসুন, আপনার জন্যই আমরা বসে আছি।

একটা লতার মত নুয়ে বসে পড়ল ও। শাড়ির আঁচল বাতাসে বেলুনের মত ফুলে উঠল।

বললাম, তা হলে আমাদের পরিচয়টাই প্রথমে হয়ে যাক। সকলের নাম বললাম। আমাদের মধ্যে কার কি পেশা তাও বললাম। লিণ্টু কিন্তু ভাল গাইয়ে, ফাংসানেও গায়। আপনিও নিশ্চয়ই গান জানেন?

হিরু জলসার প্রবক্তার মত ভঙ্গি করে বলল, এবার আপনাদের গান গেয়ে শোনাবেন শিল্পী শ্রীমতী তড়িৎলতা। সঙ্গে তবলা সঙ্গত করবেন এই অধম। অবশ্য তবলার অভাবের জন্য আমি দেশলাই সঙ্গত করছি। নিন শুরু করুন।

লতা বলল, সে কি, আমি গাইব কি। জানলে তো গাইব।

বাদল বলল, কুমারী মেয়েদের গান না জানলে চলে না। আমরা বুঝি। নিন আরম্ভ করুন।

লতা কৌতুকে প্রশ্ন করল, জানতেই হবে তার কি মানে?

বাদল বলল, ইণ্টারভিউতে হাই মার্কস তুলতে হলে গান দরকার। গান আর হাতের কাজ হিসেবে রঙীন ফুলতোলা বালিশের ঢাকনা। তারপর চাকরি পেয়ে গেলে ওসব জিনিস না হলেও চলে।

লতা বলল, ইণ্টারভিউ না দিয়েও অনেক সময় চাকরি পাওয়া যায়। সত্যি বলছি গানটান জানি না আমি। লিণ্টুবাবুই গান।

সোনা এলিয়ে বসেছে। বালির ওপর খানিকটা জায়গা হাত বুলিয়ে বুলিয়ে মসৃণ করছে। এরপর ও বালি দিয়ে দিয়ে ওখানে কোন মূর্তি বানাবে। এ ব্যাপারে ও পাকা শিল্পীদেরও হার মানাতে পারে।

লিণ্টু বলল, গাইতে পারি কিন্তু আপনাকেও একটা শেষ অবদি শোনাতে হবে।

একটা চিনেবাদামঅলা এসে শুধিয়ে গেল বাদাম চাই কি না।

আমরা উত্তর করলাম না। লিণ্টু গান ধরল, এবং প্রথমেই সেই গান, চক্ষে আমার তৃষ্ণা, তৃষ্ণা আমার—

সমুদ্র আর বাতাসের গর্জনের মধ্যে লিণ্টুর গলা আশ্চর্যরকম মিলে যেতে লাগল। যেন বুক ভাসিয়ে গান ধরেছে লিণ্টু। গাইবে না, সঙ্গে মেয়েছেলে।

শিব আমাদের কোড ল্যাঙ্গুয়েজে বুঝিয়ে দিল, প্রেমে পড়েছে রে।

বাদল একই ভাষায় দু' হাত কচলে উত্তর করল, মরে যাব।

লতা চকিতেই একবার চোখ তুলে আমাদের ভাষা বুঝবার চেষ্টা করল। আমি জানতাম ও পারবে না। সারা পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র আমরা নর্থ ক্যালকাটার কয়েকজন ছোকরাই এ ভাষায় কথা বলতে পারি। এ ভাষার আবিষ্কর্তাও বোধ হয় আমরাই।

লিণ্টুর ভারী গলা আবার কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। আমি সামনের ফেনিল সাগরের ভাজ লক্ষ করবার চেষ্টা করছিলাম। অন্ধকারে ভীষণ জটিল মনে হচ্ছিল। হিরু মাথা ঝুঁকিয়ে ঝুঁকিয়ে দেশলাই বাজাচ্ছিল। বাদলকে দেখে মনে হল আমরা সকলেই মগ্ন হয়ে গেছি।

খানিকক্ষণ পর গান থামিয়ে লিণ্টু হাসল। এই বাতাসে গলাটা কেবল ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। তা ছাড়া যা চান করেছি আজ। গলা একদম পান্চার হয়ে আছে।

সোনা বলল, এবার আপনার পালা।

লতা বলল, আমি শ্রোতা। আমি বড় জোর সেতার-টেতার থাকলে শুনিয়ে দিতে পারতাম।

আপনি সেতার জানেন? লিণ্টু প্রশ্ন করল।

তেমন কিছু না, তবে ঐটেই যা কিছু জানি। আপনিই আর একটা গান। বেশ গলা আপনার।

বলছেন। সার্টিফিকেট পাচ্ছি তা হলে।

বাদল বলল, একটা প্রেমের গান গা লিণ্টু। তোর সেই 'প্রেম করে হায়—'

সোনা নিবিষ্ট মনে বালি দিয়ে একটা বুদ্ধদেবের মূর্তি বানান প্রায় শেষ করে এনেছিল। অবিকল পাথরে খোদাই করা মূর্তির মত মনে হচ্ছিল। টিকলো নাক, টানা টানা ভ্রু, ভারী ঠোঁটের ভাঁজ। কানের পাশে ঝুমকো ঝুলছে, সেই বলিষ্ঠ বাহু। এমন কি নাভিকুণ্ডটি পর্যন্ত যথাযথভাবে বসিয়ে ফেলল। এবার উরু আর পায়ের দিকে মনোযোগ দিল সোনা।

লিণ্টু গুনগুন করে গান ধরল, 'হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা।'

লতার চোখ চিকচিক করে উঠল, ইস্ কী ভাল গান। একটু গলা ছাড়ুন না বাবা!

লিণ্টু গলা খুলে গান ধরল। লতা একটু এলিয়ে বসল, তারপর আঁচল বিছিয়ে আর একটু কাত হয়ে বুদ্ধদেবের মূর্তির দিকে তাকাল। বাঃ, সত্যিকার পাথরের মূর্তি মনে হচ্ছে। বলেই আবার গান শোনার জন্য নীরব হল।

এক ফেরিঅলা এসে দাঁড়াল, ঝিনুকের মালা হাতে, মালা নেবেন!

গান থামিয়ে লিণ্টু বলল, প্রেমের গানও শুরু করলাম আর সঙ্গে সঙ্গে তুমিও নিয়ে এসে দাঁড়ালে বাবা।

হিরু বলল, কেমন যোগাযোগ হয়ে গেল না।

বাদল বলল কি, মালা নেবেন?

আমার অভাব নেই। লতা ধূর্তভাবে হাসল। আপনারাই বরং একটা একটা করে নিয়ে যান।

নিয়ে কি করব? কাকে দেব? সোনা বুদ্ধদেবের হাঁটুর ভাজ ঠিক করবার জন্য বালি গুছোচ্ছিল, বলল।

কেন আপনাদের কেউ নেই বুঝি দেবার মত।

লিণ্টু সেই গুপ্ত ভাষায় বোঝাল, তুমি ছাড়া আর কেউ নেই।

বাদল বলল, বলে দেখ না।

মার থাই আর কি! আবার গান ধরল লিণ্টু। সোনা বলল, না বাবা মালা নিয়ে কি করব। দরকার নেই।

যদি আপনাদের কেউ থেকে থাকে নিতে পারেন কিন্তু। উৎসাহ দিল লতা।

হিরু বলল, নেব একটা? নেই?

লিণ্টু আবার গান থামিয়ে হিরুর দিকে তাকাল, কার গলায় পরাবি শুনি?

বাদল বলল, নে না, নে। দেখি হে তোমার মালা।

আবছা আলোয় মালার রঙ চেনা যাচ্ছিল না। হিরু বলল, একটা পছন্দ করে দিন না। আমি আবার মেয়েদের টেস্ট ঠিক বুঝতে পারি না।

মানিক আর কি! সোনা হঠাৎ হিরুর চিবুক ছুঁয়ে নেড়ে দিল।

হিরু বিগলিত ভাবে বলল, দেখছেন তো একটা মালা কিনব তাতেও ওদের সহ্য হচ্ছে না। হিরুর গলায় ল্যালা ল্যালা ভাব ছড়িয়ে পড়ল।

লতা একটা মালা বেছে দিল। এটা নিন। যার জন্য নিচ্ছেন তিনি দেখতে কি রকম?

হিরু দুম করে বলল, এই ধরুন না অনেকটা ঠিক আপনার মত।

ওমা, আমার মত খারাপ দেখতে।

হিরু বলল, হুঁ, ঠিক আপনার মত খারাপ। বলে একগাল হাসল। তারপর মালাটা হাতের কব্জিতে জড়িয়ে রেখে মালাঅলাকে পয়সা দিয়ে বিদেয় করল।

রাত হয়ে এসেছিল। আলোময় হোটেলগুলোকে অপূর্ব স্বপ্নময় লাগছিল। মাঝে মাঝে দুটি একটি সাইকেল রিকশা যাচ্ছে। সমুদ্রের এই বালির ঢালে এখন অসংখ্য বায়ুসেবী জাঁকিয়ে বসে আছে। সন্ধ্যার খানিক আগে এক অন্ধ বৃদ্ধকে কে যেন খানিক দূরে বসিয়ে রেখে গিয়েছিল। অন্ধের সমুদ্র দর্শন ভাবতেই কেমন যেন বুকের ভিতরটা মুচড়ে ওঠে। এই মাত্র লোকটাকে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দেখলাম।

কই, থেমে গেলেন কেন? ভারী মিষ্টি গলা আপনার।

বাদল সোনার দিকে তাকাল। সোনা আমার দিকে। লতা শাড়ির আঁচল পায়ের আঙুলে জড়িয়ে রাখবার চেষ্টা করল। প্রচণ্ড বাতাসে গায়ের উপর কাপড় রাখা দায় হয়ে উঠেছিল।

লিণ্টু অসমাপ্ত গানটা মাঝখান থেকে ধরে গেয়ে শেষ করল। তারপর আর কারো বলার অপেক্ষা না রেখেই আর একটা গাইল। এইভাবে আবার একখানা।

আমি লক্ষ করলাম, গানের আসরে ধীরে ধীরে যেন একটা শীতলতা নেমে

আসছে। দেখি, কনুইয়ে ভর দিয়ে লতা বুদ্ধদেবের মূর্তির দিকে তাকিয়ে আছে। সোনা প্যাণ্টের ক্রীজের কথা ভুলে গিয়ে বালির উপর পা গুটিয়ে বসে কানের পাশে হাত চেপে রেখেছে। বাদলের দীর্ঘ দেহটা বালির উপর চিৎ হয়ে পড়ে আছে। পকেট থেকে রুমাল বার করে ও চোখের উপর পেতে রেখেছে। হিরু এতক্ষণ যেন মালাটা নিয়ে খেলা করছিল, এইবার গান থেমে যেতে কেউ কথা বলছে না দেখে বলল, যা বাবা, সবাইকে পাথর করে দিলি না কি লিণ্টু।

লিণ্টু রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে হাসল। লতা বলল, এত ভাল গান আপনি। ওদের উচিত আপনাকে কিছু পুরস্কার দেওয়া।

সোনা বলল, আপনিই দিন না। আমরা তো সব সময়ই দিচ্ছি।

বুকের উপর কাপড় ঠিক করবার জন্য লতা বাঁক ফিরল। যেন শুনতেই পেল না সোনার কথা।

হিরু বলল, এই হারটাই ওকে প্রেজেণ্ট করুন না। বলে ও স্বভাব-সুলভ গোবেচারা ভাবে হাসল।

বা'রে ওটা তো আপনার কেনা, আমি দেব কেন? যেন মালা দেওয়ার গূঢ় অর্থ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য লতা এইভাবে উত্তর দিল।

তা হলে ধার করে নিন আমার কাছ থেকে।

আমি কখনো ধার করি না। লতা ম্লান হাসল। ওর চোখের ভাষা ধরা গেল না।

তা হলে আমার দান হিসেবেই নিন। আমিই আপনাকে দিচ্ছি, পরিয়ে দেব? দেই।

যা কী অসভ্য। লতা উঠে বসল। অনেক রাত হয়ে গেছে কিন্তু। দেখছেন তো লোকজন কেমন কমে এসেছে।

সোনা বলল, আমরা পঞ্চপাণ্ডব একসঙ্গে থাকলে রাতই বা কি আর দিনই বা কি।

আপনারা পঞ্চপাণ্ডব বুঝি? লিণ্টুবাবু বুঝি ভীম? আর বাদলবাবু কি যুধিষ্ঠির?

লিণ্টুর দেহ খানিকটা মেদবহুল সন্দেহ নেই। একটু বেঁটেও। হয়ত ভীমের উপমাই চট করে মনে আসে। লিণ্টুর চোখ ঘোলাটে দেখাল।

আপনাদের মধ্যে অর্জুনটি কে?

আমি আঙুল তুলে দেখালাম এই সোনাই আমাদের অর্জুন। আমরা ভাবছি কাগজে একটা দ্রৌপদী চেয়ে বিজ্ঞাপন দেব ?

শুনে খিলখিল করে ঢেউয়ের মত ভেঙে পড়ল লতা। তাই বুঝি ? তাহলে কলকাতায় গিয়ে আমার বান্ধবীদের অ্যাপলাই করতে বলব।

হিরু বলল আপনিও করুন না। আপনাকে কিন্তু দ্রৌপদীর মত দেখাচ্ছে।

তাই বুঝি। আমি কিন্তু ইণ্টারভিউতে বরাবর ফেল করি।

এবার তা হলে লাস্ট ট্রাই করে ফেলুন। করবেন ?

লতা এক চোখ হাসি ছড়িয়ে বলল, ভেবে দেখি। তারপর উঠে দাঁড়াল। এখন যদি না উঠি মা হয়ত একা একা আমার জন্য চিন্তা করবেন।

আমরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠলাম। তারপর হোটেলগুলোর দিকে এগোতে গিয়ে বুঝতে পারলাম বালির বিক্ষিপ্ত সমুদ্রের মধ্যে আমাদের পা যেন গভীর-ভাবে বসে যাচ্ছে।

ওকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে সেই রাত্রে আমরা হোটেলে ফিরে একটা দক্ষযজ্ঞ শুরু করে দিলাম। লিণ্টু বলল, ছিল আমার কেস, কিন্তু ভীম বলায় একদম আমি ডুবে গেছি।

হিরু বলল, কেমন প্ল্যান কষে ওর গলায় মালা পরিয়ে দিচ্ছিলাম বল এ্যাঁ!

বাদল বলল, চান্স কিন্তু সবটাই সোনার। ওকেই অর্জুন বলে মেনে নিয়েছে। মাইরি আমাকে কিনা শেষটায় ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির বানিয়ে দিল।

সোনা বলল, ধুৎ ধুৎ। আমি তো পাত্তাই পাচ্ছিলাম না। শেষটায় বুদ্ধদেবের মূর্তি বানাতে বসে গেলাম। তবু যদি আমার দিকে একটু তাকায়।

আর বলিস না সোনা, আমি সব লক্ষ করেছি। তোর দিকেই সারাক্ষণ চোখ ভাসিয়ে বসেছিল। আমার চোখ ফাঁকি দেওয়া বড় কষ্ট।

সোনার চোখ চিকচিক করে জ্বলছিল। বাদল বলল, বেশ তো বাবা দেখা যাচ্ছে, তোমার চোখে বিদ্যুতের কণা লেগে আছে।

আমার চোখে কে লেগে আছে তা তো তোদের অজানা নেই। বিদ্যুতের কণাটনা বেশিক্ষণ থাকে না, একটু পরেই উবে যাবে।

সোনার যে একটা প্রেমের ব্যাপার ছিল আমরা সবাই জানতাম। সোনা

অনেকদিন ধরেই খেলছিল। কিন্তু এবার কি এই মেয়েটা কম্পিটিশনে নামবে নাকি।

মাথা খারাপ! সোনা বলল, তোরা কেউ লড়ে যা, আমি নেই। আমি এখানে দশ দিনের খদ্দের। খাব দাব ফুর্তি করব, কেটে পড়ব, ব্যাস।

বাদল বলল, মেয়েটা কিন্তু বেশ স্মার্ট। স্মার্ট আর ফ্রি। কটা মেয়ে পাবি তুই একদিনের আলাপেই যে এত কথা বলতে পারে।